নাগচম্পা

নারায়ণ সান্যাল

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর ১৯৬৯

প্রকাশক :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৩, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-পট
শ্রীকানাই পাল

দশ টাকা

উৎসর্গ

কৈশোরে যাঁর "ভূগখণ্ড" পড়ে বুঝতে শিখেছিলাম যে বিজ্ঞান ও কাব্য-সাহিত্যের সম্পর্ক অহি-নকুলের নয়, অগ্রজপ্রতিম সেই কবি-রাজ বলাইদা'কে—

নাগচম্পার অগ্রজ :

বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প (২য় সং)

বল্মীক

ত্রাতা

মনামী

অন্তর্লীনা (৩য় সং)

নৈমিষারণ্য (২য় সং)

নীলিমায় নীল

অলকনন্দা

মহাকালের মন্দির (২য় সং)

দণ্ডকশবরী (৪র্থ সং)

পথের মহাপ্রস্থান

বাস্তু-বিজ্ঞান (২য় সং)

অপরূপা অজন্তা (রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত সং

তাজের স্বপ্ন

সত্যকাম

আমি নেতাজীকে দেখেছি

নেতাজী রহস্য সন্ধানে

জাপান থেকে ফিরে

কলিঙ্গের দেব-দেউল

আমি রাসবিহারীকে দেখেছি

॥ এক

এ কাহিনীর নায়িকাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি, সে আমার কাছে শ্রুতি মাত্র। খল-নায়ককে চাক্ষুষ দেখেছি বটে, তবে এ নাটকের পটোত্তলনের অনেক আগে, প্রায় বিশ বছর আগে এবং নায়ককেও দেখেছি তবে নাটকের একেবারে শেষ পর্যায়ে। ফলে এ নাটকটা আমার চোখের উপর অভি-নীত হতে দেখিনি। আমি এর দর্শক হিসাবে কোন দাবী রাখছি না। বিভিন্ন সূত্রে টুকরা টুকরা খবর সংগ্রহ করেছি। সুকুমারবাবু এবং রায়-সাহেবই অধিকাংশ মাল মশলা সংগ্রহ করে যোগান দিয়েছেন আমাকে, কিছুটা শুনেছিলাম মিসেস রায় চৌধুরীর কাছে। মিঃ রায় চৌধুরী অর্থাৎ সুব্রত সরকারী এঞ্জিনিয়ার, আমার সহপাঠি এবং সহকর্মী। মিসেস্ রায় চৌধুরীর যাতায়াত আছে আমার বাড়িতে, তিনিই বলেছিলেন এ গল্পটা লিখতে। না, ভুল বললাম, প্রথম অনুরোধ করেছিল কৌশিক, এ কাহিনীর নায়ক। তা সে যাই হোক, মোট কথা পাঁচ জনের কাছ থেকে শুনে গল্পটার কাঠামো খাড়া করেছি, নিজের কল্পনা মিশিয়ে আজ লিখতে বসেছি। এ জাতীয় কাহিনীতে নাম ধাম বদল করতে হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবু যদি আপনাদের কারও মনে হয় এ কাহিনীর কোন চরিত্রকে চেনা চেনা ঠেকছে, সে দায় আমার নয়। সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক বলে গোড়াতেই একটা ফতোয়া জারি করা চলত; কিন্তু সমস্যাটা যেহেতু বাস্তব তাই ও কথা বলা বোধহয় ঠিক হবেনা। 'কাল'টা সত্য, স্থান ও পাত্র আমার কল্পনাপ্রসূত। সে কল্পনায় বাস্তবের ছোঁয়া কতটা আছে, আদৌ আছে কিনা তা তৌল করার দায় আপনাদের। নায়কের চরিত্রের ক্রমপরিবর্তনটায় আমি অভিভূত হয়েছিলাম এ কথা অনস্বীকার্য। তারুণ্যের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে একটা কবিমন কেমন করে বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল, কি ভাবে বারবার পাথরের প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল তার কবিসত্তা, কিভাবে রোমান্টিক ভাবালু কবি হয়ে উঠল বিদ্রোহী বাস্তব-বাদী, তা লক্ষ্য করেছিলাম গভীর অভিনিবেশ নিয়ে। আমাকে সে বলে-

ছিল : 'ডিসপ্রেসড' মানুষজনদের নিয়ে তো অনেক লিখলেন, এবার না হয় 'মিসপ্রেসড' মানুষদের নিয়ে কিছু লিখুন।

কথাটা মনে লেগেছিল। তাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু কী হবে তাতে? 'ঘৃণ-ঘৃণ-ঘৃণ-ঘৃণাপয়ঃ' মন্ত্রের তো বদল হবে না। ঘৃণে ধরা অচলায়তনে সে কথায় কেউ কর্ণপাত করবেনা।

জি. বি. এস. এর নাটকে আখ্যানভাগটা গৌণ, মুখ্য নাটকের মুখবন্ধটুকু। আমার এ কাহিনীতেও তেমনি গোয়েন্দা কাহিনীর চড়া সুগার কোট চড়িয়েছি — তার পিছনে যে ট্র্যাজেডিটা রয়ে গেল সেটার কথা বলতে গেলে কাহিনী ছেড়ে প্রবন্ধ লিখতে হয়। লাইট-ব্রিগেডের ছয়শত সৈন্য সোজা ছুটে চলে গেল নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, তাকালো না ডাইনে বাঁয়ে, শুধালোনা কেন এ আদেশ। আমরা তাদের সে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বগাথা কেলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্ত করি, মানেবই তৈরী করে মুখস্ত করি, ব্যাখ্যা লিখে মুখস্ত করি, এবং নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে আসি, একবারও প্রশ্ন করিনা : আচ্ছা সেই লাইট ব্রিগেডকে ঐ ভুল নির্দেশটি যিনি দিয়েছিলেন তাঁর কি খবর মশাই? অথবা এমন মারাত্মক বিভ্রান্তিকর নির্দেশটা কেমন করে এসেছিল মশাই? সে সব প্রশ্ন অবান্তর, সে সব প্রশ্ন যেমন প্রশ্নপত্রে আসেনা, তেমনি পাঠকের মনেও আসেনা। আসলেও সে সব ধামা চাপা দেওয়ার আইন আছে। মাষ্টারমশাইকে প্রশ্ন করে দেখবেন, তিনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলবেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার হে ছোকরা?

বাস্তবিকই তো। চার্জ অফ দ্য লাইট ব্রিগেড কবিতার মাহাত্ম্য তো সেখানে নয়। হুকুম পাওয়া মাত্র মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে কি ভাবে ঐ ছয়শ' সৈনিক মরণের মুখে ছুটে চলে গেল তাই প্রতিপাদ্য বিষয়। কে ভুল নির্দেশ দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল, তার কোর্টমার্শাল হয়েছিল কিনা এসব অবান্তর প্রশ্ন কেন? এসব প্রশ্ন অবৈধই শুধু নয়, এতে কবিতাটির মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। ওদের বীরত্ব গাথায় অভিভূত হয়ে যদি দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পার তবেই এ কবিতাপাঠ সার্থক।

আমি প্রবন্ধকার নই, জি বি. এসও নই, ফলে মুখবন্ধ বন্ধ করে সরাসরি গল্পটায় নেমে পড়া যেতে পারে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে যদি ভুলক্রমে প্রশ্ন করে বসি ঐ ভুল হুকুমটা যাঁরা জারি করেছিলেন, তাঁদের কি

শাস্তি হওয়া উচিত, তাহলে সে কটা পাতা না হয় আপনারা উল্টে যাবেন !

*　　　*　　　*

অফিসে বসে কাজ করছিলেন এম. কে. আগরওয়াল। প্রকাণ্ড বড় গ্লাসটপ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি-আটা ঘূর্ণায়মান চেয়ার, টেবিলে কলমদানি, টেবিল-পঞ্জিকা, ফাইল, কাগজচাপা আর সাদারঙের একটা টেলিফোন। সামনের দেওয়ালে বিজলি-চালিত দেওয়ালঘড়ি। গোপন-উৎস থেকে বিচ্ছুরিত ফ্লুরেসেন্ট বাতির কৃত্রিম আলোয় ঘরটা উদ্ভাসিত। বৈদ্যুতিক পাখা নেই। ...-দরজা বন্ধ। পিছন দিকে প্রাচীরে গাঁথা একটা এয়ার-কুলার।

...গরওয়ালা না-প্রৌঢ়, না বৃদ্ধ। শাস্ত্রে বানপ্রস্থে যাবার নির্দেশ আছে ...সে সেই বয়সে উপনীত হয়েও তিনি নূতন কোম্পানি ফ্লোট করবার ...হিম্মৎ রাখেন। যাকে বলে কর্মবীর। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত। কর্মব্যস্ত প্রায়বৃদ্ধটি যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে, চোখের কোণে অত্যাচারের কালিমা, যদিও মাথার চুলগুলি স্নানের অব্যবহিত পরে না হলে আর সবসময়েই কুচকুচে কালো। স্যুটেড-বুটেড নন সব সময়। কখনও কখনও তার পরণে কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় সোনার চেন, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। এই আজ যেমন।

আগরওয়াল-সাহেব একটা মোটা খাতায় একটি যোগ অঙ্ক পরীক্ষা করছিলেন। গভীর মনোযোগ সহকারে। পিয়ন বনোয়ারিলাল পর্দা সরিয়ে ...রে ঢোকে। টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজ নিঃশব্দে রেখে যায় কাচের কাগজ-চাপায় ঢাকা দিয়ে। ধীরপদে ফিরে যায় আবার। আগরওয়াল ভ্রুক্ষেপও করেন না। আপন মনে মোটা বাঁধানো পাতাটা পরীক্ষা করতে ...কেন।

যোগ অঙ্কটা শেষ করে পেন্সিলের একটি টিক চিহ্ন দিয়ে তারপর কাগজের ...করাটা টেনে নেন। বেল বাজিয়ে বনোয়ারিলালকে আবার ডাকেন : কি চায় ...কটা ?

... মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়, একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে।

: চিঠি ! কার চিঠি ?

: বলছে তো স্যার, জীমূতবাহন-সাহেবের কাছ থেকে এসেছে।

আগরওয়ালার ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে। কলমটা কলমদানিতে রেখে দেন। গ্লাসটপ টেবিলের উপর দু-হাতের দশটা আঙুল অহেতুক টকে-টক্কা বাজাতে থাকে। বোঝা যায়, তিনি কিছু একটা চিন্তা করছেন। দু'-চার সেকেণ্ড। আবার প্রশ্ন করেন : মেমসা'ব নামেনি ?

: না হুজুর।

: নকুল আর রসময় আসেনি ?

: এসেছেন স্যার, নকুলবাবুই আপনাকে খবর দিতে বললেন।

: ঠিক আছে। লোকটাকে পাঠিয়ে দাও।

বনোয়ারিলালের প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে ছেলেটি ঘরে ঢোকে তার দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে নিয়েই নিশ্চিন্ত হ'লেন আগরওয়াল। লোকটি নিতান্তই পত্রবাহক। চেয়ারে বসতে বলার প্রয়োজন নেই। পরণে খাকি প্যান্ট ; ইস্ত্রির বালাই নেই। প্রায় পায়জামার আকার ধারণ করেছে সেটা। রবারের চপ্পল-পরা চরণযুগল রাঙামাটির আস্তরণে। গায়ে চেককাটা সস্তা ছিটের আধময়লা বুশ-সার্ট। বুক-পকেটে ব্লু-ব্ল্যাক কালির মানচিত্র। বোধ-করি ফাউন্টেন পেনটা মাঝে মাঝে খুলে যায় ওর। বছর চব্বিশ বয়স হবে মনে হয়। চুলগুলো রুক্ষ অবিন্যস্ত। দিন কয়েকের না-কামানো গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

তা হোক। তবু ছাই চাপা আগুনের মত ঐ দীন হীন বেশবাসের মধ্যেও মেহনতি মানুষটার সুগঠিত দেহটা দর্শনীয়। দীর্ঘ বলিষ্ঠ পেশীবহুল চেহারা। চোখ দুটি উজ্জ্বল। পাপোশে চটিটা ভাল করে ঘসে নিয়ে ছোকরা ঘরে ঢোকে। দীর্ঘ মানুষটা বিনয়ে বিগলিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে নমস্কার করে।

: কী চাও প্রশ্ন করেন আগরওয়াল।

সসম্ভ্রমে কালির ছোপধরা বুকপকেটের গহ্বর থেকে একটি বন্ধ খাম উদ্ধার করে সেটি এগিয়ে ধরে নিঃশব্দে। ক্রতহাতে আগরওয়াল খামটা খুলে ফেলেন। ছোট্ট চিঠিখানার উপর একনজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার ভ্রূকুটি করেন। এবার ছেলেটিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আবার খুঁটিয়ে চিঠিখানা দেখতে থাকেন। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু এবার পড়তে অনেক সময় নিলেন তিনি। তারপর আগন্তুকের দিকে সন্ধানী একজোড়া চোখের দৃষ্টি মেলে ধরে বলেন : জীমূতবাহন মহামাত্র সাহেব তোমাকে কতদিন ধরে চেনেন ?

ছোকরা রীতিমত ঘাবড়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে : তা বছর দুই হল স্যার!

চিঠিখানা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আগরওয়াল সাহেব বলেন, পড়ো তো হে চিঠিখানা।

ছেলেটি চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নেয়, উল্টেপাল্টে দেখে কথা বলে না।

: কই পড় ?

কাঁপা কাঁপা গলায় ছোকরা বলে : আমি ইংরাজি জানি না স্যার।

: কতদূর লেখাপড়া করা হয়েছিল ?

হাতটা ঘাড়ের কাছে চলে যায়। ঘাড়টা চুলকাতে চুলকাতে বলে, ক্লাস ফাইভ।

: তারপর থেকে রকবাজি করছ ?

মাথাটা নিচু করে থাকে। হাসে কিনা বোঝা যায় না।

: ড্রাইভিং লাইসেন্স কতদিনের ?

: দু বছর স্যার। এর আগে ভিলাইয়ে এক সাহেবের গাড়ি চালাতাম। তা তিনি গাড়ি বেচে দিয়ে দেশে ফিরে গেলেন, তাই—

চিঠিখানা ফেরত নিয়ে আগরওয়াল বলেন, তোমাকে আমি খোলা কথা বলছি ; আমার একজন ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, ঠিক কথা। মহাপাত্র সাহেব তোমাকে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন, ঠিক কথা। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে বুঝিয়ে দাও তো বাপু। সমস্ত চিঠিটা কালো কালিতে লেখা, শুধু তোমার নামটা নীল কালিতে কেন ?

ছেলেটি জবাব দেয় না। নীল কালিতে নাম লেখা হয়েছে বলে তার কেন চাকরি হবেনা তা বোধকরি বুঝে উঠ্‌তে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আগরওয়াল আবার বলেন, তোমাকে তিনি দু-বছর ধরে চেনেন, তাহলে তোমার নামটা ফাঁক রেখে তিনি চিঠিখানা লিখেছিলেন কেন ?

বেকার মানুষটা হাত দুটি জোড় করে বলে : তা জানিনা হুজুর। উনি বিরাট লোক, আমীর আদমী ; আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন ; কিন্তু নামটা হয়তো মনে করতে পারবেন না। এ সুপারিশ চিঠিখানা আমার কাকা জোগাড় করে দিয়েছেন। চিঠিখানা সাহেব নিজে হাতে লিখেছেন কিনা তাই আমি জানিনা। কাকা বললে, এই চিঠিটা নিয়ে হুজুরের কাছে আসতে, তাই এলেছি।

: আচ্ছা তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর।

কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গ ভেঙে যায়। নিচু হয়ে নমস্কার করে ছেলেটি বেরিয়ে যাবার আগেই বেল বাজালেন আগরওয়াল। বনোয়ারিলালকে বললেন : লোকটাকে বাইরে বসিয়ে রাখ। ব্যাটা ভেগে না পড়ে। মালপত্র এনেছে কিছু?

: আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। একটা টিনের প্যাটরা আর বিস্তারা।

: ঠিক আছে। নজর রেখ, কেটে না পড়ে।

বনোয়ারিলাল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা তুলে নেন। জীমূতবাহন মহাপাত্রের নাম্বারটা ডায়াল করতে থাকেন। যে দিনকাল পড়েছে, কাউকে বিশ্বাস নেই। ড্রাইভারের প্রয়োজন তাঁর আছে ঠিকই। ক'দিন আগে একটা ককটেইল পার্টিতে মহাপাত্র সাহেবই ওঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন একজন ড্রাইভার রাখতে; বলেছিলেন আপনি এভাবে আর নিজে ড্রাইভ করবেন না কিন্তু। এই শীতেই কি অপারেশন করানো যাবে? কি বলছে ডাক্তার?

: বলছে তো এখনও ঠিকমত পাকেনি। আরও মাস ছয় সময় লাগবে। ব্লাডসুগারটাও রয়েছে তো। চোখটা কাটানোর আগে সেটাও কমানো দরকার।

: তাহলে একটা ড্রাইভার রাখুন ক' মাসের জন্য।

গলাটা খাটো করে আগরওয়াল বলেছিলেন, আপনি তো সবই জানেন স্যার; বেগানা লোক কারবারে ঢোকাতে চাই না। ড্রাইভার মানেই সে বেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে; কখন কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, গাড়িতে বসে কার সঙ্গে কি কথা বলছি—

মহাপাত্রের ততক্ষণে বেশ নেশা ধরে গিয়েছিল, হেসে বলেছিলেন, অনেক তো বয়স হল আগরওয়াল সা'ব, এ বয়সে আর ডন-জুয়ানি খেলাটা নাই খেললেন?

সত্যিকারের লজ্জা না পেলেও আগরওয়াল সলজ্জ হওয়ার অভিনয় করেছিলেন। তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলেছিলেন : না, না, সে সব কিছু নয়। তবে আমার বিসনেসের ব্যাপারটাতো জানেন, আপনার কাছে আর কি লুকাবো—কোন সূত্রে ড্রাইভারের ছদ্মবেশে এক বেটা বিভীষণ ঢুকে পড়বে—

মহাপাত্র এবার গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন : আমি জানি। আপনি কিছু ভাববেন না। খুব বিশ্বস্ত একজন লোক দেব আপনাকে।

আগরওয়াল মনে মনে হেসেছিলেন। মহাপাত্র নিজেই যে কিছুদিন ধরে আগরওয়ালের কারবারের ছিদ্র অন্বেষণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, এ কথা জানা ছিল তাঁর ভাল করেই। তাঁর উদ্দেশ্যটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না; কিন্তু মুখে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাব ফুটিয়ে বলেছিলেন, আপনার লোক হলে অবশ্য অন্য কথা। তবে লেখা পড়া জানা লোক পাঠাবেন না, এরাই ইউনিয়ানের পাণ্ডাগিরি করতে চাইবে—

মহাপাত্র হেসে বলেছিলেন, বেশ বেশ, গণ্ডমূর্খ ই পাঠাবো একটি!

সেই মহাপাত্রের সুপারিশ নিয়ে এসেছে এই গণ্ডমূর্খ ছোকরা। জীমূতবাহন মহাপাত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। বয়সে বোধকরি আগরওয়ালের চেয়ে কিছু ছোটই হবেন, অর্থসম্পদেও ধনকুবের আগরওয়ালের নাগাল পান নি, কিন্তু পদমর্যাদায় তিনি আগরওয়ালের নমস্য। আকৈশোর দেশসেবা করে এসেছেন জীমূতবাহন। গত বিশবছরের হিসাব বাদ দিলে তাঁর কর্মজীবনে কারাবাসের সময়টা বড় কম নয়। খদ্দর ছাড়া পরেন না এবং বিশবছর রাজনীতির ট্রপিজে খেলা দেখাতে গিয়ে পা-পিছলেও কখন পড়েন না। পর পর তিনবার নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছেন, একই কেন্দ্র থেকে, এই জেলা-সদর শহর থেকে। স্বাধীনতার পর প্রথম পাঁচবছর ছিলেন বিধানসভার সভ্য। পরের দুটি নির্বাচনে গিয়েছিলেন লোকসভায়। রাজি হলে অনায়াসে তিনি মন্ত্রীত্ব করতে পারতেন; কিন্তু তিনি রাজি হন নি। বাইরের লোক অথবা প্রেসের লোকেরা প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন গদিতে বসবার কোন বাসনা নেই তাঁর, আজীবন তিনি দেশের সামান্য সেবক হিসাবেই কাজ করে যেতে চান। আর ঘনিষ্ঠ মহলে কেউ এ প্রশ্ন করলে বলতেন, ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' পড়েছ? তার হিরো কে? চন্দ্রগুপ্ত না চাণক্য? 'কিং' হতে চাননা তিনি, 'কিং-মেকার' হয়েই থাকতে চান! এ জেলায়, শুধু এ জেলায় কেন, এ দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র ধারণা আছে সেই জানে জীমূতবাহন যতদিন বাঁচবেন 'পোর্ট-ফোলিও-হীন' সামান্য দেশ-সেবক হিসাবে, দীন-হীন 'কিং-মেকার' হিসাবেই ত-কুড়ি-সাতের খেলা খেলে যাবেন। আগামী নির্বাচনে তিনি জিতবেন কিনা এ প্রশ্নটা কেউ করে না। প্রতিপক্ষ ডাঃ সুলতান আলির জামানতটা জব্দ হবে কি না এ সম্বন্ধেই বরং কিছু মতভেদ শোনা যায় —শহরের বিভিন্ন চায়ের দোকানে, ক্লাবে, রক-আড্ডায়।

এ হেন জীমূতবাহনের সুপারিশ মানেই আদেশ। কিন্তু আগরওয়ালও

ট্রাপিজের খেলায় ওস্তাদ খেলোয়াড়। তাঁর পথও ক্ষুরস্য ধারা। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি মানেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাওয়া। গত বিশবছর ধরে তিনি চেম্বার-অফ-কমার্সের রঙ্গভূমিতে যে খেলাটা দেখাচ্ছেন, মন্ত্রীত্ব চালানোর চেয়ে তাও কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়। তাই তাঁকেও খুব সাবধানে পদক্ষেপ করতে হয়। ও ছোকরা যে চিঠিখানা এনেছে তা জীমূতবাহনের লেটার-হেড প্যাডের কাগজে হাতে লেখা ইংরাজী চিঠি—টাইপ করা নয়। তিনি লিখেছেন, পত্রবাহক তাঁর বিশেষ পরিচিত এবং একান্ত বিশ্বাসভাজন। কিন্তু একটা খটকা লেগেছে আগরওয়ালের। এ হেন বিশেষ পরিচিত এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিটির নামটা একই কালিতে লেখা হল না কেন? অবশ্য চিঠির নিচে যে সইটা আছে সেটা জীমূতবাহনের এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ স্বাক্ষর তাঁর চেনা। তবু সাবধানের মার নেই। লোকটাকে বাইরে বসিয়ে রেখে টেলিফোনে মহাপাত্র সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন: হ্যালো, মহাপাত্র সাহেব কি—

: কী খবর, আগরওয়াল সা'ব? হ্যাঁ, আমিই কথা বলছি—

এটা জীমূতবাহনের একটা বৈশিষ্ট্য। পরিচিত কেউ তাঁকে ফোন করে আত্মপরিচয় দেবার সুযোগ পায় না। কণ্ঠস্বর শুনেই উনি বলে ওঠেন: কে, মুখার্জি? আরে, মিসেস্ পাকড়াশি যে, অনেক দিন পরে অধমকে স্মরণ করেছেন, কি খবর? অথবা আই থিংক ইট্স্ রাঘবন অন্ দি আদার এণ্ড, হ্যালো হোয়াট নিউস? মহাপাত্র সাহেবের একান্ত-সচিবের পরিসংখ্যান অনুসারে শতকরা পঁচানব্বইটি ক্ষেত্রেই অনুমান নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়; শতকরা পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে জবাব হয়, গলার স্বর শুনেই কেমন করে চিনলেন? মহাপাত্র তখনও রহস্য করে বলতেন, গলার স্বর তো দূরের কথা, টেলিফোনে রিঙ্ টোন শুনে বুঝেছি আপনি; অথবা আপনি কি বাইরের লোক, আপনজনের গলার স্বর শুনে চিনব না? কিম্বা মহিলা হলে বলেন, কর্তা যখন শুধু কড়া নাড়ে চিনতে পারেন কেমন করে?

এ ক্ষেত্রেও আগরওয়াল প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই উনি নিশ্চিন্ত স্বরে বলেন: আপনার ড্রাইভার পৌঁচেছে?

: আপনি পাঠিয়েছেন কাউকে?

: ডিয়ার মি! এখনও রিপোর্ট করেনি?

: কী নাম বলুন তো লোকটার?

: বিশু। বিশ্বনাথ দাস। আজকালের মধ্যেই যাবে।

: যাক্, তাহলে আপনারই লোক ঐ বিশু দাস?

: তার মানে? ও দেখা করেছে আপনার সঙ্গে? আমার চিঠি দেখায় নি?

আগরওয়াল হেসে বলেন, দেখিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমত: চেহারা ঠিক ড্রাইভার ক্লাসের নয়, কেমন যেন ছাত্র ছাত্র গন্ধ!

হো হো করে হেসে ওঠেন জীমূতবাহন: ছাত্র-ছাত্র গন্ধ আবার কি মশাই? ছাত্রদের গায়ে আবার বিশেষ কোন গন্ধ থাকে নাকি?

আগরওয়ালও হেসে বলেন: আপনি রাজনীতি করেন, আপনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন—ছাত্র গন্ধ, মজদুর সুবাস, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের সৌরভ অথবা নক্সালবাড়ি সৌগন্ধ এসব আপনি আমার চেয়ে ভাল বোঝেন—

হাসতে হাসতে মহাপাত্র বলেন, তা যেন হল আর দ্বিতীয়তঃ?

: দ্বিতীয়তঃ আপনি লিখেছেন ছোকরাটি আপনার বিশেষ পরিচিত, অথচ তার নামটা আপনি চিঠি লেখার সময় মনে করতে পারেন নি। সমস্ত চিঠিটা কালো কালিতে লেখা, শুধু নাম নীল কালিতে। সন্দেহ হওয়ারই কথা—

আবার দিলখোলা হাসির জলতরঙ্গ ভেসে আসে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বেয়ে: এত পাকা খেলোয়াড় আপনি, আর এটা বুঝলেন না? গোটা চিঠিটা আমার নিজের হাতে লেখা নয়। একজনকে বলেছি সে লিখে দিয়েছে। শুধু পত্রবাহকের নামটা আর সইটা আমার নিজের হাতে লেখা।

: সে সম্ভাবনাও মনে হয়েছিল আমার। দেখলাম সইটা আপনি ঐ কালো কালিতেই করেছেন, একই কলমে, শুধু পত্রবাহকের নামটুকু ভিন্ন কলমে নীল কালিতে লেখা।

মহাপাত্র তৎক্ষণাৎ সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দাখিল করেন, তার কারণ যিনি চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলেন তাঁরই কলমটা নিয়ে আমি স্বাক্ষর করেছিলাম। কিন্তু পত্রবাহকের নামটা বসিয়েছি অনেক পরে, পত্র লেখকের প্রস্থান-অন্তে। আপনার ব্যাপার তো, তাই এই দ্বিগুণ সাবধানতা। ডান হাতে কি দিই বাঁ হাতকে জানতে দিই না!

এতক্ষণে ওঁর হাসির জলতরঙ্গ আগরওয়ালের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। মিষ্টি হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে আগরওয়াল বলেন: এটা কিন্তু বেশ বলেছেন স্যার! বাঁ-হাতে কি নিলেন, ডান হাতকে তা জানতে দেন না।

দুজনেই একসঙ্গে রিসিভার দুটো নামিয়ে রাখেন।

এর বেশী টেলিফোনে বলতে নেই। শেয়ানে শেয়ানে যখন কোলাকুলি হয় তখন এমনি আকারে ইঙ্গিতেই তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনে মনে খুশী হয়ে ওঠেন আগরওয়াল। বেশ মুখের মতন জবাবটা দিয়েছেন তিনি। জীমূতবাহনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন প্রচুর, দিয়েছেন প্রচুরতর। না, ভুল হল। জীমূতবাহন প্রচুর দেন নি, তিনি না-দিয়েছেন প্রচুর এবং সেই না-দেওয়ার জন্যই তাঁকে প্রতিদান দিতে হয়েছে প্রচুরতর পরিমাণে। জীমূতবাহনের সেই না-দেওয়ার জন্যই যে তিনি কৃতজ্ঞ। জীমূতবাহন বাধা দেন নি, জীমূতবাহন চোখ বুঁজে থেকেছেন, এটুকুই তাঁর তরফে দান। পরিবর্তে আগরওয়াল যা দিয়েছেন তা না-ধর্মী নয়, নগদে!

আবার ডাক পড়ে বিশু ড্রাইভারের। গরু-চোরের ভঙ্গিতে সেই পাৎলুন-প্যাণ্টধারী লোকটা তার সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহটা কুব্জ করে এসে দাঁড়ায়। মালিক এবার সরাসরি কাজের কথায় নেমে পড়েন: দেখ বাপু, ড্রাইভারের আমার সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই। শুধু মহাপাত্র সাহেবকে খুশী করতে তোমাকে নেওয়া। এখন কত টাকা মাইনে চাও বল?

: আমি আবার কি বলব স্যার? দয়া করে যা দেবেন—

: বাজে কথা বলনা। আমি যদি বলি পনের টাকা মাস মাহিনা, তাতে রাজি হবে তুমি?

ছেলেটি ঘাড় চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বলে: অমন অন্যায্য কথাটা আপনি বলতেই পারবেন না।

: হ্যা। অন্যায্য কথা আমি বলি। ন্যায্য কথাটা শোন। তোমাকে আপাতত পঞ্চাশটাকা করে দেব। খাওয়া-থাকা ফ্রি। যদি দেখি তুমি কাজের লোক তাহলে একমাস পরে আরও দশটাকা বাড়িয়ে দেব।

লোকটা কাতরভাবে বলে, দরাদরি করছি না স্যার, তবে এর আগে ভিলাইসাহেবের কাছে আশিটাকা পেতাম। অন্ততঃ গোটা সত্তর আমি আশা করেছিলাম স্যার।

: না! ঐ যা বলেছি ওর এক পয়সাও বেশি নয়। তোমাকে আগেই বলেছি ড্রাইভারের আমার সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই। নেহাৎ মহাপাত্র-সাহেবের মত মানী লোক তোমাকে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন, তাই!

: বেশ স্যার, আমি তাতেই রাজি।

: বাড়ি কোথায় ? সেখানে কে কে আছে ?

: বাড়ি গুমা-হাবড়া, বনগাঁর কাছে। বাবা আছে। আর কেউ নেই।

: বিয়ে কর নি ?

: না স্যার, খাওয়াব কি ?

: তবে আর কি ? খাওয়া-থাকার খরচা নেই। এক সেট ড্রাইভারের পোষাকও না হয় দেওয়া যাবে তোমাকে। তোমার তো এ ক্ষেত্রে পঞ্চাশ টাকায় খুশী হওয়ার কথা।

: আমি খুশীই হয়েছি স্যার।

আগরওয়াল গম্ভীর হয়ে বলেন, তুমি ঐ ফিয়াট গাড়ীটা চালাবে। যাঁর হুকুমে তোমাকে চলতে হবে তাঁকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। দুটো কথা বলব, এক নম্বর, ঐ ইউনিয়ানের মধ্যে মাথা গলাবে না। পাণ্ডা-গিরি করতে যেও না, মারা পড়বে। আর দু' নম্বর, যা দেখবে যা শুনবে দেওয়ালের কাছেও গল্প করবেনা। গাড়ি কখন কোথায় যায়, কে কি করে এ সব কোন কথা কারও মধ্যে আলোচনা করবে না। এমন কি আমার অফিসের কেউ জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না।

বিশু বলে : আজ থেকে স্যার আমি অন্ধ আর কালা।

আগরওয়াল হেসে বলেন : একেবারে কালা হয়ো না বাপু, ডাকলে সাড়া দিও। একেবারে অন্ধও হয়ো না, চোখ খুলে গাড়ি চালিও।

সাহেবরা রসিকতা করলে হাসতে নেই। মাথা নিচু করতে হয়। এটুকু শালীনতা জ্ঞান বিশু দাসের আছে দেখে খুশী হলেন সাহেব। বেল বাজিয়ে বনোয়ারিলালকে ডেকে বলেন মেম সা'ব নেমেছেন ?

: হ্যাঁ হুজুর।

: তবে সেলাম দেও।

বনোয়ারিলালের প্রস্থানের অল্প পরেই দুলে উঠল পর্দাটা। ঘরে ঢুকলেন যে ভদ্রমহিলা তাঁর বয়স কুড়ি একুশ হতে পারে। পরনে সাদা রঙের একটা শিফন। খাটো চোলী ধরণের ব্লাউস। নীবিবন্ধের কাছে অনেকটা অনাবৃত। কণ্ঠে কোন আভরণ নেই। কানে সবুজ পাথরের এক জোড়া দুল। এক হাতে এক গাছি বালা, অপর হাতে সাদা নাইলনের ব্যাণ্ডে বাঁধা হাতঘড়ি। সদ্য স্নান করে এসেছেন মনে হয়। মাথায় আলগা একটা খোঁপা কাঁধের উপর ভেঙে পড়েছে। প্রসাধন উগ্র নয় বোটেই। সদ্যস্নাতা মেয়েটি স্মিতহাস্যে

একটা প্রফুল্লতার হাওয়া বয়ে নিয়ে এল যেন। একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলতে যাচ্ছিলেন কোন একটা কথা। বোধকরি বিলম্ব হওয়ার কৈফিয়ৎ; হঠাৎ ঘরের ভিতর তৃতীয় একজনকে দেখে থমকে থেমে পড়েন। এ জাতীয় একটি প্রাণী যে ঘরে আছে তা তিনি অনুমান করেন নি। আপাদমস্তক লোকটিকে যাচাই করে নিতে চান। ড্রাইভার কিন্তু চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি নত ক'রে। আগরওয়াল রকিং চেয়ারটায় হেলান দিয়ে দোল খাচ্ছিলেন এতক্ষণ, উপভোগ্য একটা দৃশ্য দেখতে দেখতে। মহিলাটি ঘুরে তাঁর মুখোমুখি হতেই তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির কৈফিয়ৎ হিসাবেই যেন বলে ওঠেন: গুড মর্নিং লেডী চ্যাটার্লি! লেট মি হ্যাভ দ্য অনার অফ ইন্ট্রোডিউসিং মাই নিউ ড্রাইভার টু য়োর লেডিশীপ!

'লেডী চ্যাটার্লি' বলে যাঁকে সম্বোধন করা হল তিনি ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করেন। একবার আড় চোখে দেখে নেন তৃতীয় ব্যক্তিটির দিকে। মুখখানা ক্রমশঃ লাল হয়ে ওঠে তাঁর। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেন। কয়েক সেকেণ্ড বোধহয় ভাষা খুঁজে পাননা তিনি। তার পর ইংরাজিতে প্রশ্ন করেন: হোয়াট মেকস্ য়ু সো ফিল্‌থিলি জোভিয়াল মিঃ আগরওয়াল?

আগরওয়াল কিন্তু তখনও হাসছেন। ইংরাজিতেই জবাব দেন তিনি: ভয় নেই সুজাতা, ও ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। লরেন্স ওর কাছে গ্রীক!

তারপর বিশুর দিকে ফিরে বলেন: ইনি মিস্ চ্যাটার্জি। তুমি আমার গাড়ি চালাবে না, এঁর গাড়ি চালাবে। যখন যেখানে যেতে চাইবেন নিয়ে যাবে। অন্য কেউ গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে না এঁর অনুমতি ছাড়া। যখন যেখানে যাবে, যত মাইল ঘুরবে তা লগ্ বুকে লিখিয়ে নেবে এঁকে দিয়ে, কিন্তু পেট্রল, মবিল, ডিষ্টিল ওয়াটার, জুট-ঝাড়ন ইত্যাদি তোমার যা যখন চাই তা নকুলবাবুর কাছে চাইবে। এঁকে বিরক্ত করবে না। মনে রেখ, ইনিই তোমার মালিক, এঁকে খুশী রাখতে পারলেই তোমার চাকরি থাকবে। এখন বাইরে অপেক্ষা কর। উনি একটু পরেই যাচ্ছেন।

বিশু ড্রাইভার হাত দুটি জোড় করে নমস্কার করে। একবার নয় দু-বার। পালাবার পথ পেয়ে সে যেন বেঁচে যায়। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

আগরওয়াল মুখে হাসি টেনে এনে বলেন, তুমি আমার রসিকতায় চটে গেছ মনে হচ্ছে।

মিস্ চ্যাটার্জি গম্ভীর হয়ে বলেন, না চটিনি। ভালগারিটি বাদ দিয়েও যে রসিকতা করা যায়, এটা আপনার জানা নেই তা আমি জানি।

: বিশ্বাস কর, ও ছোকরা বিন্দু-বিসর্গ বোঝেনি। ওকে দেখেই কেন জানি আমার সেই লেডি চ্যাটার্লির ল্যাভারের কথা মনে পড়ে গেল। চমৎকার স্বাস্থ্য ছোকরার!

: ও কথা থাক্। ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? কাজের কথা বলুন।

আগরওয়াল হেসে বলেন এই তো কাজের কথা সুজাতা। তুমি সুন্দর, রাগলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখায় এই সব কথা বলবার জন্যই তো মাসে দু-তিনবার এখানে ছুটে আসি!

সুজাতা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

: বস বস! আচ্ছা শোন, কাজের কথাই বলি। আজ বিকালে আমাকে কলকাতা যেতে হচ্ছে। নেক্সট বুধবারে আবার আসব। আর রেলওয়ের অর্ডারটা আমি ক্যানসেল করে দিলাম।

সুজাতা চলে যাবে বলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, এ কথায় আবার বসে পড়ে। বলে, ক্যানসেল ক'রে দিলেন? মহাপাত্র সাহেবকে অত ধরাধরি করে অর্ডারটা আমি আদায় করলাম আর আপনি সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন?

: যে দামে আমরা মাল তৈরী করছি তাতে আমাদের কাউকে ধরাধরি করতে হবে না। ঘরে বসেই আমরা যথেষ্ট অর্ডার পাব।

: তা হোক, তবু রেলওয়ের অত বড় অর্ডার—

: অত বড় অর্ডার বলেই তা নিতে পারলাম না। অত মাল আমরা সময় মত দিয়ে উঠ্‌তে পারব না। শেষ পর্যন্ত হেভি পেনাল্টি দিতে হবে।

সুজাতা দৃঢ় প্রতিবাদ করে, আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনা। আপনি প্রডাক্‌শান বাড়াবার চেষ্টা করছেন না কেন? কিছু লোক বাড়ালেই তো তা করা যায়। কাঁচা মালের অভাব নেই, ক্যাপিটালের অভাব নেই, মার্কেটের অভাব নেই, ওয়ার্কিং স্পেসও যথেষ্ট। তবু আপনি ঐ দশটি লেবার নিয়ে টুক্ টুক্ করে ছেলে খেলা করছেন—

বাধা দিয়ে আগরওয়াল বলেন, লেবার স্ট্রেংথ কেন বাড়াতে চাই না তা তো তুমি জান সুজাতা।

: না জানিনা। আপনি বলেন, মজদুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে আমাদের বিসনেস্ সিক্রেটটা জানাজানি হয়ে যাবে। তার কোন যুক্তি নেই। কুলিরা তো নির্দেশমত গভরে খেটে কাজ করবে। আপনার সিক্রেট ওরা জানবে কেমন করে ?

আগরওয়াল এবার স্পষ্ট বিরক্ত হলেন, বলেন, তোমার ভালর জন্যই যা কিছু করছি আমি। এ বিসনেসের সিক্রেট তথ্যটা কি তা তুমি জাননা, আমি জানি। কেমন করে সে গোপনীয়তা রক্ষা করব তাও আমাকে স্থির করতে দাও। তুমি শুধু নিজের লভ্যাংশটা ঠিকমত পাচ্ছ কিনা হিসাব রেখ। ঐ একটি হিসাব তুমি ঠিকমত দেখে নিচ্ছ এটুকু জানতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকব। তোমার লাভের হিসাবটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সুজাতার। আবার উঠে পড়ে সে চেয়ার ছেড়ে। যাবার আগে শুধু বলে, আপনার জাল কেটে বেরিয়ে যাবার পথ আমি রাখিনি, এ কথা আপনি ভালভাবেই জানেন। আর তাই বারে বারে আমার লাভের অঙ্কটার উল্লেখ করেন আপনি। কিন্তু আমার লোকসানের খতিয়ানটা আপনি খতিয়ে দেখেছেন কোন দিন ?

: সুজাতা প্লীস্। ডোণ্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

: আপনি যে সাহায্য আমার বাবাকে এবং আমাকে করতে চেয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ; কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা কি দিয়েছি তা কি কখনও হিসাব করে দেখেছেন ? আপনার জমার খাতাটা ?

: সুজাতা—

কিন্তু সুজাতা আর অপেক্ষা করে না। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

আগরওয়াল মনে মনে একটু হাসেন। একটু আগে তিনিও কি ঠিক ঐ কথাই বলেন নি জীমূতবাহনকে ? ডান হাতে দেওয়া আর বাঁ-হাতে নেওয়ার প্রসঙ্গে ?

কিন্তু কথাটা তো ও মিথ্যা বলেনি। তিনি সুজাতাকে কী দিতে পেরেছেন ? কিছুটা নিরাপত্তা, কিছুটা স্বচ্ছন্দ জীবনের উপকরণ, আর ভবিষ্যতের একটা রঙীন স্বপ্ন ! কিন্তু বিনিময়ে ঐ কুমারী মেয়েটা যে তাঁকে তার সবকিছুই দিতে উদ্যত হয়েছে। সত্যিই তো এ জাল কেটে বেরিয়ে যাবার পথ সে রাখেনি। জালে ধরা পড়েও হার মানে নি, কিন্তু—

আচ্ছা, ওর বক্তব্যের মধ্যে কি কোন অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে! ডক্টর চ্যাটার্জির মৃত্যু সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত কি দিয়ে গেল মেয়েটা। বোধহয় নয়। এ নিছক অভিমান। তা অভিমান করতে পারে সুজাতা। হঠাৎ হাসি পায় আগরওয়ালার। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি কি নতুন করে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছেন নাকি? না হলে মেয়ে মানুষের অভিমান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি? তিনি! ময়ূরকেতন আগরওয়াল?

॥ দুই ॥

হ্যাঁ। ময়ূরকেতন আগরওয়াল। এ নাটকে সেই আগরওয়াল প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছে তখন সে বাহান্ন বছরের বৃদ্ধ। তার বাঁ চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে, সে একটু কুঁজো হয়ে হাটে, তার গালে গলায় চামড়া ঝুলে পড়তে আরম্ভ করেছে, তার চুলে কলপের আর চোখের কোণে অত্যাচারের কালিমা। সে একটু অকালেই বুড়িয়েছে বটে। চর্বিও জমেছে দেহে, এ্যালকহলিক ফ্যাট। কিন্তু আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন সে বত্রিশ বছরের যুবা। তখন সে সত্যই ভন-জুয়ান। বিশ বছর আগেকার কথা বলছি আমি। তাকে একবারই দেখেছিলাম, বিচিত্র পরিবেশে। ধূমকেতুর মত লোকটা এসেছিল আমার জীবনপথে, ধূমকেতুর মতই মিলিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। কোথা থেকে এল, কোন মহাকাশে সে বিলীন হয়ে গেল তার পাত্তাই পাওয়া যায়নি। হেলীর ধূমকেতুর মত সে যে আবার অতিদীর্ঘ পথ পরিক্রমা সমাপ্ত করে আমার জানা দুনিয়ায় কখনও ফিরে আসবে একথা সেদিন ভাবিনি। তবু যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে লোকটাকে একবার মাত্র দেখেছিলাম, তাতে এ দীর্ঘ বিশ বছর ব্যবধানেও তাকে ভুলতে পারিনি আমি। ওর নামটাও যে বড় অদ্ভুত—ময়ূরকেতন আগরওয়াল।

তখন আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি, সরকারী পূর্ত-বিভাগে। সাদা বাঙলায় পি. ডাব্‌লু ডি-এর এ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়াররূপে। উনিশ শ' আটচল্লিশ সালের কথা বলছি। তখন এঞ্জিনিয়ারদের কাছে চাকরির বাজারটা ছিল

সন্ধ্যা বেলায় চৌরঙ্গী এলাকায় ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মত। ডিগ্রিধারীদের তুলনায় চাকরি দেনেওয়ালারা সংখ্যায় ছিল বেশী। যদি বা কোন এঞ্জিনিয়ার ঘটনাচক্রে চাকরি খোয়ায় তবে সহজে সে সেকথা স্বীকার করে না। মিটারে 'গ্যারেজ' অথবা 'ডিফেক্টিভ' বোর্ড টাঙিয়ে বাজার যাচাই করতে থাকে। লম্বা-পাল্লার যাত্রী খোঁজে। আজকে যারা বাস্তুবিদ্যার ডিগ্রিটা কোলিও ব্যাগে ভরে চাকরির সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরে মরছে, রাত্র দশটায় হাওড়া-ষ্টেশন ফেরত ঝাঁক বাঁধা খালি ট্যাক্সির মত তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে আমি যেদিন সরকারী চাকরিতে প্রথম প্রবেশ করি সেদিনও আমি পুরো-দস্তুর এঞ্জিনিয়ার হইনি। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

পরীক্ষা দিয়েছি, ফলাফল বের হয়নি। ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি এখানে ওখানে। হঠাৎ মিশন-রো'র মোড়ে দেখা হয়ে গেল সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রত আমার সহপাঠি, একই সঙ্গে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পরীক্ষা দিয়েছি। সুব্রত বললে : কীরে নরেন, কেমন আছিস ?

বলি, হ্যাঁরে—আগামী সপ্তাহে না কি রেসাল্ট বের হবে ?

বললে—তাই তো শুনছি। তুই এখন কি করছিস্ ?

: করব আবার কি ? ভ্যারেণ্ডা ভাজ্ছি।

: সে কি রে ? চাকরি-বাকরি ধরিস নি ?

: রেজাল্টই বের হয়নি, চাকরি দিচ্ছে কে ?

সুব্রত হো-হো ক'রে হেসে ওঠে আমার কথা শুনে। তার কথায় জানতে পারি, আমাদের সহপাঠিরা প্রায় সকলেই কোথাও না কোথাও ঢুকে পড়েছে। সুব্রত নিজেও বুঝি কোন প্রাইভেট ফার্মে ঢুকেছে। এখন এ্যাপ্রেন্টিস এঞ্জিনিয়ার, রেজাল্ট বের হলেই পোস্টিং পাবে। সুব্রত বললে—ষ্টেটস্‌ম্যানের ওয়ান্টেড কলামটা পড়িস ?

স্বীকার করতে হল ওটা আমি আদৌ পড়ি না। আমার ধারণা ছিল রেজাল্ট বের না হওয়া পর্যন্ত কোথাও পাত্তা পাওয়া যাবে না। শুনে সুব্রত অবাক হয়ে যায়, বলে, এতদিন তাহলে কি করছিলি ?

সলজ্জে স্বীকার করতে হয়, একটা উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করছিলাম।

আবার হো-হো করে হেসে ওঠে সে। বলে, তোর এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে

আসাই ভুল হয়েছে নরেন। তা সে থাক্ গে। তুই বরং এক কাজ কর। সরকারী চাকরি করবি? তুই যে রকম গেঁতো-মার্কা, আর লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালবাসিস, তোর পক্ষে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসই ভাল। ওরা একটা নতুন স্কীম নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে হাসপাতাল তৈরী করার প্রোগ্রাম। রুরাল-হেল্‌থ-সেণ্টার-বিল্ডিং স্কীম। তের জন নতুন এঞ্জিনিয়ার নেবে, এক এক জেলায় এক একজন। দেখনা চেষ্টা করে। হয়ে যেতে পারে। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, সোজা গিয়ে চীফ-এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা কর।

ভয়ে ভয়ে বলি, রেজাল্ট বের না হতেই?

—কেন? তোকে কামড়ে দেবে?

এরপর আর না গিয়ে পারিনি। দুরু দুরু বুকে চীফ এঞ্জিনিয়ার সাহেবের ঘরে স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অল্প পরে ডাক পড়ল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রকাণ্ড একটা টেবিলে বসে আছেন। চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ বোস। ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। জানতে চাইলেন, আমি কী চাই। বললাম আমার কথা।

: চাকরি দিতে পারি, কিন্তু ক'লকাতায় হবে না, বাইরে।

: বাইরে মানে কোথায়?

: বালুরঘাট, দার্জিলিঙ অথবা বর্ধমান। যেখানে যেতে চাও।

এমন সহজ সরল প্রাঞ্জল জবাব পাব আন্দাজ করিনি। একটু ঘাবড়ে যাই। ভয়ে ভয়ে বলি, আমাদের রেজাল্ট কিন্তু এখনও বার হয়নি স্যার।

: আই নো।

বেল বাজিয়ে পি. এ-কে ডেকে পাঠালেন। সে ভদ্রলোক আসার পর তাঁকে বললেন, একে দিয়ে একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে নাও তো হে। ওর নাম আর রোল নাম্বারটাও আমাকে দিও।

ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারি না। নির্দেশমত পার্সোনাল এসিস্টেণ্টের কাছে একখানা দরখাস্ত লিখে দিয়ে এলাম। উনি প্রশ্ন করেন, কোথায় পোস্টিং চান? দার্জিলিঙ, বর্ধমান না পশ্চিম দিনাজপুর?

আবার ভয়ে ভয়ে বলি, আমার কিন্তু রেজাল্ট এখনও বার হয়নি।

পি. এ. হেসে বলেন, সে তো সাহেবকে একবার বললেন। আপনাকে নিয়ে পাঁচজন হল। সবাই আপনার ক্লাস ফ্রেণ্ড।

: নামগুলো জানতে পারি?

: স্বচ্ছন্দে। দেখুন না।

একটা ফাইল থেকে নামগুলো পড়ে গেলেন। সবাই আমার সতীর্থ, আমার সহপাঠি। জিজ্ঞাসা করি এরা সবাই জয়েন করেছে ?

: না। আপনি বোধহয় জানেন না, এভাবে সরকারী গেজেটেড অফিসার নিয়োগ করা হয় না। গেজেটেড-চাকরি চীফ এঞ্জিনিয়ার দেন না, দেয় পি. এস. সি। তাছাড়া রেজাল্ট বার না হওয়া পর্যন্ত চাকরির প্রশ্নই ওঠে না। তবে ডাক্তার রায়ের ব্যাপার তো জানেন। হেল্থ সেন্টার বিল্ডিং স্কীম এ্যাপ্রুভড হয়েছে, ক্যাবিনেট স্যাংসন দিয়েছেন, এ বছর টাকাও এ্যালটমেণ্টে ধরা হয়েছে, এখন এই মুহূর্তে কাজ শুরু না হলে তিনি কোন কৈফিয়ৎ শুনবেন না। আমরা আগাম কাজ গুছিয়ে রাখছি মাত্র। যাতে রেজাল্ট বের হওয়া-মাত্র আমরা এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার ছাড়তে পারি। কোথায় পোস্টিং চান বলুন। এখনও আমার হাতে আছে ব্যাপারটা।

দার্জিলিঙে বেজায় ঠাণ্ডা, সামনে শীতকাল। ওদিকে বালুরঘাট কলকাতা থেকে অনেক দূর। যেতেও হবে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে, হিলি দিয়ে। আসাম লিঙ্ক তখনও হয়নি। তারচেয়ে আমার ঘরের কাছে বর্ধমানই ভাল। তাই জানালাম পি. এ. কে।

উনি বললেন, কাল বাদে পরশু একবার খবর নিয়ে যাবেন। কেন, ? আর বললেন না। আমিও এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিনি। নির্দেশমত দুদিন পরে যেতেই উনি আমার হাতে একখণ্ড হলুদ রঙের কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যান, সীতাভোগ মিহিদানার দেশে যান এবার।

তাজ্জব ব্যাপার! রীতিমত নিয়োগপত্র। সরকারী ছাপমারা ফর্মের তলায় খোদ চীফ এঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষর! অবাক হয়ে বলি, তবে যে পর্শুদিন বললেন পাবলিক সার্ভিস কমিশন অনুমোদন না করা পর্যন্ত···

বাধা দিয়ে উনি বললেন, ঠেলার নাম বাবাজি। ডাক্তার রায়কে আপনি চেনেন না। আপনার নিয়োগপত্র পরে যথারীতি পি. এস. সি-কে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

: তাড়া রেজাল্টও বার হয়নি যে—

পি. এ এবার হেসে বলেন, আপনি পাশ করেছেন। ডব্‌ল্ কংগ্র্যাচুলেশন্স! এক নম্বর পরীক্ষায় পাশ, দু-নম্বর চাকরি পাওয়া।

আমি তাঁকে মামুলী ধন্যবাদটাও জানাচ্ছি না দেখে বলেন, ঐ যে সুনাম হেলথ সেন্টার টীম হচ্ছে ডাক্তার রায়ের পেট-টীম! তাঁর চেহারাটা দেখেছেন তো? গোটা রাইটার্স-বিল্ডিংস্ তাঁর দাবড়ানিতে কাঁপে। চীফ এঞ্জিনিয়ার সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিয়েছেন আপনাদের ক'জনের খবর। সাতটা দিন এগিয়ে গেল কাজটা। খাদা-জল খেয়ে এবার গ্রামে গ্রামে হেলথ সেন্টার বানান গিয়ে!

এই ছিল আমাদের আমলে এঞ্জিনিয়ারদের চাকরির বাজার। সদ্যস্বাধীন এক মহান উপদ্বীপে তখন শুধু কাজ আর কাজ। উনিশ শ আটচল্লিশ সালের কথা বলছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তখনও ছাপাখানা দূরের কথা টাইপ-রাইটারেরও মুখ দেখেনি। দু-শ' বছর বিদেশী শাসনে, সদ্যসমাপ্ত মহাযুদ্ধে, মহামারীতে এবং সর্বোপরি দেশবিভাগে তখন এ খণ্ডিত-বাঙলার একেবারে হাড়িডসার অবস্থা। রোগীর নাভিশ্বাস উঠেছে রীতিমত। খণ্ডিত এ পশ্চিমবাঙলায় সেদিন এক বৃদ্ধ চিকিৎসক তখন এগিয়ে এসেছেন এই অন্তর্জলী রোগীকে ডাঙায় টেনে তুলবেন বলে। নানান পরিকল্পনায় তিনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন একের পর এক। দ্রুতগতি বদলে ফেলতে দেশের চেহারা। রাস্তা বানাতে হবে, ব্রীজ বানাতে হবে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চাই—চাই হরিণঘাটায় দুগ্ধ প্রকল্পের রূপায়ন, কল্যাণীতে নূতন নগরীর পত্তন, চিত্তরঞ্জনে এঞ্জিন তৈরীর কারখানা স্থাপন, দুর্গাপুরে লৌহ-নগরী গঠন—দামোদর-কাঁসাই-ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের বাস্তবরূপায়ন। তার উপর চাই আধখানা বাঙলার উদবাস্তু মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ধুবুলিয়া-রূপশ্রী-কুপার্স' অসংখ্য ক্যাম্পে আশ্রয় দিয়েছেন মানুষগুলোকে; তাদের জন্য অনাবাদী নতুন জমি হাসিল করতে হবে, অসংখ্য উপনগরীর পত্তন করতে হবে। হাজার হাজার মাইল পথ বানাতে হবে; কলকারখানা সম্প্রসারণ করে তাদের কর্ম-সংস্থানের আয়োজন করতে হবে। এর জন্য চাই কারিগরী কাজ জানা মানুষ। রাজমিস্ত্রী, ছুতার, সার্ভেয়ার, ইলেকট্রিসিয়ান, প্লাম্বার, ওভারসিয়ার আর এঞ্জিনিয়ার। দু-পাঁচ শ' নয়, হাজারে হাজারে। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান কর্ণধার তিনি বলেছেন, 'আমি চাই আরও কারিগরী কাজ জানা মানুষ। হাজার হাজার এঞ্জিনিয়ার! মসীজীবী নয়, আইনজীবী নয়, ইস্কুলমাস্টার নয়, শুধু কারিগরী কাজ জানা মানুষ—এঞ্জিনিয়ার, সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মেটালাজিক্যাল, কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার।'

বর্ধমান অফিসে যোগ দিলাম পরের দিনই। ছোট্ট অফিস। সবে খোলা হয়েছে। একজন কেরানি, একটি পিয়ন এবং একজন ওভারসিয়ার। কেরানি পিয়নের নতুন চাকরি। আমারই মতন আনাড়ি, সরকারী আইন কানুনের ব্যাপারে। ওভারসিয়ার বিনয় মিত্তির অবশ্য পাকা পুরানো লোক। খোদ পি. ডাবলু ডি থেকে এসেছে। সরকারী চাকরি তার আট বছরের। ঘাঁৎ ঘোঁৎ জানে। আশাহুল্লা কলেজের ঝানু লোক। সেই এ অফিসটা ভাড়া করেছে। চার্জও বুঝিয়ে দিল সেই। চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল আসানসোলে। সেখানেই তার হেড কোয়াটার্স।

এই বর্ধমানেই সাক্ষাত পেয়েছিলাম স্বনামধন্য ময়ূরকেতন আগরওয়ালের। না, তখনও তিনি বাণিজ্য-চুম্বক হয়ে ওঠেন নি। তখনও ঠিক স্বনামধন্যও নন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

দিন সাতেকও চাকরি হয়নি আমার। একদিন কেরানিবাবু একখণ্ড কাগজ আমার সামনে বাড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন, এটার কি করব স্যার?

: কি ওটা?

: আজ্ঞে 'সার্ভে রিপোর্ট'। আসানসোলের এস. এ. ই পাঠিয়েছেন।

এস. এ. ই অর্থে সাব-অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার। অর্থাৎ কিনা ওভারসিয়ার। সেই আশাহুল্লা কলেজে পাশ আমার একমেবাদ্বিতীয়ম সহকারী বিনয় মিত্তির। তিনি নাকি ডাক যোগে একটি 'সার্ভে রিপোর্ট' পাঠিয়েছেন তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, অর্থাৎ সদ্য-চাকরি-পাওয়া এই অধম আনাড়ির কাছে, নির্দেশ চেয়ে। এবং কেরানিবাবু ফরেন এ্যাম্বাসাডার যে কায়দায় তাঁর ক্রিডেনসিয়াল বাড়িয়ে ধরেন, তেমনি সসম্ভ্রমে সেই কাগজখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন নির্দেশের অপেক্ষায়, এটুকু বোঝা গেল। কিন্তু কী হুকুম দেব আমি? কী হুকুম এ ক্ষেত্রে আমার দেওয়ার কথা? 'সার্ভে' মানে তো জরীপ। আসানসোলের ত্রিসীমানায় কোন জরীপের কাজ চলছে বলে তো জানিনা। ওভারসিয়ারবাবু তো কই সে কথা আমায় কিছু বলেননি কখনও। এই তো পর্শু ই আসানসোল থেকে ঘুরে এলাম! একটা পরিত্যক্ত মিলিটারী ক্যাম্প ভেঙে উদ্বাস্তুদের জন্য পি. এল. ক্যাম্প বানানো হচ্ছে। কোন জরীপের যন্ত্রপাতি তো তার ধারে কাছে দেখিনি? অথচ ওভারসিয়ারবাবু জরীপের একটা রিপোর্ট যখন পাঠিয়েছেন তখন জরীপ নিশ্চয় হচ্ছিল, আমি খবর পাইনি।

: তাহলে এটার কি করব স্যার ? তাগাদা দেন কেরানিবাবু।

আমাকে গম্ভীর হতে হয়। কিছুই যখন বুঝছি না তখন অফিসার জনোচিত গাম্ভীর্যটার প্রয়োজন সবার আগে। রাশভারী কণ্ঠে বলি : দেখুন, এসব হচ্ছে টেকনিক্যাল ব্যাপার। আপনাকে কিছু করতে হবেনা। যা করবার আমি করব। সার্ভে রিপোর্টটা রেখে যান।

কেরানিবাবু চলে যেতেই কাগজখানা নেড়ে চেড়ে দেখি। হরিবোল! কোথায় জরীপের রিপোর্ট! হলদে রঙের চারখানা সরকারী ছাপানো ফর্ম। চার বছর শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে মস্তিষ্কের সাহায্যে বাঘা বাঘা ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস আর আর. সি সি ডিজাইনের অঙ্ক নিয়ে ধস্তাধস্তি করেছি সেই মস্তিষ্কের সাহায্যে এ ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেলাম না। যেটুকু বুঝতে পারছি তার সঙ্গে সার্ভে বা জরীপের কোন সম্পর্ক নেই। মনে হচ্ছে লেখা আছে—পুরাতন মিলিটারী ছাউনি ভেঙে একুনে এক হাজার তিনশ একত্রিশ-খানি ভাঙা ঝরঝরে করোগেটেড টিন পাওয়া গেছে, যার কোন বাজার দর নেই, যা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডে কেউ কিনবে না। ফলে ঐ ভাঙা টিনগুলি রাইট-অফ্ করবার নির্দেশ দেওয়া হ'ক। অর্থাৎ কিনা ফেলে দেবার হুকুম দেওয়া হ'ক।

সযত্নে 'ডাক' থেকে সরিয়ে কাগজখানা প্যান্টের পকেটে রেখে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা অফিসার্স ক্লাবে রঘুদাসদাকে দেখাতে হবে কাগজটা। রঘুদাস-দা-ও পি. ডাবলু. ডি-র এঞ্জিনিয়ার। বর্ধমানেই পোস্টেড অন্য কাজে। রাস্তা তৈরীর কাজে। রঘুদাস বাউল আমার অনেক সিনিয়ার। রঘুদার মাধ্যমে এ ভাবে অনেক মুশ্কিলই আসান করতে হত তখন আমাকে।

ক্লাবে সুযোগমত কাগজখানা রঘুদাসদাকে দেখালাম। বলি, এ কী ধরণের 'সার্ভের' রিপোর্ট দাদা? কলেজে নানান জাতের সার্ভে শিখিয়েছিলেন প্রফেসার পি. বি. জি. ; —চেন সার্ভে, প্লেন টেবল, প্রিসম্যাটিক কম্পাস আর থিয়োডোলাইট ; কিন্তু ঝর ঝরে ভাঙা করোগেটেড টিনের সার্ভে—

রঘুদাসদা হো হো করে হেসে উঠে বলেন : দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন দ পি. ডবলু ডি দ্যান আর ড্রেম্‌ট অফ ইন য়োর কলেজ নোটস্! এ সেই কলেজী সার্ভে নয় ভায়া! পি. ডাবলু. ডি.-র আইনে সার্ভে রিপোর্ট শব্দটার একটা যোগরূঢ় অর্থ আছে ; অনর্থও বলতে পার। অর্থাৎ কিনা বাতিল মালের হিসাব, বেহিসাবও বলতে পার। হিসাবের বাইরে নেবার চেষ্টা ইতি বে-হিসাব!

কোন পাকা ছাদ মেরামত করতে গিয়ে তিন ইঞ্চি উচ্চতার একটি অশ্বত্থের চারা যদি লাখ টাকা কন্ট্রাক্টের ঠিকেদার উপড়ে ফেলে, আর তার মাপ যদি তুমি খাতায় তোল তবে ঐ অশ্বত্থ শিশুর অন্তিম গতির খতিয়ানটাও তোমাকে খাতা কলমে প্রমাণ দিতে হবে। মৃত অশ্বত্থ শিশুর জন্য উপরে একটি সার্ভে রিপোর্ট তোমাকে পাঠাতে হবে এবং উপরওয়ালার হুকুম ছাড়া সেই অশ্বত্থ শিশুর মৃতদেহটি সৎকার করা চলবেনা। সরকারী আইন বড় কড়া ভায়া। লাইনের টানেল পথে হাতীর ক্যারাভান নিয়ে ড্যাং ড্যাং চলে যাও কেউ টুঁ-শব্দটি করবেনা কিন্তু বে-আইনি সূঁচের ফুটোয় সুতো কেন গলেছে সে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জেরবার হয়ে যাবে তোমার।

: তা তো বুঝলাম কিন্তু ঐ ভাঙা টিনের কি গতি হবে?

: না দেখে কিছু করনা। সরেজমিনে স্বচক্ষে আগে গিয়ে দেখে এস ব্যাপারটা। হাজারের উপর টিনের হিসাব; হোক ভাঙা, না দেখে রায় দিওনা। যদি মনে কর নিলাম ডাকলে ও টিন কেউ খরিদ করতে আসবেনা তবে তোমার উপরওয়ালা অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারকে ঐ সার্ভে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিও 'রাইট অফের' নির্দেশ চেয়ে। অভার তিনিও দেবেন না, আনিয়ে দেবেন তাঁর উপরওয়ালার কাছ থেকে।

রঘুদার পরামর্শ মত পরদিনই আসানসোল ছুটি। সরেজমিনে এবং স্বচক্ষে দেখে এলাম ব্যাপারটা। হায় খোদা! কোথায় টিন! কড়কড়ে করে ভাজা নেমন্তন্ন বাড়ির পাঁপড় ভাজার ঝুড়ি! কে বলবে এগুলি এককালে করোগেটেড সীট ছিল। লুচি ভাজার ঝাঁঝরাতেও প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এতগুলো ফুটো থাকেনা। সবুজরঙের কামোফ্লেজ করা ব্ল্যাকসীট। কোন পদার্থ নেই, কেউ কিনবেনা। বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবার খরচও উঠবে না। ফলে কেনা দূরে থাক বিনা পয়সাতেও কেউ নেবেনা। সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এক্সিকিউটিভের কাছে সুপারিশ করে পাঠালাম রাইট অফের নির্দেশ চেয়ে। অর্থাৎ সরকারী খরচে মালটাকে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করতে।

সাতদিনের মাথায় জবাব এল উপর থেকে। আমার সাহেব আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। নির্দেশ পাঠিয়েছেন ঐ খাস্তা পাঁপড় ভাজার বাণ্ডিল নিলামে বিক্রয়ের চেষ্টা করতে। যদি কোন খরিদ্দার নেহাৎ না আসে তখন তিনি রাইট অফের নির্দেশ দেবেন—তার আগে নয়।

অগত্যা আবার দৌড়াতে হল রঘুনাথদার কাছে। তাঁর কাছ থেকে

যথোচিত নির্দেশ নিয়ে নিলাম, নোটিশ জারি করা গেল। নির্দিষ্ট দিনে আবার রওনা দিলাম আসানসোল মুখো। মনে আছে ট্রেনে যেতে যেতে মনে হয়েছিল কী বিচিত্র এই সরকারী আইন। পাঁচসিকে পয়সা দিয়েও যে মাল কোন নির্বোধে কিনতে আসবেনা তার পিছনে আমার দু-দুবার আসানসোল ট্যুর হয়ে গেল। আমার টি. এ. বিল বাবদ ইতিমধ্যেই গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গেছে সরকারের। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাপনাকে দোষারোপ করে কি হবে? এ দোষ তো আইনের নয়, আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্বুদ্ধিতা। খামোখা কেন তিনি নিলামের ব্যবস্থা করতে হুকুম দিলেন? একটি লোকও আসবেনা। অহেতুক আমার দৌড়াদৌড়িই পণ্ডশ্রম।

যা হোক স্টেশানে নেমে আমি একটা সাইকেল রিক্সা নিলাম। রওনা দিই সেই পরিত্যক্ত মিলিটারী ছাউনিটার দিকে। আমাদের স্টোর ইয়ার্ডের কাছাকাছি এসে দেখি খান তিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা জীপ, একটা স্কুটার এবং একখানা প্রকাণ্ড বিলাতী মডেলের কালো গাড়ি, ফোর্ড কিম্বা শেভ্রলে। এ আবার কি বখেড়া? গাড়ি কার?

ওভারসিয়ার বিনয়বাবু আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। হাত তুলে নমস্কার করে। প্রথমেই বলি: গাড়ি কার?

: যাঁরা নিলাম ডাকতে এসেছেন তাঁদের।

চমকে উঠি। ঐ গাড়িতে চেপে নিলাম ডাকতে লোক এসেছে এই তেপান্তরের মাঠে? আমি কিছু খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্লোগান টেণ্ডার ডাকিনি! আশপাশের দু পাঁচটা অফিসে নিলাম নোটিশ পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলাম নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে। এরা খবর পেল কেমন করে? ঐ খাস্তা টিন কিনতেই বা এসেছে কেন?

বিনয়বাবু একটু জনান্তিকে সরে এসে বললে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না স্যার। ইতিমধ্যে তিনজন এসেছেন নিলাম ডাকতে। পৃথক পৃথক। প্রথমে এসেছেন স্কুটারে চেপে একজন পাঞ্জাবী শিখ, তারপর ঐ জীপে চড়ে এসেছেন এক সিন্ধি ভদ্রলোক, আর এই কিছুক্ষণ আগে এসেছেন একজন মাড়োয়ারী ঐ প্রকাণ্ড কালো গাড়িটায়। কি বলব স্যার, তিনটেই পাঁড় মাতাল। কেউ কাউকে চিনত না, কিন্তু এখানে এসে ওদের বেশ দোস্তি হয়ে গেছে। পাঁট পাঁট মদ গিলছিল এতক্ষণ।

আমি বলি, তা নিজের পয়সায় মদ খেলে আপনি আমি বাধা দেবার কে? কিন্তু ওদের টিনগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন তো?

: হ্যাঁ স্যার এতক্ষণ তাই তো দেখাচ্ছিলাম ওদের। তিনজনেরই পা টলছে।

: চলুন তা হলে। সময় তো হয়ে এল।

: একটা কথা। আমাদের তো একটা রিসার্ভ ভ্যালু ধরতে হবে। কত থেকে শুরু করব?

আমার ধারণা ছিল পাঁচসিকে পয়সা দিয়েও এ মাল কেউ কিনবেনা। কিন্তু তিন তিনজন কাপ্তেন পেট্রোল পুড়িয়ে যখন এতদূর এসেছে এখন ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে। মাতালের কাণ্ড তো। দশ বিশ টাকা হঠাৎ হেঁকে বসতে পারে। আমি মতটা পালটে বললাম, পঁচিশ টাকা!

আমরা দুজনে অগ্রসর হয়ে আসতেই ওঁরা তিনজনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আইয়ে আইয়ে বৈঠিয়ে' বলে যেভাবে তিনজন অমায়িক আপ্যায়ন করতে থাকেন তাতে মনে হচ্ছিল আমিই খরিদ্দার, ওঁরাই অতিথি সৎকার করছেন বুঝিবা। একজন ড্রাইভার তাড়াতাড়ি বোতল আর গ্লাসগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেল, আর একজন ঝাড়ন দিয়ে আমার চেয়ারটা ঝেড়ে মুছে দিল। তিনজনের মুখপাত্র হিসাবে এগিয়ে এলেন মারবার তনয়। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবাপুরুষ, কপালে একটা শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, গলায় সোনার চেন, পরনে একটা লংকোট, মাথায় কাজকরা বাহারে টুপী। তিনি তিনজনের হয়ে সবিনয়ে নিবেদন করেন—সরকারী টিন তাঁরা দেখেছেন এবং তাঁরা তিনজনেই ঐ মাল খরিদ করতে ইচ্ছুক।

নিলামের নিয়মাবলী বুঝিয়ে দেবার একটা প্রথা আছে। আমি সে প্রচেষ্টা করবার উদ্যোগ করতেই ওঁরা আমাকে থামিয়ে দেন: উসব বাৎ তো লিখাই হয় নোটিশমে। আপনি নিলাম শুরু করেন হুজুর।

অগত্যা নিলাম ডাক শুরু করি: আমাদের ডিপার্টমেন্টাল রিসার্ভ ভ্যালু, পঁচিশ টাকা। পঁচিশ টাকা দর কেউ দিচ্ছেন? পঁচিশ রূপেয়া। পঁচিশ, পঁচিশ, পঁচিশ এক—

পাঞ্জাবী বলেন: পঁচাশ!

সিন্ধি বলেন: শও!

মাড়বার তনয় বলেন: শও পঁচিশ!

আমি তো থ! কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, আমি কিছু একটা বলবার চেষ্টা করতে করতেই ওঁরা আরও এগিয়ে যান।

: দেড় শত!

: দু শও!

: পুরা তিন শও!

আরে, এ কী কাণ্ড! আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, থামুন থামুন। আপনারা কোন টিনের বাণ্ডিল দেখেছেন বলুন তো?

ওঁদের মুখপাত্র হিসাবে সেই মারবারী ভদ্রলোকই আবার নিবেদন করেন: ঘবড়াইবেন না সর্! হামরা ঠিক স্ট্যাকই দেখিয়ে এসেছি। গুদামে তো পুরাণো ব্ল্যাকসীটের একটিই স্ট্যাক আছে, বাদবাকি তো বিলকুল নৌতুক গ্যাল-ভ্যানাইজড্ সীট। গলতি হোবে কেন? না কি বলেন উভারসিয়ারবাবু?

তা ঠিক! তা হলে এরা অমনভাবে ডাকাডাকি করছে কেন?

: তব ফিন্ ডাক চলুক নয়? না কি বোলেন?

আমাকে সায় দিতে হয়: উপায় কি? চলুক।

আমাকে আর পরিশ্রম করতে হচ্ছেনা। নিলামদারকে ওরা যেন আর পাত্তাই দিতে চায়না। তিনজনে বেশ মুখোমুখি বসেছে, যেন থ্রি-হাণ্ড ব্রীজ খেলছে, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবারও অবকাশ নেই। পাঞ্জাবী একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেন, আপ কেৎনা তক্ বাঢ়া খা জী? তিন শও? ম্যয় বোলতা হুঁ কি পুরা চার শও!

সিন্ধি ভদ্রলোকও ছোড়নেবালা নন। তিনিও একটি বর্মা সিগার ধরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, চারশ ও পঁচাশ!

মারবারী ভদ্রলোক রূপার বাটা থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখ বিবরে ফেলে চর্বন করছিলেন। কথা বলার সুযোগ নেই তাঁর, হীরের আর পোক-রাজের আংটি পরা দুটি আঙুলের সঙ্গে বাকি তিনটি আঙুল উঠিয়ে তিনি ইঙ্গিতে বললেন: পাঁচ।

পাঞ্জাবী বলেন: ঐসিন নেহি হোগা জী, কহ্ নে পড়েগা। খয়ের, ম্যয় বোলতা হু কি ছয় শও!

সিন্ধি সংক্ষেপে বলেন: সাত!

: আট!

: নও!

মারবার তনয় পানের পিক্‌টা ফেলে এবার বলেন: পুরা হাজার রুপেয়া!

উত্তেজনাতে কিছু না ভেবেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি।

মারবার তনয় ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলেন: ফিন্ ক্যা হুয়া?

আমি বলি: সর্ত অনুযায়ী যিনি সর্বোচ্চ দরে মাল খরিদ করবেন তাঁকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে নগদ টাকা জমা দিতে হবে—তা জানেন তো আপনারা?

হঠাৎ বাধা পড়ায় ওঁরা তিনজনেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মনে হল। ওঁদের ভাবখানা—আমরা তিন কাপ্তেন ডাকাডাকি করে নিলামের দর বাড়াচ্ছি আর তুমি কে হে হরিদাস পাল এসেছ নগদ টাকার গাওনা শোনাতে?

পাঞ্জাবী বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন: উ-বাৎ তো লিখাই হুয় নোটিশ মে স্যর?

সিন্ধি বলেন: বেশক্!

আমার সন্দেহ কিন্তু তাতে ঘোচেনা। কোথাও নিশ্চয় কিছু ভুল হচ্ছে। মারাত্মক ধরণের ভুল। হয় এরা তিনজনেই বদ্ধ উন্মাদ, নয় আমাকেই এখন যেতে হয় উন্মাদাশ্রমে। স্বচক্ষে না দেখলে আমার বিশ্বাসই হতনা, এই বাতিল টিনের জন্য কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ওয়ালা মানুষ হাজার টাকা খরচ করতে চায়। বাধ্য হয়ে বলি: আপনারা কেন এত বেশী দরে ডাকছেন আমি জানিনা, কিন্তু···

পাঞ্জাবী আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, ক্যা কুছ কসুর হুয়া হুয় হমারা?

মাড়োয়ারী তাকে থামিয়ে দিয়ে হাত দুটি জোড় করে আমাকে বলেন, একবাৎ পুঁছু স্যর?

: বলুন?

: সচ্ মুচ্ কহিয়ে তো, আপ নেহি চাতে কি হম ঔর ভি বাড়ে?

দুর ঘোড়ার ডিম। আমি নিলামদার, আমি দর বাড়াতে আপত্তি করতে যাব কেন? তাড়াতাড়ি বলি—না না, তা কেন? যত ইচ্ছে বাড়ুন না আপনারা। আমি আপত্তি করতে যাব কোন দুঃখে?

: আপ কো তো খুদ ইয়ে টিনা কো কোই জরুরৎ নেহি হুয় না?

: না না সরকার তো এ টিন বেচে দিতেই চাইছেন। তাই তো এই নিলাম ডাকছি।

মারবাড়িতনয় মুখটা নিচু করে এক চোখ বন্ধ করে বলেন : সরকারকা বাৎ না আছে বাবুজি, আপনার তো এ টিনার কোই জরুরৎ না আছে না?

তারপর প্রায় কানে কানে বলার স্বরে বলে—ইন্ লোগো কো ভিতর আপকো কোই বেনামদার না আছে না?

কী সর্বনেশে কথা! বেটা বলে কি? আমি ঐ টিন খরিদ করতে এই সিদ্ধি অথবা পাঞ্জাবীকে বেনামদার খাড়া করেছি? তাই বারে বারে বাধা দিচ্ছি দরটা বাড়ে না বাড়ে?

ধমক দিয়ে উঠি, কী যা তা বকছেন। বাড়ুননা যত খুশী বাড়াতে চান! তবে এরপর যিনি ডাকবেন, তাঁকে আপাতত আড়াই শ টাকা জামানত জমা রাখতে হবে।

পাঞ্জাবী বলেন, বহৎ বাৎ তো ঠিকই হায়।

সিদ্ধি ভদ্রলোক দেখছি কম কথার মানুষ। তিনি পুনরুক্তি করেন : বেশক।

যা হোক, তিন মক্কেলই পকেট থেকে বার করে দিলেন কড় কড়ে নোট।

মারবার তনয় গম্ভীর বকধার্মিকের মত হাত দুটি জোড় করে বলেন : অব হুকম দিজিয়ে সাব, হম শুরু করে? তিন বাড়তে চলে?

কারসিয়ার বিনয়বাবু আমার কর্ণমূলে নিবেদন করে : তিনজনেই পাড় মাতাল স্যার।

তা মাতালই হক আর দাঁতালই হক, বে-আইনি কাজ তো এরা কিছু করছে না। জান তো টনটনে। নগদ টাকা জামানত জমা দিয়েছে, খোশ মেজাজে নিলামের দর বাড়িয়ে চলেছে, আমি বাধা দেবার কে?

পাঞ্জাবী দাড়ির জালিটা খুলে ফেলেন। গালে দাড়ির জঙ্গলে বোধহয় একটা পোকা ঢুকেছে। চুলকাতে চুলকাতে আবার সেই প্রশ্নটি পেশ করেন তিনি : আপ কেৎনা তক বাঢ়া থা কী? পুরা হাজার? মায় বোলতা হুঁ কি এগারো শও রূপেয়া!

সিদ্ধি ভদ্রলোকও মাথার পাগড়িটা খুলে ততক্ষণে টাকে হাত বুলাচ্ছেন। কম কথার মানুষ তিনি, সংক্ষেপে বলেন বারা শও।

আমি বাধা দিচ্ছি না দেখে মারবার তনয় এতক্ষণে খুশীয়াল হয়ে উঠেছেন। এক টিপ জর্দা মুখ বিবরে নিক্ষেপ করে বেশ নাটকীয় ভাবে বলে ওঠেন : সাগ্ সাগ্ সাগ্ তেরা শও!

আমি ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর বাধা দেবনা। বেটা বলে

কিনা আমি বেনামদার খাড়া করে ঐ ভাঙা টিন কিনবার তালে আছি! বাড়ুক যত খুশী বাড়ুক ওরা। দেখা যাক্ কোন্ চুলোয় গিয়ে থামে। শেষপর্যন্ত পাগড়িটা মাথায় চড়িয়ে সিদ্ধি ভদ্রলোক উঠে পড়েন। জীপে গিয়ে বসেন। একটু পরে পাঞ্জাবীও পিছু হটলেন। শেষডাক ডেকে নিলেন ত্রিশ বত্রিশ বছরের ঐ মারবারী ভদ্রলোক নগদ এক হাজার সাত শ' পঞ্চাশ টাকায়।

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। পিয়নটাকে বলি, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও তো হে।

আবোল-তাবোলবর্ণিত হ্যাড়ার মত হাসি হাসি মুখে মারবারী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বলেন, হিসাব জুড়ে নিলম স্যর; এক এক টিনার দর হইল কি এক রূপেয়া পাঁচ আনা! বহুৎ সস্তা হইল, বিলকুল জলের ভাও।

ওভারসিয়ার ততক্ষণে অন্য একটি হিসাব করছিলেন, বলেন, চারশ' আটত্রিশ টাকা কলমানি জমা দিতে হবে আপনাকে। তার আড়াই শ' টাকা আপনি আগেই দিয়েছেন, সুতরাং বাকি থাকল—

বাঁ হাতে শূন্যে হাওয়ায় এক থাপ্পড় মেরে মারবার তনয় বিনয়বাবুকে থামিয়ে দেন: ছোড়িয়ে বহ্ বাৎ উপরসিওরবাবু। পুরা রূপেয়া লে কর মুঝে রসিদ দে দিজিয়ে।

আড়াই শ' টাকা আগেই দেওয়া আছে, আরও পনেরখানা করকরে একশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরেন ভদ্রলোক। রসিদ কেটে দিলাম। প্রাপক শ্রীময়ূরকেতন আগরওয়াল, সাকিন ধানবাদ, বিহার।

মাথামুণ্ড কিছুই বোধগম্য হলনা। আমার তো নতুন চাকরি, অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। পি. ডাবলু. ডি-র পোড়-খাওয়া ঘাঘু বিনয় মিস্তির পর্যন্ত তাজ্জব। টাকা জমা দিয়ে প্রথামত ভদ্রলোক রসিদ নিলেন সরকারী ছাপানো কাগজে। সীল ও সই দিতে হল আমাকে। লরি-মুভমেন্টের খানকতক পারমিট লিখে দিতে হল। বর্ধমান থেকে ধানবাদ যাবার অনুমতি পত্র। কবে মাল ডেলিভারি নেওয়া হবে তা জানা না থাকায় তারিখগুলো বসানো গেলনা।

বললাম, হাজার টিন নিয়ে যেতে এত লরি লাগবে কেন?

: লাগবে স্যার, টিনা খাড্ডা আছে না? আদা লাদ করা তো চলবেনা।

তা ঠিক। এক লরীতে বেশী মাল চাপালে নীচের টিনগুলো পাপর-ভাজার কুচো হয়ে যাবে।

কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে তিন-দুর্গ আঁকা সবুজ টিনের থেকে একটি সিগারেট খাইয়ে ময়ূরকেতন গাত্রোত্থান করেন, সবিনয়ে বলেন, মেহেরবানি হোয় তো আপনাকে টিসানে ছেড়ে দিতম্ !

মেহেরবানি করার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, আপনি রওনা দিন। আমার দেরী হবে।

পাঞ্জাবী এবং সিন্ধি ইতিপূর্বেই রওনা হয়ে গেছেন। উনিও তাঁর কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়িটা চেপে গ্র্যাণ্ড-ট্রাংক রোড ধরে পশ্চিমমুখো রওনা হলেন—ধানবাদের দিকে। যাবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে সাত-দিনের মধ্যে মাল উঠিয়ে নিয়ে যাবেন।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলি, এসেছিলাম নিলাম ডাকতে, দেখে গেলাম পি. সি. সরকারের ম্যাজিক !

বিনয় মিত্র কিন্তু হাসিতে যোগ দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বলেন, এ কী বখেড়া বলুন দেখি ! কোথাকার তিন পাঁড়-মাতাল এসে নিমেষে একেবারে দক্ষযজ্ঞ করে দিয়ে গেল !

আমি তখনও হাসছি, বলি : দক্ষযজ্ঞ হবে কেন ? এ তো ভালই হল ! আশাতীত দরে মালটা বিক্রি হয়ে গেল, এ তো আনন্দের কথা—

আমার নির্বুদ্ধিতায় বিনয় মিত্তির ক্ষুন্ন হয়েছেন মনে হল ; বলেন, আপনি ব্যাপারটা বুঝছেন না স্যার। আমি রিপোর্ট পাঠিয়েছি ও টিনের স্ট্যাক 'রাইট-অফ' করতে ; আপনি নিজে সরেজমিনে মাল দেখে গিয়েও লিখলেন 'রাইট-অফ' করতে। অর্থাৎ আপনার আমার মতে দু-পাঁচ টাকাও দর হবে না ও-টিনের। আমরা বলেছি, ঘরের থেকে খরচ করে লোক লাগিয়ে ভাঙা টিনের স্তূপ সরিয়ে জায়গা সাফা করতে হবে। আর মাল না দেখেই বড় সাহেব লিখে পাঠালেন, 'অক্সান' করতে। অমনি আমরা এক আন্দাজে রিসার্ভ ভ্যালু ধরলাম পঁচিশ টাকা ! আর কার্যকালে দেখা গেল মালটার প্রকৃত বাজার দর পৌনে দু-হাজার টাকা ! এরপর বড় সাহেব যদি মনে করেন, আপনি আর আমি—

সঙ্কোচে চুপ করে যায় বিনয় মিত্তির।

তাই তো ! এ দিক থেকে তো সমস্যাটা ভেবে দেখিনি।

বিনয়বাবুই বুদ্ধি বাতলান, এক কাজ করি স্যার, কোন ছুতোয় মালটা ডেলিভারি দিতে আমি দেরী করি—

: তাতে কি লাভ ?

: মালটা আপনি ই. ই-সাহেবকে স্বচক্ষে একবার দেখিয়ে দিন।

কী জবাব দেব বুঝে উঠ্‌তে পারি না। মিস্টার আগরওয়ালের আগ্রহ দেখে আমার মনে হয়েছিল, ঐ ঝরঝরে পাপর-ভাজার বাণ্ডিলগুলি তাঁর ভাঁড়ারে না পৌছানো পর্যন্ত বুঝি আজ রাতের আহারই তাঁর মুখে রুচবে না। বড় জোর রাতটা কাবার করে কাল সকালেই তিনি ট্রাক পাঠাবেন। নগদ টাকা যেভাবে মিটিয়ে দিলেন, আংশিক অগ্রিম নয়, পুরো টাকা, তাতে মনে হয় না যে উনি একদিনও দেরী করবেন। এ ক্ষেত্রে কোন ছুতায় ডেলিভারি দিতে দেরী করা যাবে ?

ওভারসিয়ারবাবু বলেন, সাহেবের ট্যুর প্রোগ্রাম তো এসেছে। আগামী শুক্রবারে তিনি আসছেন। সে ক'দিন যেমন করে হ'ক ঐ মাতালটিকে ঠেকিয়ে রাখব আমি।

সেই মতই ব্যবস্থা হল। ঘটনাচক্রে অবশ্য শুক্রবারের মধ্যে আগরওয়ালের লোক মাল ডেলিভারি নিতে এল না। এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের ট্যুর হয়ে গেল। নিলাম-ডাকের কলাফলটা আমি ইচ্ছা করেই তাঁকে তখনও জানাই নি। কাজ-কর্ম দেখানো শেষ হলে গাদা দেওয়া ভাঙা টিনের পাহাড়টা দেখিয়ে বলি : এটারই সাভে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম স্যার।

: ও, এই টিন ? এ আর অক্সান করে কি হবে ?

বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে আমাদের দু-জনেরই। আমি বলি, আজ্ঞে না, আপনার নির্দেশমত আমরা অক্সান করেছি। বেশ ভাল দর পাওয়া গেছে।

: তাই নাকি ? এ টিনের 'বিডার' এসেছে ? ক'টাকা দর উঠ্‌ল ?

: পৌনে দু-হাজারটাকা !

: হোয়াট ! কী যা তা বলছ ?

যেটুকু আশঙ্কা ছিল তাও ঘুচে গেল। এরপর আর সাহেব আমাদের দোষা-রোপ করতে পারবেন না, যে আমরা কোম্পানিকা মাল দরিয়াতে ঢালতে চেয়েছিলাম।

: চুপ করে আছ কেন ? এই টিনের দাম পৌনে দু-হাজার টাকা ?

রীতিমত ধমক খাচ্ছি ! কুলি মজুর যারা আশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা

বোধহয় ভাবছে আমি বিক্রেতা নই, ক্রেতা। অর্থাৎ পৌনে দু-হাজার টাকায় ঐ রদ্দি ভাঙা টিন আমি খরিদ করেছি সরকারী অর্থের অপচয়ে!

আদ্যপ্রান্ত ঘটনাটা তখন ওঁকে বিস্তারিত গল্প করি।

উনিও ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারলেন না। শেষে আমাকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে বললেন, ভিতরে কোথাও না কোথাও কিছু গড়বড় আছে। তুমি যে বর্ণনা দিচ্ছ সে জাতীয় বিস্‌নেসম্যান মাতলামি করে এভাবে টাকা ওড়ায় না। অতি ধূর্ত ওরা। মাতলামি বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি ব্যবস্থা কর যাতে সাতদিনের মধ্যে মালটা আগরওয়াল উঠিয়ে নিয়ে যায়। তুমি জান, দু-ওয়াগন নতুন গ্যালভানাইস্‌ড-সীট সাইটে আসছে ছাউনির কাজে। আমি চাই যে মাল এসে পৌঁছানোর আগেই যেন এ মাল ডেলিভারি হয়ে যায়। তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাল ডেলিভারি দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু তা যখন সম্ভবপর হচ্ছে না, তখন এ মাল ক্লিয়ার হয়ে গেলেই নূতন টিনের স্টকটা ভেরিফাই করাবে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। আমার দৃঢ় ধারণা ভিতরে কোন মাংকি বিসনেস্ আছে।

: মাংকি বিসনেস্ মানে?

: মানে তোমার ঐ বিনয় মিস্তির। এখন ভাব দেখাচ্ছে যেন ভাজা মাছ-খানা উল্টে খেতে জানেনা; কিন্তু সে নিজেই ঐ আগরওয়ালের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে তলে তলে। ডেলিভারি দেবার সময় বেশ কয়েক টন নূতন টিনও ভাঙা টিনের তলায় আত্মগোপন করে পাচার করা হবে।

অর্থাৎ রঘুদাসদার ভাষায় আইনের টানেল পথে হাতীর ক্যারাভান পাচার করার ব্যবস্থা।

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ মত ওভারসিয়ারকে কড়া তাগাদা দিলাম, এক সপ্তাহের ভিতর গুদাম সাফা করে ফেলতে। কিন্তু কী তাজ্জব ব্যাপার, ক্রমাগত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ক্রেতার কোনসাড়া পাওয়া গেল না। মাল উঠিয়ে নিয়ে যাবার কোন গরজই যেন নেই তার। বিনয়বাবুর উপর আমার সন্দেহটা ঘনীভূত হল এতদিনে। দু মাসের মধ্যে পাঁচটা রিমাইণ্ডার দিয়েও যখন জবাব এল না তখন ধানবাদের ঠিকানায় রেজিস্টারী চিঠি দিলাম রীতিমত ওকালতি ভাষায়। রঘুদাই চিঠিখানা ড্রাফ্‌ট্ করে দিলেন। 'হোয়্যারাস্' দিয়ে শুরু সে চিঠির বক্তব্য যে আগামী সাতদিনের মধ্যে বিক্রিত টিন উঠিয়ে না নিয়ে যাওয়া হলে আমরা মাল অন্যভাবে পাচার

করব, এবং সে ক্ষেত্রে আগরওয়ালের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে ধরা হবে।

এবার কাজ হল। ময়ূরকেতন আগরওয়াল সবিনয়ে জানালেন, অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় মালটা উঠিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর দেরি হয়েছে, এজন্য তিনি দুঃখিত। যা হোক নির্দেশমত সাতদিনের মধ্যেই তিনি আমার গুদাম সাবাড় করে দেবেন। দিলেনও তাই। একসঙ্গে অনেকগুলো ট্রাক এল, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সমস্ত ভাঙা টিন উঠিয়ে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমাদের নূতন টিনের ওয়াগন এসেছে। তাই তৎক্ষণাৎ মাষ্টার-রোলে লোক নিয়োগ করে নূতন টিনের স্টকটা আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গুনতি করালাম। না, নূতন টিন যেমন ছিল তেমনিই আছে। 'মাংকি বিসনেস্' কিছু হয়নি।

আগরওয়ালা এপিসোডের এখানেই শেষ। এরপর গত বিশ বৎসরের ভিতর ময়ূরকেতন আগরওয়ালের সাক্ষাত আমি পাইনি। ব্যাপারটা অবশ্য আমার কাছে অত্যন্ত রহস্য ঘন লেগেছিল। তিন তিন জন বেগানা লোক এসে অহেতুক ডাকাডাকি ক'রে নগদ পৌনে দু হাজার টাকায় এমন কতক-গুলো ভাঙা খাস্তা টিন কিনে নিয়ে গেল যা দিয়ে কোনও কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। সবটাই মাতালের খেয়াল? তা কেমন করে হবে? নিলাম নোটিশ দেখে তিন তিন জন লোক পৃথক পৃথক গাড়িতে ওখানে সমবেত হ'ল কেমন করে? নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট সময়ে তারা এল, রীতিসম্মত নিলাম ডাকল, আহ্বানমাত্র জামানত জমা দিল, এবং নিলাম শেষে বাকি টাকাও জমা দিল—এর কোনটাই তো মাতলামি নয়। তাহলে?

সমস্যার সমাধান অবশ্য হয়েছিল, অনেকদিন পরে। প্রায় তিন বছর পরে ওখান থেকে যখন বদলি হয়ে যাই তখন। বিনয় মিত্তিরই সমস্যার সমাধানটা পেশ করেছিলেন। ওভারসিয়ার মিত্তিরেরও মনে শান্তি ছিল না, এমন একটা তাজ্জব ব্যাপার কেন ঘটল জানবার জন্য তিনি রীতিমত অনুসন্ধান চালিয়ে-ছিলেন। শেষে একদিন সফলকাম হয়ে আমাকে জানালেন, আগরওয়ালের ব্যাপারটা এতদিনে পরিষ্কার হল স্যার।

: তাই নাকি? কী ব্যাপার বলুন তো?

: ঐ পাঞ্জাবী আর সিন্ধি ভদ্রলোক দুজন আগরওয়ালেরই লোক। আমাদের

আলাদা এসেছে, যাতে আমরা সন্দেহ না করি। ওরা দুজনেই বেনামদার এসেছিল দরটা বাড়াতে।

সমাধান কোথায়? এ যে আরও গুলিয়ে দিচ্ছে। একজন লোক মাল কিনতে এসেছে, এবং পাছে কম দামে মালটা কেনা হয়ে যায় তাই দুজন বেনামদার জুটিয়ে নিয়ে এসেছে—এ আবার কোন জাতীয় সমাধান?

বিনয়বাবু আমার অবস্থাটা অনুধাবন করেন। হেসে বলেন, সাড়ে সতের শ' টাকায় লোকটা আমাদের ঐ ভাঙা টিনের আবর্জনা কিনতে আসেনি আদৌ। সে এসেছিল ঐ টাকায় দুটি জিনিস কিনে নিয়ে যেতে। প্রথমত: ছাপানো সরকারী ফর্মে আপনার সীল ও স্বাক্ষর সমেত একখানা রসিদ, আর দ্বিতীয়ত: বাঙলা থেকে বিহারে পাচার করার উপযুক্ত খানকতক আনডেটেড্ গুডস্ মুভমেন্টের রোড পারমিট।

: ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলুন তো?

বিনয় মিত্তির রহস্যটা পরিষ্কার করে দেন। বে-আইনি সূঁচের ছিদ্র পথে আমরা সূতো গলাতে দিইনি, কিন্তু আইনের টানেল পথে হস্তযূথের লম্বা ক্যারাভান চলে গেছে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে। শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুংকেশন আগরওয়াল হচ্ছেন সদ্য স্বাধীন এ মহান উপমহাদেশের একজন সরকার অনুমোদিত করোগেটেড টিনের ডীলার। টিন হচ্ছে কণ্ট্রোল্ড কমোডিটি। বিভিন্ন প্রকল্পে হাজার হাজার টন করোগেটেড টিনের প্রয়োজন হচ্ছে। সরকার তাই কণ্ট্রোল করেছেন। সাধারণ ক্রেতা করোগেট টিন পাচ্ছে না। কালো বাজারে টিনের দাম আকাশ ছোঁয়া। এমনি বাজারে শ্রীযুক্ত আগরওয়াল আন্তঃ-প্রাদেশিক কালো বাজারে টিন বিক্রয় কারবারে নেমেছেন একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ফেঁদে। পাঁচ বছরে লক্ষপতি হবেন কোটিপতি! বাঙলাদেশে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ বাণ্ডিল টিন আসছে। বিহারে তাই টিনের কালোবাজারি দাম চতুর্গুণ! মন্ত্রী যোগে তিনি উদ্বাস্তু প্রকল্পের টিন পশ্চিমবাঙলা থেকে বিহারে পাচার করার উদ্দেশ্যে কয়েকশত জরি বিনিয়োগ করলেন। প্রতি ঘাঁটিতে পুলিশকে পান খাওয়াবার নিখুঁত ব্যবস্থা আছে। জরি পিছু কোন ঘাঁটিতে কত দস্তুরী দিতে হবে তা ঠিক আছে। আগরওয়ালের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকল্প-সূচীর সময় তালিকা মত ঠিকই চলছিল। এমন সময় বাঙলা-বিহার সীমান্তে যে চেক পোস্টটি আছে, সেখানে এসে হাজির হলেন একজন বেয়াড়া ধরনের গোঁয়ার পুলিশ-অফিসার। যাকে টাকা দিয়ে

কেনা গেল না। সন্ত স্বাধীন এ মহান উপদ্বীপে সে যুগে এ জাতীয় নির্বোধ সরকারী অফিসার মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে ওঁদের চালু কারবারে বাধার সৃষ্টি করতেন। কিন্তু তাই বলে তো কর্মবীর আগরওয়াল তাঁর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বানচাল হতে দিতে পারেন না। উদ্যোগী পুরুষসিংহ তিনি। তৎক্ষণাৎ বের হয়ে পড়লেন সমস্যা সমাধানে। কিছু রোড পারমিট তাঁর চাই ; আনডেটেড এবং লরির নাম্বার যাতে বসানো নেই। উদ্যোগী পুরুষসিংহকে কে ঠেকাবে ? সাড়ে সতের শ' টাকায় অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। সংগ্রহ করলেন সেই রকম খানকতক রোড পারমিট। ওঁর লোক সেই কয়টি ব্রহ্মাস্ত্র বুক পকেটে নিয়ে অকুতোভয়ে শত শত লরিতে হাজার হাজার বাণ্ডিল টিন পাচার করেছে বাঙলা থেকে বিহারে। সেই মূর্খসম্রাট অফিসারটির অধঃস্তন কর্মচারীরা ব্যাপারটা জানত। তারা বাধা দেয়নি। পাওনা-গণ্ডার হিসাবটা দেখে নিয়ে তারা চুপচাপ ছিল। আর অফিসার স্বয়ং যে কয়বার নিজে লরি থামিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন, আগরওয়ালের লোক তৎক্ষণাৎ লরি নাম্বার এবং তারিখ বসিয়ে রোড পারমিট দাখিল করেছে। সন্দেহ হবার কোন কারণ নেই। পি. ডাব্লু. ডি-র ছাপা সরকারী ফর্মে একজন গ্রেজেটেড অফিসার নগদ পৌনে-দুহাজার টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ দিয়েছেন আগরওয়ালকে, রোড পারমিট দিয়ে অনুমতি দিয়েছেন বিক্রিত টিন বাঙলা থেকে বিহারে নিয়ে যেতে। টিন নতুন কি পুরানো, ভাঙা কি গোটা তা তো আর কাগজে লেখা নেই। দু-চার-শ টাকার রসিদ হলে সন্দেহ হতে পারে তাই আগরওয়াল সাহেব দুজন বেনামদার সঙ্গে করে এনেছিলেন। তাদের একজন জালবাঁধা দাড়ি চুলকিয়ে এবং অন্যজন 'বেশক' মন্ত্র আউড়িয়ে টাকার অঙ্কটাকে রিসার্ভ ভ্যালু পঁচিশ টাকা থেকে ঠেলতে ঠেলতে পৌনে দু-হাজারে টেনে তুলেছিল। ভাঙা টিনগুলো ? সেগুলো বোধকরি গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ঐ মিলিটারী ক্যাম্প থেকে অদূরের কোন জলাজমিতে অন্তিমগতি লাভ করেছিল।

আগরওয়ালের সাক্ষাত আমি আর পাইনি। পেলে বোধকরি পায়ের ধূলো নিতাম তাঁর। আমাকে ভদ্রলোক স্রেফ বুদ্ধ বানিয়ে ছেড়েছিলেন।

। তিন।

তাই সুকুমারবাবু যখন কৌশিক মিত্রের মামলায় হঠাৎ আগরওয়ালের কথা তুললেন তখনই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম আমি। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম।

সুকুমারবাবুর আবির্ভাবও বিচিত্র।

আমার অফিসে এসে দেখা করেছিলেন তিনি। না, সেই বর্ধমানের ছোট্ট অফিসের কথা বলছি না। এ একেবারে হাল আমলের কথা, এই তো সেদিন। এ বিশ বছরে আমারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। কয়েক ধাপ উপরে উঠে বর্তমানে কলকাতায় অফিস খুলে বসেছি। অফিসে বসে কাজ করছি। আর্দালী একটি ভিজিটিং কার্ড এনে রাখল আমার টেবলে। সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ারের সাক্ষাত প্রার্থীর নাম শ্রীসুকুমার গুপ্ত, আই, পি। এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের অতি উচ্চপদস্থ অফিসার। টেলিফোনে যোগাযোগ করেন নি। বিনা এ্যাপয়েণ্টমেণ্টে অতবড় হোমরা চোমরা অফিসার হঠাৎ এসে পড়েন না। সাক্ষাতের বিষয়বস্তুর ঘরে লিখেছেন গোপনীয়। সে কথা লেখা বাহুল্য! এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের অফিসার হাঁচলেও তা গোপনীয়, কাশলেও তাই। আন্দাজ করি, আমার কোন কর্মচারীর বরাত ফিরেছে। বাঘের আবির্ভাব যখন ঘটেছে তখন আঠারো ঘা হবেই। টানা হেঁচড়া চলবে কাউকে নিয়ে। একটা জরুরী রিপোর্টের ডিক্টেশান্ দিচ্ছিলাম। কিন্তু ভিজিটেরের দাবী সবার আগে। স্টেনোকে সাময়িক বিদায় দিয়ে সাক্ষাত-প্রার্থীকে ডেকে পাঠাই। সুকুমারবাবু এসে বসলেন সামনের চেয়ারে। আর্দালীকে ডেকে দু' কাপ কফি বানাতে বললাম।

মিঃ গুপ্ত বলেন, এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আসিনি, এতও আপনার কাছে আসিনি ঠিক। আপনার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বাড়্লা হয়কে আপনার নামটা দেখেই কৌতূহল হল। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবে আপনার নামটা জানি।

সিগারেটের কেসটা বাড়িয়ে ধরে বলি, আপনি যে চাকরিতে আছেন,

তাতে আমার নামটা আপনার জানা আছে তবে আমি কিন্তু খুব কিছু উল্লসিত হতে পারছি না।

হো-হো করে ছাদ ফাটানো হাসি হাসলেন সুকুমার গুপ্ত। বলেন, আরে না না, সে সব কিছু নয়। খাকি পোষাক খুললেও আমার একটা পৃথক সত্তা থাকে, সে লোকটা বাঙলা গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। যেমন আপনি অফিস ফেরত ধড়াচূড়া খুললে—

বাধা দিয়ে বলি, বর্তমানে সাহিত্য আলোচনা করতে আসেননি নিশ্চয় ?

: না! আমি এসেছি একটা বিচিত্র অনুরোধ নিয়ে। অবশ্য হয়তো তাতে পরোক্ষভাবে আপনারও কিছু উপকার হতে পারে। একটা ভালো গল্পের প্লট পেয়ে যেতে পারেন।

: কী ব্যাপার বলুন তো ?

মিস্টার গুপ্ত যেটুকু ব্যক্ত করেন তার মর্মার্থ এই রকম :

কৌশিক মিত্র নামে একজন হাজতি আসামী আমার সাক্ষাতপ্রার্থী। সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত ছেলে। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বছর দুই আগে ফার্স্ট-ক্লাস নিয়ে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। ঘটনাচক্রে একটি খুনের মামলায় সে জড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ এনেছে। সে নাকি কোন উকিলের পরামর্শ নিচ্ছে না। সুকুমারবাবুর প্রচেষ্টায় অরূপরতন মহাপাত্র নামে একজন উদীয়মান এ্যাড-ভোকেটকে পাঠানো হয়েছিল তার কয়েদখানায়। আসামী তাকে ওকালত-নামা দিতে অস্বীকার করেছে—

বাধা দিয়ে বলি, কিন্তু আপনি তো খুনের মামলায় সরকার পক্ষের লোক। আসামীর উকিলের ব্যবস্থাপনায় আপনার গরজ কি ?

মিস্টার গুপ্ত বলেন, গরজ দু-তরফা। প্রথমতঃ বিচারাধীন আসামী যদি নিজ ব্যয়ে উকিল নিয়োগ করতে না পারে তাহলে সরকারী ব্যয়ে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আরও একটি কারণ আছে। সেটা ব্যক্তিগত। আমি নিজেই বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়েছি কেসটায়। বিবেকের কাছে আমাকেও একটা কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে কৌশিক যে এই মামলাটায় পড়েছে সেজন্য পরোক্ষভাবে আমিও দায়ী! আমি নিজেই একটা জাল বিস্তার করছিলাম একজন নামকরা ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারের বিরুদ্ধে। যেমন ধুরন্ধর লোক তেমনি উপর

মহলে প্রতিপত্তি-ওয়ালা রাঘব-বোয়াল। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার আশঙ্কাই ছিল ষোলো আনা। বস্তুতঃ পুলিশের জালে যে ময়ূরকেতন কোনদিন ধরা পড়বে এ সৌভাগ্য স্বপ্নেও ভাবিনি, কিন্তু—

আমি বাধা দিয়ে বলি, কী নাম বললেন? ময়ূরকেতন?

: হ্যাঁ। চেনেন নাকি? নামকরা লোক! ময়ূরকেতন আগরওয়াল!

নামটা শুনে কৌতূহল বেড়ে গেল আমার। প্রশ্ন করি: ময়ূরকেতন আগরওয়াল কি করোগেটেড টিনের ডীলার?

: এ প্রশ্নের কি জবাব দেব বলুন?

: কেন? 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। কাঠগড়ায় যেমন বলে।

: আপনি যদি বলেন 'রবীন্দ্রনাথ মানে কি সেই দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, যিনি বীরভূমের কি একটা গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করতেন?' তার কি জবাব দিতে পারি?

আমি হাসতে থাকি।

: হ্যাঁ ময়ূরকেতন আগরওয়াল করোগেটেড টিনের হোলসেল ডীলার, শুধু টিনের নয়, সিমেন্টেরও স্টকিস্ট। কিন্তু সেটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি কর্মযোগী। আধ ডজন লিমিটেড কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সভ্য। তিনটির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। এ ছাড়া স্বনামে ও বেনামে অনেকগুলি কারবারে তাঁর অর্থ বিনিয়োগ করা আছে। টাকার কুমীর!

: ধরতে পেরেছেন তাঁকে?

: আজ্ঞে না। বোধকরি ঐ আগরওয়ালের জাতের কাউকে দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।'

হাসতে হাসতে বলি, বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনছেন কেন?

: হ্যাঁ ঠিক কথা। রবীন্দ্রনাথ নয়, ময়ূরকেতনও নয়,—আমাদের আলোচ্য বিষয় কৌশিক মিত্র। কবি কৌশিক মিত্র!

: কবি? এই যে বললেন সে এঞ্জিনিয়ার?

: এরপর আবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে 'আপনি যতীন সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোকের কথা কখনও শুনেছেন?' কিন্তু সে প্রশ্ন করলেই আপনি তো বলবেন 'আবার কবি যতীন সেনগুপ্তকে টেনে আনলেন কেন?'

: বুঝলাম। অর্থাৎ বহিচ ইট কাঠ লোহা লক্কড়ের কারবারী তবু কৌশিক কবিতা লেখে—

: লেখে বয়, লিখত ! তা সেই কবি কৌশিককে গ্রেপ্তার করার পর তার ঘরটা আমরা সার্চ করি। বের হয় একখানা কবিতার খাতা, অথবা ডায়েরী। কৌশিক আমাকে অনুরোধ করেছে খাতাখানা আপনাকে পৌছে দিতে। মামলায় এভিডেন্স হিসাবে সে খাতার কোন প্রয়োজন নেই। বিচারে ওর কি হবে জানি না। খাতাখানা আমার কাছে আছে। আপনি অনুমতি করলে সেখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি। রসিদ দিয়ে খাতাখানা নিয়ে নেবেন।

আঁৎকে উঠি আমি—আমিতো কই কোন কৌশিক মিত্রকে চিনি না। আমি তার কবিতার খাতা নিয়ে কি করব ?

: আপনি তাকে চেনেন না। সে আপনাকে চেনে। বি. ই কলেজের রি-যুনিয়ানে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে কয়েক বছর আগে বুঝি আপনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে তখন ছাত্র ছিল, দূর থেকে আপনাকে দেখেছে। তাছাড়া আপনার লেখা বইও সে কিছু পড়েছে বলছে।

: তা হঠাৎ আমাকে কেন ?

: সে কথা সেই বলতে পারে।

: কোন জেলে আছে সে ? দেখা করা যাবে ?

: তা যাবে। তবে সে কলকাতায় নেই।

মফঃস্বল শহরটির নাম করতে বলি, ওটা তো আমার জুরিসডিকসনে। আমি ওখানে প্রায়ই ট্যুরে যাই।

: বেশ তাহলে যোগাযোগ করবেন। আমাকেও যেতে হয়।

এভাবেই কৌশিকের কেসটার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি। পরের সপ্তাহেই ঐ শহরে আমার একটা কাজ ছিল। কয়েকটা খাস্ জমির এনক্রোচমেন্ট ব্যাপারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এবং এ. ডি. এম. ল্যাণ্ড রেকর্ডস্-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হাজতি আসামী কৌশিক মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, তিনি ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। সহজেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। কৌশিককে জামিন দেওয়া যায়নি। মামলা এখনও কোর্টে ওঠেনি। এসব ক্ষেত্রে আসামীর উকিল ছাড়া অন্য কাউকে সচরাচর আসামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না ; কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের চেষ্টায় আমার কোন বাধা হয়নি। গরাদের দুপ্রান্তে দুজনে দাঁড়িয়ে প্রথম আলাপ করেছিলাম কবি

কৌশিক মিত্রের সঙ্গে। সেই প্রথম সাক্ষাতেই কৌশিক আমাকে বলেছিল, আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তা ভাবিনি।

বললাম : এত লোক থাকতে তোমার কবিতার খাতাখানা আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলে কেন ?

সে কথার জবাব না দিয়ে বলে : কবিতাগুলো পড়েছেন ?

: না পড়িনি ! তোমার কী উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে পড়ব বলে রেখে দিয়েছি।

কৌশিক হেসে বললে, প্রেমের গল্প তো অনেক লিখলেন, এবার আমাদের নিয়ে কিছু লিখুন না। প্রেম-ক্রেমের বলাই নেই, নিছক কাঠখোট্টা ব্যাপার। আমাকে হিরো করতে বলছি না, তবে আমাদের সমস্যাটা নিয়ে আপনি কিছু লিখলে আমি খুশী হতাম।

প্রশ্ন করি, বারে বারে 'আমাদের' বলছ। এই 'আমরা' কারা ?

: 'ডিসপ্রেসড' মানুষদের নিয়ে আপনি যা লিখেছেন তা পড়েছি, এবার 'মিস্‌প্লেসড্' মানুষদের নিয়ে কিছু লিখুন। যারা বাস্তুচ্যুত নয়, মাস্তুলচ্যুত। যারা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে মাঝ দরিয়ায়—কোন নিরাপদ বন্দরে নোঙর ফেলবার যারা সুযোগ পাচ্ছে না। উদ্‌বাস্তু নয়, তারা উদ্‌বৃত্ত ! সারপ্লাস ! আমি ভারতবর্ষের বাইশ হাজার বেকার ডিগ্রিধারী এঞ্জিনিয়ার আর ত্রিশ-চল্লিশ হাজার ডিপ্লোমাধারী টেকনিসিয়ানদের কথা বলছি।

সুকুমার গুপ্ত সাহেবের কাছে মোটামুটি ব্যাপারটা শুনেছিলাম। কৌশিক বছর দুই আগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। কলেজে একজন প্রফেসর অফ-ট্রেনিং আছেন। পাশ করা ছেলেরা যাতে ট্রেনিং এর সুবিধা ঠিকমত পায় তাই দেখেন তিনি। এই ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলেটিকে কোন প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ভদ্রলোক। সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। সব জায়গা থেকেই জানানো হয়েছিল—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী ! অথচ আজ থেকে ছয় সাত বৎসর আগে কৌশিক যখন হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে তখন এই বেকার ছেলেটির জন্ত সর্বত্রই দ্বার অবারিত ছিল। সে অনায়াসে ডাক্তারী পড়তে পারত। পদার্থ, রসায়ন এবং গণিত তিনটে বিষয়েই তার লেটার মার্ক ছিল। যে কোন এক-টাতে সে অনার্স পড়লে ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারত। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে পারত। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে কেন মরতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসে-ছিল আদৌ।

কৌশিক জবাবে হেসে বলেছিল, সে কথা তো আমি বলব না। সে কথা বলবেন আপনি, আপনার উপন্যাসে। তবে শুনেছিলাম, দেশের যিনি কর্ণধার, তিনি নাকি বলেছিলেন, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলে প্রাথমিক প্রয়োজন হাজার হাজার কারিগরী কাজ জানা মানুষ। টেকনিসিয়ানস্ আর এঞ্জিনিয়ার। কাগজের কাটিং আছে আমার কাছে। দেব আপনাকে পড়ে দেখবেন!

: তোমাদের ব্যাচে যত ছেলে পাশ করেছিল, তাদের আন্দাজ কতজন এখনও বেকার আছে?

কৌশিক হেসে বলে, শুধু আমাদের কলেজের স্টাটিসটিক্স নিলেই তো চলবেনা; খণ্ডিত বাঙলায় আজ ছয়টি গর্ভনমেণ্ট অনুমোদিত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে গোটা বাঙলা দেশের জন্য ছিল একটি মাত্র! সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট তখন হত শুধু শিবপুর থেকেই। আজ দলে দলে পাশ করে ছেলের দল বেরিয়ে আসছে, আর তাদের বলা হচ্ছে তারা সারপ্লাস! কোথাও তাদের ঠাঁই নেই! আমার একজন সতীর্থ, পাশকরা এঞ্জিনিয়ার প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারি করছে, একজন বাটার দোকানে জুতা বিক্রি করে, একজন স্টেশানারি দোকান খুলে বসেছে। আমি তো খুনের মামলার বিচারাধীন আসামী! জানিনা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলকাতার অসংখ্য ব্যাঙ্ক ডাকাতি কেসে আমার অন্য কোন সহপাঠি ফেরার হয়ে আছে কিনা!

বেকার মানুষটা হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরছে একটা কাজের সন্ধানে। পায়নি। ঠিকাদারী করতে চেয়েছে, দেওয়া হয়নি তাকে। কেরানির কাজ, স্কুল-মাস্টারির কাজের জন্য দরখাস্ত করেছে। মঞ্জুর হয়নি। যেখানে সে ওভার-কোয়ালিফায়েড। সব শেষে এসে আশ্রয় পেয়েছে জেল হাজতে। বললাম, শুনেছি তুমি কোন ডিফেন্স দিচ্ছ না। কেন? গিল্‌টিও তো প্লিড করনি তুমি।

: গিল্‌টি প্লীড করতে যাব কোন দুঃখে? গিল্‌টি আমি, না যারা কোনঠাসা করে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে?

: না, আমি হোমিসাইড কেসটার কথা বলছি, খুনের মামলাটা!

: আমিও তো তাই বল্‌ছি! সুস্থ-সবল শিক্ষিত একটা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, ভুল নির্দেশ দিয়ে, শেষ পর্যন্ত যারা খুন করল, তাদেরই আমি

পিলুটি মনে করি। যাঁরা বলেছিলেন, দেশের প্রয়োজন হাজার হাজার এঞ্জিনিয়ারের।

বুঝতে পারি, কৌশিক ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলি, কিন্তু সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হলে তোমাকে তো জেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেজন্য এখন তোমার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একজন উকিলের। নয় কি ?

কৌশিক হাত দুটি জোড় করে বলে : না! অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সখ আর আমার নেই। অনেক কষ্টে অন্নচিন্তা দূর হয়েছে আমার। নিশ্চিন্ত বন্দরে নোঙর ফেলতে পেরেছি। ধর্মাবতার যদি ম্যানিলা রোপের সুবন্দোবস্ত করেন তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেল, আর না হলেও দীর্ঘদিন সরকার আমার অন্নজলের আয়োজন করবেন। খেটে খেতেই চেয়েছিলাম। এখানেও সে ব্যবস্থা আছে।

. একটু থেমে আবার বলে, তবে কি জানেন, এককালে কবিতা লিখতাম। আপনি লেখক মানুষ আর কেউ না বুঝলেও আপনি আমার বেদনাটা বুঝবেন। কবিতাগুলো কোথাও প্রকাশ করিনি, চেষ্টাও করিনি। সেগুলো জেলখানার দপ্তরে উইপোকার অত্যাচারে শেষ হয়ে যাচ্ছে মনে হলে জেলে বসেও স্বস্তি পাবনা আমি। আমার অনেক বিনিদ্র রাত্রের সাক্ষী ওরা। তাই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম! আপনি ওগুলো পড়লেন কি ওজনদরে পুরানো কাগজওয়ালাকে বেচে দিলেন তা জানার আমার আর কোন প্রয়োজন নেই, সুযোগও হবে না।

: কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকে কেন ?

: তার কারণ আমরা একই প্রফেসানের লোক। তার উপর আপনি লেখেন-টেখেন! হয়তো আমাদের সমস্যা নিয়ে কিছু লিখতেও পারেন।

সুকুমার গুপ্ত মশায়ের সাহচর্যে থানার আটকপড়া তার ডায়েরি বা কবিতার খাতাগুলোর নাগাল পেয়েছিলাম। বিভিন্ন সময়ে ডায়েরি লিখেছে কৌশিক। না, ঠিক কবিতার খাতা নয়। ডায়েরির ফর্মে লিখতে লিখতে হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করেছে। বিভিন্ন যুগের রচনা আছে মোটা বাঁধানো খাতাটায়। পাঁচসাত বছরের ইতিকথা। প্রতিটি রচনার তারিখ আছে। প্রথম পাতাখানা দেখে বুঝছি খাতাটা বছর পাঁচেকের পুরাতন। ও তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং

কলেজের আবাসিক। প্রথম যুগে ওর রচনা ছিল সাধুভাষা ঘেঁষা। ক্রিয়া-পদগুলি সাধু ভাষায়। কৌশিক মিত্র বি, ই. কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র হিসাবে ছিল পুরোপুরি রোমান্টিক কবি। একটু উদাহরণ দিই :

"অনেকদিন পরে আজ কবিতা লিখিতে ইচ্ছা জাগিতেছে। দীর্ঘ দিন কবিতা লেখা বন্ধ আছে। বস্তুতঃ এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে আসিবার পরেই কবিতা লেখা বন্ধ করিয়াছি। ইট কাঠ লোহা লক্কড়ের এ অরণ্যে কাব্যলক্ষ্মী পথ হারাইয়াছিলেন। খাতায় গত দুই বৎসরের ভিতর কোন কবিতা যুক্ত হয় নাই। কিন্তু এভাবেই কি কৌশিক মিত্রের কবিসত্তা অন্তিম গতি লাভ করিবে ? কংক্রিটের স্তূপে কাব্যলক্ষ্মীর কবর রচিত হইবে ? যে পরিবেশে আসিয়া পড়িয়াছি তাহারই ভিতর হইতে আমাকে রস আহরণ করিতে হইবে। সঞ্জীবচন্দ্র-বর্ণিত পালামৌএর পাথরের ফাটলের সেই গাছটির কথা আজ মনে পড়িতেছে। আমাকেও তাই চিরাচরিত চাঁদ-ফুল পাখীদের বিদায় জানাইতে হইবে। ইট-কাঠ-বীম-বর্গাই আমার কাব্যের উপাদান ! এই প্লেট গার্ডার ব্রীজ, এই ষ্টীল-স্ট্যানসন, এই আর সি. সি. ডিজাইনের ভিতরেই যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুকুমার তাহাকেই মেলিয়া ধরিব।

'এ রাজ্যে সুন্দর সুকুমার কিছু নাই ? নাই থাকিল। শুধু সৌন্দর্য এবং সৌকুমার্যই যে কাব্যের উপদান নহে তাহা উপলব্ধি করিবার মত বয়স সাহিত্যের হইয়াছে।

"আজ এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে তাই কবিতা লিখিতে বসিয়াছি। সার্ভে ক্যাম্পের অপর তিনজন কক্ষবন্ধু ক্লান্ত ভাবে নিদ্রামগ্ন। সমস্ত দিন মাঠে মাঠে জরীপ করিয়াছি, তারপর সন্ধ্যা বেলায় ফুলপ্যান্ট হইতে চোর কাঁটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে গল্প করিয়াছি। সন্ধ্যার পরে ক্যাম্প ফায়ারের হল্লোড়। তারপর সারযাপ সারিয়া বসিয়াছিলাম ফিল্ড-বুক লিখিতে। দশটা বাজিতেই যে যাহার তাঁবুতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি মোমবাতি জ্বালিয়া এই দিনপঞ্জি লিখিতেছি।

"বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। খরস্রোতা নদীর বামতীরে বালিয়াড়ির উপর জঙ্গলের শেষ প্রান্তে আমাদের এই সার্ভে ক্যাম্প। তাঁবুর একটা কানাৎ তুলিয়া দিয়াছি। বাহিরে জোনাকী পোকার ইতস্ততঃ বিচরণ—অসংখ্য সঞ্চরমান আলোকবিন্দু। আর ঝিকমিক দিয়া জ্যোৎস্নার আলোর রূপালী আস্তরণ। রাত্রিচর কি একটা পাখী অনেকক্ষণ

ধরিয়া একটানা ডাকিতেছে—হুক্‌-হুক্‌-হুক্‌-হুক্‌। শীতকালে কত জাতের কত পাখীই না আসে এ অঞ্চলে। সহস্র সহস্র মাইল অতিক্রম করিয়া বরফ-জমা দুরন্ত শীতের রাজ্য হইতে উহারা এখানে উড়িয়া আসে, সাময়িক আশ্রয়ের আশায়। আমরা যে বন্দুকধারী শিকারীর দল নহি এ সত্যটা বুঝিতে উহাদের প্রথম কিছুদিন সময় লাগিয়াছে। এখন আর থিওডোলাইট অথবা লেভলিং যন্ত্রকে বন্দুক বলিয়া ভুল করেনা। এখন খুব কাছে যাইলেও উড়িয়া যায় না। কিন্তু না, চাঁদ নয়, জোনাকী, পাখী নয়—আজ আমার কাব্য চর্চার উপকরণ ঐ সার্ভে চেন। খাটিয়ার নিচে চেনটা গোটানো অবস্থায় পড়িয়া আছে। সে বেচারিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া দৌড়াইয়াছে। আমরা চারবন্ধু যেন সে সব কথা বেমালুম ভুলিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছি, অভিমানক্ষুব্ধা উহার কথা আমাদের খেয়ালই নেই। কান পাতিলে শুনিতে পাইতাম ও-ও যেন বলিতে চাহে 'কেন কাঁদি, বুঝিতে পার না? তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি, এ শুধু চোখের জল, নহে ভৎর্সনা! বস্তুবাদী আমার তিন প্র্যাকটিকাল হবু-এঞ্জিনিয়ার বন্ধুর কাছে অভিমান ক্ষুব্ধা ঐ সার্ভে চেনের কথা পৌঁছাইবেনা, তাই আমি আজ রাত্রে উহার সহিতই কিছু গোপন কথা বলিতে চাই। আজ রাত্রে সেই আমার কাব্য নায়িকা:

আজকে আমার কাব্য চলে সার্ভে চেনের সঙ্গে রে
হাসিস্ না কেউ পাগলা কবির পাগলামির এই রঙ্গে রে।
ক্যাম্পে গোলাপ বকুল কোথায়? এ জঙ্গলে কই প্রিয়ে?
সার্ভে চেনেই দেখছি শুধু লিখব যা হয় ওই নিয়ে।
হাসিস্ নে কেউ, হাসিস্ নে।
না হয় তোরা ক্যাম্পে কবির খুঁজতে কাব্য আসিস্ নে।
"তাঁবুর মাঝে পায়ের কাছে গুটিয়ে আছে চেনটা ওই,
সার্ভে তাঁবুর নির্জনেতে রইবে কে আর ও চেন বই?
পথ-বিপথে আমার সাথে ওই তো একা সঙ্গীরে
ছুটছে দেখি ডিঙিয়ে পাহাড়, ছুটছে গহন বন চিরে।
দুপুর রোদে পাশেই আছে, আমার সাথেই এক ঘরে
খাটের নিচে গুটিয়ে তবু রাত্রি কাটায় রাগ করে।
ফের সকালে রাগ রবেনা এমন বন্ধু কার আছে?

খাটিয়া তলে গুটিয়ে দেহ চুপ করে শোয় পা'র কাছে।
হাসিস্ নে কেউ হাসিস্ নে।
ইচ্ছা না হয় মোর বঁধূরে না হয় ভাল বাসিস্ নে॥

"সহপাঠি সুরেশ নাগের বোধকরি নিদ্রায় ব্যাঘাত হইতেছে'। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোর ফিল্ড-বুক লেখা এখনও হলনা রে ?

"বলিলাম : ফিল্ড-বুক নয়, কবিতা লিখছি!

: কবিতা! হায় খোদা! এই ক্যাম্পে এসেও তোর ঘোড়া রোগ সারেনি। এখানেও কবিতা ? কাল সকালেই গ্রুপ বদলাতে হবে। এ পাগল কবির সঙ্গে বেহদ্দো রাত জাগা আমার পোষাবে না। তা কি নিয়ে লিখছিস্ ? কবিপ্রিয়টি কি কল্পনাকুমারী না বাস্তবিকা ?

: বাস্তব!

: মাইরি! —খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসে সুরেশ। রোমান্সের গন্ধে ঘুম ছুটিয়া গিয়াছে। বলে : পড়তো একটু, শুনি। কে রে মেয়েটা ? আমি চিনি ?

বলিলাম : খুব চিনিস্। কবিপ্রিয়া এখানেই আছে কিন্তু।

: এখানে মানে ? এই ক্যাম্পে ?

: হ্যাঁ শোন্ না।

কিন্তু সুরেশ নাগ প্রাকটিক্যাল এঞ্জিনিয়ার! প্রথম দুই স্তবকও ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে পারিল না। বলিল : মারো গুলি! শেষ বেশ সার্ভে চেনের সঙ্গে প্রেম করছিস্ ? তোর কপালে দুঃখ আছে।

"পাশ ফিরিয়া আবার শুইয়া পড়ে। আমি শেষ স্তবকটি সমাপ্ত করি—

"লোহার গড়া শীর্ণ তনু সরীসৃপের মতন রে,
সার্ভেয়ারের সিংহাসনে সবার সেরা রতন রে।
কণ্ঠে প্রিয়ার লকেট দোলে, কেউ জানেনা সেই খবর
দুই হাতে দুই কাঁকন ছাড়া আর তো কিছুই নেইক ওর।
যখন হাতে শেকল পড়ে তখন তো কই হাসিস্ নে ?
আমার প্রিয়া শান্ত বলে তাই কি ভালবাসিস্ নে ?
তন্বী প্রিয়া চায়না আমার বাঁধতে তুচ্ছ মানুষ জন,
ইচ্ছা তাহার বাঁধবে ঘিরে নিখিল বিশ্ব তিন ভুবন।
হাসিস্ নে কেউ হাসিস্ নে।
ভিটের জমি জরীপ করে আমার প্রিয়ার আশীষ নে॥"

কবি কৌশিক মিত্রের অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি। আমি হেসে ফেলেছিলাম। মার্ভে চেন নিয়ে আমাকেও নাড়াচাড়া করতে হয়েছে ; কিন্তু তার মধ্যে অভিমানক্ষুব্ধা স্ফুরিতাধরা কোন নায়িকাকে দেখিনি কখনও। কৌশিক বলেছে বটে যে চাঁদ-তারা-ফুল পাখী তার কাব্যের বিষয়বস্তু নয়, কিন্তু তাই বলে চাঁদকে তার ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়নি। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ঘরের ছেলে সে, প্রাচুর্যের মধ্যে না হক, অভাবগ্রস্ত হা-ঘরে ঘরের বাতাবরণে তার বাল্য ও কৈশোর কাটেনি। চাঁদ-ফুল-পাখীকে নিয়ে সে যদি বিলাসিতা করতে না চায়, তবে তার হেতু এ নয় যে ক্ষুধার তাড়নায়, অভাবের যন্ত্রনায় সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তার কাব্যের বিষয়-বস্তু অধিকাংশই এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প থেকে বেছে নেওয়া—নাট-বল্ট্, রেঞ্জ, সেট-স্কোয়ার, করাত বাটালি, কিম্বা ছুতার কামার-রাজমিস্ত্রিরাই তার কাব্যের নায়ক। কখনও কখনও তার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন ধরা যাক্ সিগারেটের স্ট্যাম্পের উপর লেখা তার কবিতাটি। আদিযুগের ওর সব কবিতাই ছন্দবদ্ধ, স-মিল, অধিকাংশই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এবং সর্বত্রই একটা রোমান্টিক আমেজ। 'স্টাম্প' কবিতাটি উদাহরণ হিসাবে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

"অন্ধকার পথপ্রান্তে ক্ষীয়মান লয়ে ক্ষুদ্র আয়ু
পড়ে আছি ;—মুহূর্তেই পুড়ে হব ছাই।
ধূমভস্ম শেষ শ্বাসে লুপ্ত করি দিবে যবে বায়ু
এ ধরায় শেষ চিহ্ন আর কিছু নাই।
কোন কীর্তি রহিবেনা স্মরি নাম এ ধরার বুকে,
অনন্ত জিজ্ঞাসা পিছে অন্ধকার উদ্বেল সম্মুখে
জীবনের লেনা-দেনা যতকিছু সবই যাবে চুকে
পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেব জীবন পাতায়।
ব্যর্থ, ব্যর্থ বৃথা জন্ম ! অবজ্ঞায় ফেলে দেছ ছুঁড়ে,
প্রয়োজন ফুরায়েছে, ফুরায়েছে কাজ ;
আপনার বহ্নিতেজে স্মৃতি লয়ে মরি পুড়ে পুড়ে
এ্যাস্‌ট্রে বা পথপ্রান্তে ছাই হব আজ।
উপেক্ষিত এ প্রবাহ নিবিবেনা কারও অশ্রুপাতে,
হয়তো জলিব একা অতিক্রান্ত যৌবনের সাথে,

নয়তো দাহন মোর শেষ হবে কারও পদাঘাতে—
নিষ্পেষণে নিবে যাবে জীবনের দায়।
তবু জানি হে সোকার! আজও মোর কিছু আছে বাকি
সেই স্মৃতি বুকে লয়ে আজও দিন গোনা;
মনে পড়ে একদিন এই হাতে বেঁধেছিলে রাখী
নিয়েছিলে তুলি' মোরে তুমি আনমনা?
মনে আছে আলগোছে ধরেছিলে মোরে সযতনে?
মনে আছে কী সোহাগ করেছিলে চুম্বনে চুম্বনে?
বিদায় বেলায় আজ সেই স্মৃতি গেঁথে লব মনে;
'এ-শুধু চোখের জল, নহে ভর্ৎসনা।"

এ কবিতাগুলি যখন সে লিখেছে তখন কতই বা বয়স হবে ওর? উনিশ-কুড়ি। সমস্ত দুনিয়াকে সে তখন দেখছে রোমান্টিক দৃষ্টিতে। আগেই বলেছি, কবিতার বিষয়-বস্তু সে বেছে নিয়েছিল তার জীবন থেকেই। ইট, কাঠ, সিমেন্ট, লোহা, বীম, বরগা। তবু ওর মধ্যেই সে সর্বদা মধুরকে, সুন্দরকে, আনন্দঘন জীবনকে খুঁজতে চেয়েছে। কঠিন দুর্মদ বাস্তবের প্রতি সে উদাসীন নয়—কিন্তু তার কবিসত্তা সেই কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করে দেখতে চেয়েছে ভিতরে নরম শাঁস আছে কিনা। সে কুলি-মজুরদের নিয়ে কবিতা লিখেছে, রাজমিস্ত্রি ঢালাই-মিস্ত্রিদের নিয়ে কাব্য করেছে—কিন্তু মানুষের প্রতি সে তখনও বিশ্বাস হারায়নি। কবি যতীন সেনগুপ্তের প্রভাব তখন তার উপর খুব বেশী মাত্রায়। তার সৌন্দর্য-পিপাসু মন পাথরের ফাটল থেকেও জীবনরসের উৎস সন্ধানে অভিসারী, পাস্তায়ো বর্ণিত সেই গাছটির মতো। কলেজ থেকে তৃতীয় বার্ষিক ছেলেদের বুঝি ভিহরী অন শোনের কাছে ডালমিয়া নগরে সিমেন্ট, চিনি আর কাগজের কারখানা দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওর সতীর্থ বন্ধুরা নিশ্চয়ই নানারকম নোট লিখে নিয়ে এসেছিল, পরীক্ষা সমুদ্রে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে। হয়তো কৌশিকও লিখেছিল, কিন্তু তাছাড়াও সে ডায়েরিতে লিখেছে:

"প্রফেসার সেনগুপ্ত আমাদের সমস্ত কারখানাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইলেন। চিনির কারখানা। রেলওয়ে ওয়াগনে করিয়া লক্ষ লক্ষ ইক্ষুদণ্ড আসিতেছে, বিরাট যন্ত্র, দৈত্য ক্রমাগত সেই ওয়াগন ভর্তি ইক্ষুদণ্ড প্রকাণ্ড মুখ-ব্যাদান করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে। তারপর কত ক্রিয়া, প্রক্রিয়া,

কত যন্ত্র-যন্ত্রণার পথ বাহিয়া সেই ইক্ষুগুলি শেষ পর্যন্ত শুভ্র শর্করার বেশে সহস্র সহস্র বস্তায় রূপান্তরিত হইয়া আবার ওয়াগনে চড়িতেছে। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশে কত রকমের যন্ত্র, কত কায়দা, কত কারিগরী। কোন দৈত্যের কত অশ্বশক্তি, কি বৈশিষ্ট্য, কোথায় কি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে স্বর্ণবর্ণের গুড় কেমন করিয়া ঘূর্ণায়মান ড্রামের সাহায্যে শুভ্র-শর্করায় নবরূপ পরিগ্রহ করে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। এমনিই তো হয়। লাল চেলিতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া উদ্ভিন্নযৌবনা নববধূ যখন তাহার সোনালী স্বপ্নের সবটুকু মধু বুকের মধুভাণ্ডে লুকাইয়া নূতন সংসারে প্রবেশ করে তখন কি কেহ মনে রাখে তাহাকে এ সংসার ছাড়িয়া যেদিন যাইতে হইবে সেদিন সে বিগত যৌবনা; বৈধব্যের শুভ্র বেশে তখন তাহার সোনালী মাধুর্যের কোন চিহ্নই থাকিবেনা? তখন তাহার গহনার গোপন বাক্সটি খুলিয়া দেখিও, হয়তো দেখিতে পাইবে প্রথম পর্যায়ের কিছু ধূসর প্রেমপত্র, হয়তো বা শূন্যগর্ভ একটি সেন্টের শিশি, কিম্বা প্রথম প্রণয়ের কিছু তুচ্ছ উপকরণ। চিনির কারখানায় পাহাড়-প্রমাণ আখের ছিবড়ার অপেক্ষা তাহার মূল্য বেশী নহে। কিন্তু, ইক্ষু-শর্করার উপর আমি কবিতা লিখিব না। কারখানার যাতায়াতের পথে অপর একটি দৃশ্য আমার নজরে পড়িয়াছে। সেদিকে কেহই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। আপনিই নজরে পড়িল। একটি কুলি বস্তী। মজদুরদের পাশাপাশি কয়েকটি মাথা গুঁজিবার আস্তানা। ছোট ছোট খাপরা টালির ঘন বসতি। ধুলো আর কাদা, রাস্তায় কুকুর আর উলঙ্গ শিশু—দড়ির চারপায়ে বিশ্রামরত বৃদ্ধা, রাস্তার কলে পানীয়জল আহরণকারিণীর দল—এ দৃশ্যই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। তাহাদের কথাই লিখিয়া ফেলিলাম আমার কবিতার খাতায়—"ওরা":

"ভোরবেলা ছ'টা বাজে, বাজে তাই চিনি কল সিটি
চমকি' জাগিয়া ওঠে ত্রস্তে ব্যস্তে মিলের বস্তিটি।
কলতলে জমে ভীড়, গালাগালি, বচসা অশ্লীল,
ভ্যান ভেনে মাছি ওড়ে, বদ্ধ হাওয়া, ভ্যাপসা বাতাস,
ভ্যাটপচা গন্ধেতে আরও যেন হয়েছে পঙ্কিল।
নিঃস্ব কুলি কুলিভূতে বুকে চুপে চাপে দীর্ঘশ্বাস।
তবু প্রাতে উঠে ছোটে সর্বগ্রাসী যন্ত্র দৈত্যপানে
যন্ত্র জঠরেতে দিতে তারধুরা আত্ম বলিদানে।

হয়তো দাহন মোর শেষ হবে কারও পদাঘাতে—
নিষ্পেষণে নিবে যাবে জীবনের দায়।
তবু জানি হে স্মোকার ! আজও মোর কিছু আছে বাকি
সেই স্মৃতি বুকে লয়ে আজও দিন গোনা ;
মনে পড়ে একদিন এই হাতে বেঁধেছিলে রাখী
নিয়েছিলে তুলি' মোরে তুমি আনমনা ?
মনে আছে আলগোছে ধরেছিলে মোরে সযতনে ?
মনে আছে কী সোহাগ করেছিলে চুম্বনে চুম্বনে ?
বিদায় বেলায় আজ সেই স্মৃতি গেঁথে লব মনে ;
'এ-শুধু চোখের জল, নহে ভর্ৎসনা।"

এ কবিতাগুলি যখন সে লিখেছে তখন কতই বা বয়স হবে ওর ? উনিশ-কুড়ি। সমস্ত দুনিয়াকে সে তখন দেখছে রোমান্টিক দৃষ্টিতে। আগেই বলেছি, কবিতার বিষয়-বস্তু সে বেছে নিয়েছিল তার জীবন থেকেই। ইট, কাঠ, সিমেন্ট, লোহা, বীম, বরগা। তবু ওর মধ্যেই সে সর্বদা মধুরকে, সুন্দরকে, আনন্দঘন জীবনকে খুঁজতে চেয়েছে। কঠিন দুর্মদ বাস্তবের প্রতি সে উদাসীন নয়—কিন্তু তার কবিসত্তা সেই কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করে দেখতে চেয়েছে ভিতরে নরম শাঁস আছে কিনা। সে কুলি-মজুরদের নিয়ে কবিতা লিখেছে, রাজমিস্ত্রি ঢালাই-মিস্ত্রিদের নিয়ে কাব্য করেছে—কিন্তু মানুষের প্রতি সে তখনও বিশ্বাস হারায়নি। কবি যতীন সেনগুপ্তের প্রভাব তখন তার উপর খুব বেশী মাত্রায়। তার সৌন্দর্য-পিপাসু মন পাথরের ফাটল থেকেও জীবনরসের উৎস সন্ধানে অভিসারী, পালামৌ বর্ণিত সেই গাছটির মতো। কলেজ থেকে তৃতীয় বার্ষিক ছেলেদের বুঝি ডিহরী অন শোনের কাছে ডালমিয়া নগরে সিমেন্ট, চিনি আর কাগজের কারখানা দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওর সতীর্থ বন্ধুরা নিশ্চয়ই নানারকম নোট লিখে নিয়ে এসেছিল, পরীক্ষা সমুদ্রে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে। হয়তো কৌশিকও লিখেছিল, কিন্তু তাছাড়াও সে ডায়েরিতে লিখেছে :

"প্রফেসার সেনগুপ্ত আমাদের সমস্ত কারখানাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইলেন। চিনির কারখানা। রেলওয়ে ওয়াগনে করিয়া লক্ষ লক্ষ ইক্ষুদণ্ড আসিতেছে, বিরাট যন্ত্র, দৈত্য ক্রমাগত সেই ওয়াগন ভর্তি ইক্ষুদণ্ড প্রকাণ্ড মুখ-ব্যাদান করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে। তারপর কত ক্রিয়া, প্রক্রিয়া,

কত যন্ত্র-যন্ত্রণার পথ বাহিয়া সেই ইক্ষুগুলি শেষ পর্যন্ত শুভ্র শর্করার বেশে সহস্র সহস্র বস্তায় রূপান্তরিত হইয়া আবার ওয়াগনে চড়িতেছে। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশে কত রকমের যন্ত্র, কত কায়দা, কত কারিগরী। কোন দৈত্যের কত অশ্বশক্তি, কি বৈশিষ্ট্য, কোথায় কি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে স্বর্ণবর্ণের গুড় কেমন করিয়া ঘূর্ণায়মান ড্রামের সাহায্যে শুভ্র-শর্করায় নবরূপ পরিগ্রহ করে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। এমনিই তো হয়। লাল চেলিতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া উদ্ভিন্নযৌবনা নববধূ যখন তাহার সোনালী স্বপ্নের সবটুকু মধু বুকের মধুভাণ্ডে লুকাইয়া নূতন সংসারে প্রবেশ করে তখন কি কেহ মনে রাখে তাহাকে এ সংসার ছাড়িয়া যেদিন যাইতে হইবে সেদিন সে বিগত যৌবনা; বৈধব্যের শুভ্র বেশে তখন তাহার সোনালী মাধুর্যের কোন চিহ্নই থাকিবেনা? তখন তাহার গহনার গোপন বাক্সটি খুলিয়া দেখিও, হয়তো দেখিতে পাইবে প্রথম পর্যায়ের কিছু ধূসর প্রেমপত্র, হয়তো বা শূন্যগর্ভ একটি সেন্টের শিশি, কিম্বা প্রথম প্রণয়ের কিছু তুচ্ছ উপকরণ। চিনির কারখানার পাহাড়-প্রমাণ আখের ছিবড়ার অপেক্ষা তাহার মূল্য বেশী নহে। কিন্তু না, ইক্ষু-শর্করার উপর আমি কবিতা লিখিব না। কারখানার যাতায়াতের পথে অপর একটি দৃশ্য আমার নজরে পড়িয়াছে। সেদিকে কেহই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। আপনিই নজরে পড়িল। একটি কুলি বস্তী। মজদুরদের পাশাপাশি কয়েকটি মাথা গুঁজিবার আস্তানা। ছোট ছোট খাপরা টালির ঘন বসতি। ধুলো আর কাদা, রাস্তায় কুকুর আর উলঙ্গ শিশু—দড়ির চারপায়ে বিশ্রামরত বৃদ্ধা, রাস্তার কলে পানীয়জল আহরণকারিণীর দল—এ দৃশ্যই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। তাহাদের কথাই লিখিয়া ফেলিলাম আমার কবিতার খাতায়—"ওরা":

"ভোরবেলা ছ'টা বাজে, বাজে ভাই চিনি কল সিটি
চমকি' জাগিয়া ওঠে ব্যস্তে ব্যস্তে মিলের বস্তিটি।
কলতলে জমে ভীড়, গালাগালি, বচসা অশ্লীল,
ভ্যান ভেনে মাছি ওড়ে, বদ্ হাওয়া, ভ্যাপসা বাতাস,
ভ্যাটপচা গন্ধেতে আরও যেন হয়েছে পঙ্কিল।
নিঃস্ব কুলি সুনিভৃতে বুকে চুপে চাপে দীর্ঘশ্বাস।
তবু প্রাতে উঠে ছোটে সর্বগ্রাসী যন্ত্র দৈত্যপানে
যন্ত্র জঠরেতে দিতে ভাবধুরা আত্ম বলিদানে।

ফিরে আসে কর্মক্লান্ত ঘর্মস্নাত গোধূলি বেলায়
শ্রান্ততনু কুলিদল, থেমে যায় চরণ-অলস,
বুঝি সারা দিনমান যন্ত্র দৈত্য পিষিয়াছে হায়
ইক্ষুসাথে নরদেহ! মিশে গেছে রক্ত-ইক্ষুরস!
তবু দেখি বাঁচিবারে চায় ওরা—হাসে মিষ্ট অতি
গায় গান, ফোঁকে বিড়ি, টানে মদ—ওরা হৃষ্ট মতি॥"

এই সময়েও দেখছি কৌশিক এই পঙ্কিল পরিবেশের ভিতর থেকে সুন্দরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষের প্রতি সে তখনও বিশ্বাস হারায়নি। সে তখনও জীবনরসের অভিসারী। ও বিদ্রোহী হয়নি। কুলি ধাওড়ার অবক্ষয়ী চিত্র দর্শনে ওর মত কবির যেভাবে জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, সেভাবে সে কিন্তু জ্বলে ওঠেনি। পরিবেশটা তার পছন্দ হয়নি। কলতলার অশ্লীল বচসায় সে বিব্রত বোধ করেছে, ভ্যাটপচা দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়েছে, আখের স্বাদ বড় জোর তার কাছে নোনতা লেগেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! সে প্রশ্ন তোলেনি, কেন এই অবক্ষয়, কেন এই নরক যন্ত্রণা! নিঃসন্দেহে কবি কৌশিক এখানে আমাকে হতাশ করেছে। তার চতুর্দশপদীতে সে ঐ শৃঙ্খলিত সর্বহারা কুলিদলকে কোনও মুক্তির বাণী শোনাতে পারেনি—বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার কোন মন্ত্র নেই তার বাঁশীতে! ওর বাঁশী তখনও বিষের বাঁশী হয়ে ওঠেনি। নিঃস্ব কুলি মনিভূতে পাওয়া-ওটা বুকে বেদনার পাহাড় বয়ে বেড়াচ্ছে এটাই যেন তার শেষ কথা। ও খুশী হয়েছে শুধু এইটুকু জেনে যে এ অবক্ষয়ের মধ্যেও তারা জীবনরসের রসিক। সপ্তাহান্তিক দিনমজুরীর টাকা কটা পচাইয়ের দোকানে ঢেলে দিয়ে ওরা নিঃস্বহাতে বস্তীতে ফিরে গিয়ে বৌ ঠ্যাঙায় এটাও যেমন সত্য, তেমনি ওরা শীতের মধ্যরাত্র পর্যন্ত আখের ছিবড়ের আগুন জেলে গোল হয়ে বসে খঞ্জনী বাজিয়ে রামা হো করে এটাও তেমনি সত্য। ঐ অবক্ষয়ী পরিবেশেও ওরা জীবনকে অস্বীকার করতে চায় না—ওরা তবু বাঁচতে চায়!

কৌশিক জানতে চায়নি, কেন এমন হল! সে বলেনি, এমন হওয়ার কথা নয়। সে ওদের ডেকে বলতে পারেনি—এ জীবন নিয়ে তোমরা হৃষ্টমতি হয়ে থেক না, এ তোমাদের স্বাভাবিক জীবন নয়—এ কৃত্রিমতা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ, তোমাদের স্কন্ধে জোর করে এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা দল বাঁধ, তোমরা বিদ্রোহ কর, তোমাদেরও আছে অমৃতের অধিকার।

না, এ সত্য তখনও অনুভব করেনি কৌশিক মিত্র।

ধরা যাক রাজমিস্ত্রি নিয়ামৎ মিঞার উপর লেখা তার কবিতাটা। সেটা আরও মাসছয়েক পরের রচনা। নিয়ামৎ-মিঞার পূর্ণ পরিচয় সে জানায়নি। কোথায় কোন ওয়ার্ক-সাইটে সে নিয়ামৎ মিস্ত্রিকে দেখেছিল তার উল্লেখ নেই তার দিনপঞ্জিতে। শুধু ওর লেখা থেকে জানতে পারছি নিয়ামৎ মিস্ত্রির বাড়ি নদীয়ার মাঝদিয়া গ্রামে, ঘরে তার প্রোষিতভর্তৃক বিবিজান আছে, এবং দেখছি নিয়ামৎ উঁচু দরের রাজমিস্ত্রি। কিন্তু এখানেও নিয়ামৎ মিস্ত্রির জীবনের ট্র্যাজেডিটাকে ও ঠিকমত দেখেনি বা দেখায়নি। আজকের দিনে এলেম-ওয়ালা রাজমিস্ত্রির একান্ত অভাব। ওলন আর পাটা মেলাতেই তারা গলদঘর্ম, গাথনির স্ট্রেট-জয়েণ্ট এড়াতেই তাদের বিদ্যে ফতুর। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার মন্দির কিম্বা বাঙলাদেশের দু-তিনশ বছর আগেকার যে কোন জমিদার বাড়ির কার্নিসে, খিলানে, স্তম্ভে যে ধরনের পোড়ামাটির কাজ, পঙ্খের কাজ, চুন-বালির কাজ দেখা যায় আজ তা আপনি তৈরী করতে পারবেন না তাজমহল তৈরীর খরচা স্বীকার করেও। কারণ সেই ধরনের এলেমদার মিস্ত্রিই পাবেন না। এই অবস্থায় নিয়ামতের মত রাজমিস্ত্রি উপযুক্ত সম্মান কেন পাবে না এই প্রশ্ন কৌশিকের মনে জাগেনি ; এ প্রশ্নটা সে এড়িয়ে গেছে। রোমান্টিক কবি লিখছে :

"রাজপুত্রেরা সব কোথা গেল এ যুগে ?
কলেজীয় যুবকেরা মেতে আছে হুজুগে।
কোথা পাই কাব্যের নায়কটি জুৎসই ?
নিয়ামৎ হবে কি এ কাব্যের উৎসই ?
নিয়ামৎ ? লুঙ্গিধারী, ছাঁটাদাড়ি, মুখ্যু,
মেচেতায় ভরা গাল, চুলগুলো রুক্ষ।
ভরদিন খেটে এসে দম দিয়ে গাঁজাতে
বসে আছে উবু হয়ে ইটখোলা পাঁজাতে।
নিয়ামৎ মিস্ত্রি, মেট সেই রাজদের,
বাড়ি তার নদীয়ায়, কোন গাঁয় মাঝদে'র।
হাজারির খাতাখানা জেব থেকে করে বের
মেলে দেয় ইতিহাস মজুরের ভাগ্যের।

নিয়ামৎ ! তোকে নিয়ে কি যে লিখি কাব্যের ছন্দে
ভূত ছাড়ে কাছে গেলে ঘর্ম ও রসুনের গন্ধে ।
গাঁজাখোর লম্পট কোন গুণ নাই যার
তাকে নিয়ে শেষকালে কাব্যের কারবার ?
কোথা কোন মজুরের গা-ফেলতি কাজেতে
কোথা চলে গুজগুজ কামিনে ও রাজেতে
ঠিক ধরা পড়ে যাবে নিয়ামৎ নজরে
উঠবেই নিয়ামৎ চিল্লিয়ে সজোরে ।
হতভাগা নিয়ামৎ ! নোংরার সম্রাট !
শেষকালে তোকে ধরে কাব্যের ফাইন-আর্ট ?
তবু ঐ নিয়ামতে আজি মোর কাব্যতে করিয়াছি আহ্বান,
নিয়ামৎ ! ভারা পরে উবু হয়ে প্রাণ ভরে আজ তুমি গাও গান ।
ওই গান কাটফাটা রদ্দুরে জিনেছে
রক্ত ও ঘর্মের ইতিহাস চিনেছে,
ও গানের রেশ ধরে ভেসে তোর মন যায়
ছায়া ঘেরা সুশীতল মাঝদে'র কোন গাঁয়,
ও গানেতে সুর নাই আছে স্বর মরমীর
স্নেহ-হীন প্রবাসেতে দিল আছে দরদীর ।
ভরদিন কুলিদের করে কাঁচা পিত্তি
কর্ণিক কোনা দিয়ে কী করিস্ সৃষ্টি !
মন্দির খিলানেতে তোর পূজা অর্ঘ্য
যুগে যুগে রচে দেখি শিল্পের স্বর্গ !
সুরহারা গান তোর প্রাণ পেয়ে ওঠেরে
পঙ্কের মাঝখানে ফুল হয়ে ফোটেরে ।
চেয়ে চেয়ে দেখে যারা কেউ তোরে জানেনা ।
দুনিয়ায় কেউ তোকে কবি বলে মানে না ।
চুকে যাবে তোর দাম মজুরিটি মিটিয়েই
ভুলে যাবে তোর নাম ওরা শ্রেফ দুদিনেই ।
তবু তুই গাঁথনিতে গান তোর রেখে যাস
পলতোলা পথেতে কাব্যটি এঁকে যাস ।

নিয়ামৎ! শেলী তুই, লিয়োনার্দো, তুই আজ দাস্তে
শাশ্বত বাণী তোর এঁকে যাস কণিক প্রান্তে॥"

বেশ বোঝা যায় রোমান্টিসিজমের কুয়াশায় দৃষ্টি তার তখনও আচ্ছন্ন। নিয়ামতের প্রতি সমাজের যে উপেক্ষা, নিয়ামতের জীবনের যে ট্র্যাজেডি তার জন্য কবি কিন্তু বিক্ষুব্ধ নন। চিনিকলের কুলি ধাওড়ায় যে কথা ঘোষণা করা হয়নি সে কথাটা তিনি নিয়ামতের কর্ণমূলেও নিবেদন করতে পারলেন না। কৌশিক এখনও এস্‌কেপিস্ট—রোমান্টিক চিন্তাধারায় সে মোহগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, দিশাহারা। নিয়ামৎ মিস্ত্রিকে সে শেলী-লিয়োনার্দো-দান্তের পর্যায়ে তুলতে চেয়েছে, দু-বেলা ভরপেট খেতে পাওয়া স্বাভাবিক পর্যায়ে নয়। পাতাল থেকে নিয়ামৎকে ওঠাতে ইচ্ছা ছিল তার কিন্তু বড় বেশী হ্যাঁচকা টান হয়ে গেল যেন। নিয়ামৎ সে আকর্ষণে একজন এলেমদার কারিগরের বাঞ্ছনীয় স্বচ্ছন্দ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেমন হতে পারত ঐ ধরণের একজন-শিল্পী রাশিয়ায়, আমেরিকায়, জাপানে এমন কি চীনে—হ্যাঁচকা টানে সে একেবারে উঠে গেছে কবি-কৌশিকের পরিকল্পিত ইউটোপিয়ান স্বর্গলোকে!

॥ পাঁচ ॥

শহরের শেষ প্রান্তে রেললাইনের ধারে আগরওয়ালের কারখানাটা মাত্র বিঘে দশেক জমির উপর। চারিদিক উঁচু-পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ইটের পাঁচিল নয়—ছাই ছাই নীলচে রঙের সিণ্ডার ব্লকের দেওয়াল। ছাই বা কয়লা বালি আর সিমেন্ট জমিয়ে তৈরী হয় ঐ ফাঁপা-ইট,—হলো ব্লক অথবা সিণ্ডার ব্লক। আগরওয়ালের এটা কারখানা নয়, আসলে এটা ছিল সিমেন্ট আর লোহার গুদাম। পাশাপাশি অনেকগুলো গুদাম ঘর—টিনের ছাউনি। তাতে থাক দেওয়া সিমেন্টের বোরা। এখানকার ফাঁকা জায়গাটায় সম্প্রতি নূতন ধরণের হলো-ব্লক তৈরী করবার আয়োজন করেছেন আগরওয়াল। এর নাম নাকি চ্যাটার্জী-ব্লক। হলো ব্লক তো অনেকেই তৈরী করে, কিন্তু আগর-ওয়াল সাহেব এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ এমন প্রক্রিয়ায় যোগ করেন যে প্রয়োজনীয় সিমেন্টের অর্ধেক বাদ দেওয়া সত্ত্বেও ব্লকের তাগদ সমানই রয়ে যায়। এটাই তাঁর আবিষ্কার, এইটাই তাঁর বিস্‌নেস সিক্রেট। না,

ঠিক তাঁর আবিষ্কার নয়, তাহলে তিনি স্বনামে এটার পেটেন্ট নিতেন। এর নাম 'চ্যাটার্জী-ব্লক' না হয়ে হত 'আগরওয়াল ব্লক'। এর আবিষ্কারকর্তা যিনি তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিস্থিতিটা কিছু জটিল হয়ে পড়েছে। এখনও তাই পেটেন্ট নেওয়া হয়নি। এই জন্যই এ-ব্যবসার গোপনীয়তা সম্বন্ধে আগরওয়াল দ্বিগুণ সাবধান। প্রণালীটা আবিষ্কার করেছিলেন একজন পাগল এঞ্জিনিয়ার—ডক্টর সদাশিব চট্টোপাধ্যায়। সুজাতার স্বর্গগত পিতৃদেব। সর্বস্ব খুইয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁর সাধনায়। সাধারণ ছাইয়ের সঙ্গে, কারখানার পোড়াছাই বা স্ল্যাগের সঙ্গে কোন বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ বিশেষভাবে মিশিয়ে তিনি ঐ ছাইয়ের মধ্যে আমদানি করেছিলেন জোড়া-লাগানোর গুণ, যাকে বলে সিমেন্টেসান ফ্যাকটার! ল্যাবরেটারীতে এমন ধারের সিণ্ডার-ব্লক তৈরী করলেন ডক্টর চ্যাটার্জি যাতে সিমেন্টের ভাগ দেওয়া হল শতকরা পঞ্চাশভাগ কম, অথচ যার ক্রাশিং-স্ট্রেংথ, শীয়ার-স্ট্রেংথ, সাদা বাঙলায় যার ভারবাহী ক্ষমতা হল সাধারণ ইটের চেয়ে বেশী। যুগান্তকারী আবিষ্কার বলা যেতে পারে একে, কারণ ইটের বিকল্প হিসাবে গৃহনির্মাণ-শিল্পে এ আবিষ্কার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। তারপর সমস্যা দাঁড়ালো ফিনান্‌শিয়ার জোগাড় করা। ইচ্ছে করলে এই অবস্থায় তিনি স্বনামে এটার পেটেন্ট নিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি নেন নি, হয়ে ওঠেনি। ল্যাবরেটারীতে যা সত্য হয়েছে ব্যাপকভাবে সেটা আরও কত ফলপ্রসূ হবে তাই প্রথমে দেখতে চাইলেন তিনি। কিছু নগদ টাকা ছাড়া আর অগ্রসর হতে পারছিলেন না। দ্বারে দ্বারে সেদিন তাঁকে ফিরতে হয়েছিল পাগলের মত। কেউ বিশ্বাস করেনি, কেউ হাত বাড়িয়ে নিতে চায়নি এই গুপ্তধনের ভাণ্ডারের চাবি। এই অবস্থায় তিনি ময়ূরকেতনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। কিন্তু বিধাতা বাম। পেটেন্ট নেওয়ার আগেই একেবারে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন বৈজ্ঞানিক। একমাত্র সান্ত্বনা, তাঁর আবিষ্কারের মূলসূত্রটা তিনি মুখে মুখে জানিয়ে গিয়েছিলেন আগরওয়ালাকে। সবটা নয়, আংশিক তথ্য। তা সেইটুকুর সাহায্যেই অবৈজ্ঞানিক আগরওয়াল তৈরী করতে পেরেছে জিনিসটা। কি করে কি হয় তা সে জানেনা, তবে হাতে-কলমে জিনিসটা তৈরী করেই সে ছোটখাট একটা কারখানা খুলে বসেছে এই গুদামের চৌহদ্দির মধ্যেই। আগরওয়ালের ইচ্ছা পেটেন্ট নেওয়া হচ্ছে

গেলে ব্যাপকভাবে সে চ্যাটার্জি-ব্লক তৈরীর কারখানা বানাবে। এখানে নয়, কলকাতার কাছেপিঠে। বাজার তো কলকাতায়। এখানে অত্যন্ত ছোট্ট ব্যবস্থাপনায় ওটা পরীক্ষা করে দেখছেন মাত্র। তবু এ থেকে যা লাভ হচ্ছে তার শতকরা উনপঞ্চাশভাগ সুজাতার নামে জমা রাখছেন তিনি, যদিও কোন লিখিত চুক্তিনামা হয়নি। এটুকু মযূরকেতনের নিছক বদান্যতা। হাজার হোক সুজাতাই এ আবিষ্কারের উত্তরাধিকারী।

উঁচু-পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউণ্ড। দুটি গেট, প্রবেশ ও প্রস্থানের। গেটদুটিকে যুক্ত করেছে অর্ধবৃত্তের আকারে লাল কাঁকরের একটা রাস্তা, যার কেন্দ্রস্থলে দারোয়ানের গুমটি। গেট দিয়ে ঢুকেই প্রধান অফিস। এটা পাকাবাড়ি। বাইরের লোক এই অফিস পর্যন্তই আসতে পারে। হলো-ব্লকের অর্ডার যদি দিতে চান কিম্বা যদি করোগেট টিন বা সিমেন্টের হোলসেল কেনা-বেচার সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলতে চান তাহলে ঐ অফিসে গিয়ে আপনাকে কারবার করতে হবে। হলো-ব্লক কারখানা খোলার আগে থেকেই এই অফিস ঘরটা ছিল; হোলসেল ডীলার-শিপের কারবারের প্রয়োজনে। বিশ বছর ধরে এ জেলার সিমেন্ট, করোগেটেড টিন ও লোহার হোলসেল ডীলার হচ্ছেন মযূরকেতন। ফ্যাকটারী থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টিন আসে, হাজার হাজার বস্তা সিমেন্ট আসে। জেলার বিভিন্ন পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিয়ে যায়। অফিস পর্যন্ত যেহেতু বাইরের লোকের আনাগোনা ঠেকানো যাবেনা, তাই অফিসের পিছনে আবার একটা কাঁটাতারের বেড়া। সেখানেও বসে থাকে বন্দুকধারী দারোয়ান। কাঁটাতারের ভিতরের অংশে বড় বড় এ্যাসবেস্টসের শেড। সিমেন্ট ও লোহার গুদাম। তার পিছনে হলো-ব্লক তৈয়ারির আয়োজন। ক্রমাগত লরী আসছে আর যাচ্ছে। দারোয়ান তার খাতায় টুকে রাখছে লরির নাম্বার, চালানের বিবরণ। সিমেন্ট আসছে, লোহা আসছে, টিন আসছে—যাচ্ছেও বেরিয়ে ক্রমাগত। আবার অন্য লরিতে আসছে সিণ্ডার বা খোয়া, আর বালি। চ্যাটার্জি-ব্লক তৈয়ারীর প্রয়োজনে আগে মাটিও আসত, আজকাল আর আসেনা। কারখানার ভিতরেই একটি বড় পুকুর খোঁড়া হচ্ছে। এতে জল-সরবরাহের সমস্যাটাও আংশিক মিটবে এবং পুকুরকাটা উদ্বৃত্ত মাটিটাও ফেলা যাচ্ছে না। একদল লোক বড়বড় ঢেলাগুলি ভাঙছে, গুঁড়ো করছে, চালুনিতে ছাঁকছে; চ্যাটার্জি-ব্লক তৈরীর কাজে মাটিরও প্রয়োজন।

সিমেন্ট ও লোহার স্টকিস্ট হিসাবে যেসব কর্মচারী এখানে কাজ করে তাদের সঙ্গে চ্যাটার্জি-ব্লক তৈরীর কারবারের সম্পর্ক নেই। তারা বস্তুত ঐ কাঁটাতারে ঘেরা অংশটায় যেতেই পারেনা। পাছে এই নতুন ধরণের হলো-ব্লক তৈরীর কৌশলটা জানাজানি হয়ে যায় তাই আগরওয়াল এ বিষয়ে দ্বিগুণ সাবধান। ঐ হলো-ব্লক যারা তৈরী করে তারা আবাসিক। পারত-পক্ষে তারা কারখানার বাইরেই যায় না, যেতে দেওয়া হয় না। তারা মাদ্রাজীকুলি। এ দেশের ভাষাই বোঝে না তারা। সব বাইরে থেকে আমদানী করেছেন ময়ূরকেতন। ওদের দলপতি ইন্দির সর্দার শুধু ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলতে পারে। দীর্ঘদিন সে আছে আগরওয়ালের সঙ্গে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত। লোকটার আরও দুটি গুণ আছে, কথা বলে অত্যন্ত কম এবং আমিষ রান্নায় সে সিদ্ধহস্ত। লোকটা গোয়ানীজ। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে সারি সারি কতকগুলা খাপরার ছাউনি। দাক্ষিণাত্যের কুলিরা ওখানেই সপরিবারে বাস করে। বেশী নয়, সংখ্যায় ওরা আট-দশঘর। ইন্দির সর্দারের অবশ্য পরিবার নেই; বিপত্নীক সে। একটি দশবারো বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকে। এই চ্যাটার্জি ব্লক যিনি তৈরী করেছিলেন সেই চ্যাটার্জি সাহেব তো দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছেন—এর কূট-কৌশলটা আগরওয়াল ছাড়া যদি কেউ কিছু জানে ত ঐ ইন্দির সর্দার। ঐ নিরক্ষর লোকটার সাহায্যে ময়ূরকেতন টিকিয়ে রেখেছেন কারবারটা। বেশী নয়, দৈনিক হাজার-বারশো' হলো-ব্লক তৈরী হচ্ছে এখন। যা কিছু হিসাব রাখে ঐ ইন্দির-সর্দার। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি লোকটার। পাই পয়সার হিসাব মুখস্থ রাখে। দিনান্তে এসে মুখে মুখে বলে যায় নকুল ম্যানেজারকে। নকুল কথামত হিসাবটা টুকে রাখে। দু-তিন সপ্তাহ পরে পরে ময়ূরকেতন যখন আসেন, সেই হিসাবের উপর চোখ বুলিয়ে যান। এমন প্রচণ্ড-ব্যস্ত মানুষটা এই সামান্য কয়েক হাজার টাকার লেন-দেনের জন্য অন্য কোন করণিক নিয়োগ করেন নি।

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া অংশটায় একটা বিকল বাড়ি। পুরনো বাড়ি, উনি এই বাড়ি সমেত জমিটা কিনেছিলেন, তারপর বাড়িটা ইচ্ছামত মেরামত করে নিয়েছেন। গ্যারেজ ও মেজানাইন বানিয়ে নিয়েছেন। একতলায় হলো-ব্লকের জন্য ছোট্ট দু-কামরার অফিস। ঐ ছোট ঘরের প্রথমটি আবার পার্টিসান দিয়ে ভাগ করা। একটা অংশ তালাবন্ধ থাকে। আগরওয়াল মাসান্তে যখন আসেন তখন বসেন সেটায়। এয়ার-কণ্ডিশান করা অংশের

অন্তর্ভুক্ত ; সেটা সুজাতার জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় ঘরে খানদুই টেবিল পাতা। একটায় কেউ বসেনা, দ্বিতীয় টেবিলে বসেন নকুল গুঁই, ম্যানেজার। দ্বিতলেও দুখানি ঘর, বাথরুম। এখানেই থাকে সুজাতা, একটি তার বসার ঘর অপরটি শয়নকক্ষ। সুজাতার এই অফিসে খিদমত করার জন্য আছে বনোয়ারিলাল ; পিয়ন কাম আর্দালী।

বিশুদাস ড্রাইভারকে যেদিন নিয়োগ করা হল সেদিন অভিমানক্ষুব্ধা সুজাতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পরেই কফির ট্রে নিয়ে ঘরে এল বনোয়ারিলাল। আগরওয়াল সাহেব এখানে থাকলে এ-সময় এককাপ কফি পান করে থাকেন। প্রথামত দুটি কাপই ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল বনোয়ারিলাল। সে জানে মেমসাহেবও এসময় এঘরে এসে এককাপ কফি পান করে থাকেন। কিন্তু আজ আর তা হ'লনা। পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে আগরওয়াল বলেন, আমার জন্য এককাপ রেখে ট্রেটা ও ঘরে নিয়ে যা বরং, আর ইন্দিরাকে একবার ডেকে দে।

বনোয়ারিলাল ট্রে নিয়ে চলে যেতেই আগরওয়াল এনগেজমেন্ট প্যাডটার উপর একনজর চোখ বুলিয়ে নেন। দশটার সময় জীমূতবাহন মহাপাত্রের সঙ্গে দেখা করার কথা। বেলা দুটোর সময় ডিস্ট্রিক্ট মিল-অনার্স এ্যাসোসিয়েশানের কার্য নির্বাহক সমিতির জরুরী মিটিং। বেলা তিনটায় জেলা স্পোর্টস-কমিটির মিটিং আছে জেলা-বোর্ড অফিসে। সন্ধ্যা-সাতটার ঘরে লেখা আছে শুধু একটি অক্ষর 'এস'। সেটা কেটে দিলেন। সুজাতার সঙ্গে আজকের সন্ধ্যা-আসরে কোন দ্বৈত-সঙ্গীত গাওয়া সম্ভবপর হবেনা, সুর কেটে গেছে। তাছাড়া সুতোয় একটু ঢিল দিয়ে দেখতে চান এবার, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। অনেক করেছেন তিনি সুজাতার জন্য, অনেক করতে প্রস্তুতও ছিলেন—কিন্তু সুজাতা বোধকরি ওঁর সঙ্গে টেক্কা দিতে চাইছে। ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চ-রিপোর্টটা সে দেখতে দেয়নি ময়ূরকেতনকে, অবশ্য সরাসরি দেখতে তিনি চানও নি। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়েই। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি ওঁর সন্দেহ জেগেছে সুজাতা তলে তলে জীমূতবাহনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করছে। কী ভাবে ঐ মেয়েটা? আগরওয়ালের চোখে ধুলো দেবার ক্ষমতা সে রাখে? ময়ূরকেতন আগরওয়ালকে ও চেনেনি এখনও।

যাক ও কথা। রাত দশটায় ট্রেনে তিনি কলকাতা যাচ্ছেন, এনগেজমেন্ট

প্যাডের তাই নির্দেশ। কাল সমস্ত দিন ক'লকাতায় কর্মব্যস্ত প্রোগ্রাম। তার মধ্যে বেলা এগারোটায় একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন আলোচনা আছে। মোটামুটি এনগেজমেন্ট প্যাডের উপর চোখ বুলিয়ে সেটা বন্ধ করে রাখেন; টেনে নেন কফির কাপটা। বাঁ হাতে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করতে থাকেন।

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো: আলি বলছি।

: আগরওয়াল। কালকের এ্যাপয়েন্টমেন্টটা মনে আছে তো ডক্টর আলি?

: আলবাৎ! দশ এগারো নম্বর সুইট, বেলা এগারোটায়।

. একলা আসবেন কিন্তু—

: বলা বাহুল্য। কিন্তু আজ একবার সময় করে এখানেই দেখা করতে পারেন না?

: কী দরকার? এক রাতের তো মামলা। কালকেই দেখা হবে!

: এক রাত্রে একটা রাজ্য হাত বদল হয়ে যায় আগরওয়াল সাহেব!

আগরওয়াল বলেন: স্থান কাল আর পাত্র। তা পাত্র গররাজি নয়, সময়ও করা যায়—কিন্তু স্থানটা যে অনুমোদন যোগ্য নয়। দেওয়ালেরও কান আছে, জানেন নিশ্চয়। সুতরাং—

: ও আচ্ছা, আচ্ছা। বেশ, কালই কথা হবে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন আগরওয়াল। ঘড়িটা দেখে নেন একবার। সওয়া নয়টা। এখনও সময় আছে হাতে। ডেকে পাঠালেন ইন্দির সর্দারকে। আহ্বানমাত্র লোকটা এসে দাঁড়ায় সেলাম করে।

: সব ঠিক আছে? টাকা চাই?

: জী হাঁ। দেহি, রূপেয়া আভি হয়!

: আচ্ছা যাও তুমি।

লোকটা তবু ইতস্তত করছে দেখে বলেন, আর কিছু বলবে?

লোকটা তখন তার বিচিত্র ভাঙা হিন্দিতে যা নিবেদন করে তার অর্থ, আপনি আজ একজন ড্রাইভারকে চাকরি দিয়েছেন স্যার, তা ড্রাইভারের জরুরৎ আছে আমাকে কেন বললেন না, আমার ভাইপো বসে আছে, বিশ্বাসী লোক—

আগরওয়াল হেসে বলেন, তোমার ভাইপোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে? কই বলনি তো তুমি?

: আজ্ঞে না, এ সে নয়, এ আমার আর এক ভাইপো। এ আমাদের সঙ্গে ওসব কারবারে কোন দিন ছিল না। পাঁচ বছরের লাইসেন্স।

: বেশ, তোমার ভাইপোকে আসতে লিখে দাও। তাকেও চাকরি দেব আমি। সে আমার গাড়িটা চালাবে। এ চালাবে ফিয়াটখানা। যাই হোক, লোকটা বেগানা আন্‌জান আদমি, একটু নজরে রেখ।

ইন্দির সর্দার হাসলে। কালো মানুষটার মুখে ঝকঝকে একসার দাঁত কিন্তু সুন্দর দেখালো না, কেমন যেন বীভৎস মনে হল। সেলাম করে বেরিয়ে গেল লোকটা।

আগরওয়ালও বেরিয়ে পড়েন। না, বিশু ড্রাইভারকে ডাকেন না। নিজেই ড্রাইভ করে বেরিয়ে যান। দারোয়ান হাট করে খুলে দেয় গেটটা। বাঁকের মুখে নজরে পড়ে দ্বিতলের ক্যান্টিলিভার বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এদিকেই।

জীমূতবাহনের কর্মক্ষেত্র কলকাতায়; কিন্তু দেশের বাড়িতে তাঁর নিজস্ব একটা অফিস আছে। নিজের কন্সটিটুয়েন্সিতে এলে এখানে বসেই পাঁচজনের সঙ্গে দেখাশোনা কথাবার্তা বলেন। একজন অতি বিশ্বস্ত স্টেনো-কাম স্বকীয় সচিব আছে তাঁর, সেই শুধু 'স্যার' বলে। বাদবাকি সবারই তিনি 'জীমূতদা'। প্রাক-স্বাধীনতা-যুগ থেকেই এই দাদা ভাইয়ের সম্পর্কটা চলে আসছে। ওঁর এই দেশ জোড়া ভাইয়েরা চারবছর ধরে ওঁকে দোহন করবার চেষ্টা করে এবং বিনিময়ে পঞ্চম বছর উনি তাদের নির্দিষ্ট ছাপমারা একখানি ভোট পত্র প্রার্থনা করেন। তাঁরা ওঁর নির্বাচন-যুদ্ধের হাতিয়ার। ছাত্রনেতা, মজদুর-নেতা, পঞ্চায়েতের মোড়ল থেকে রকবাজ বেকার, মায় নামকরা গুণ্ডা-দলের সর্দার পর্যন্ত সে হিসাবে ওঁর ছোটভাই; উনি সবারই জীমূতদা!

এই বিরাট ব্যূহ ভেদ করে খাসকামরায় পৌঁছাতে আগরওয়ালকে কিন্তু কোন বেগ পেতে হলনা। তিনি হাজির হতেই অন্যান্য সবাইকে নানা অজুহাতে জীমূতবাহন বিদায় করে দিলেন। তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলেন: বলুন এবার, আপনার কি খবর?

: খবর তো স্যার আমার দিকে ঠিকই আছে। কী হুকুম আছে বলুন?

জীমূতবাহন সিগারকেসটি বাড়িয়ে ধরে বলেন, হুকুম চালাবার অন্য অন্য লোক আছে। আপনাকে তো আমি কোন নির্দেশ দেবনা, বরং আপনার

নির্দেশ মানব। আপনাদের স্বার্থেই কাজ করি, বলুন আমাকে কি করতে হবে?

: আমার এলাকা সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

: আপনাদের মিল ওনার্স এ্যাসোসিয়েসানের মিটিং তো আজকেই, নয়?

: হ্যাঁ, তবে তা নিয়ে আপনার চিন্তা নেই। ময়ূরকেতন আগরওয়াল এখনও ও এ্যাসোসিয়েসনের ডিকটেটর। সে যেদিকে ঝুঁকবে গোটা কম্যুনিটি সেই দিকেই ঝুঁকবে। মিল-মালিকদের সলিড সাপোর্ট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

: থ্যাঙ্ক! আচ্ছা শুনছি আলিসাহেব শনিবার বিকালে কাছারী ময়দানে মিটিং করছে? কলকাতা থেকে ওদের চাঁইরা নাকি সব আসছেন?

: তা আসুন! মিটিংয়ে লোক হবে না। কারণ ঐ শনিবারেই বিকালে আমি কলেজ মাঠে ফাইনাল খেলাটা ফেলেছি। ওদের মিটিং-এর টাইম বিকাল চারটের, আমার খেলাও শুরু হচ্ছে বিকাল চারটের। মিটিং ভেঙ্গে সব লোক খেলা দেখতে দৌড়াবে। কাছারীমাঠ আর কলেজমাঠ তো পাশাপাশি।

উৎসাহিত হয়ে ওঠেন জীমূতবাহন: তাই নাকি? শনিবার ঐ সময়েই ফাইনাল খেলা ফেলেছেন? তা আপনিই তো ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট! এ বুদ্ধিটা কিন্তু জবর খাটিয়েছেন। কোন কাউন্টার প্রোপাগাণ্ডার দরকার নেই। বিনা-টিকিটের ফাইনাল খেলা ছেড়ে কে আর 'নইলে গদি ছাড়তে হবে'-র শ্লোগান শুনতে আসবে? কফি বলি একটু?

: কফি? তার চেয়ে বীয়র কিন্তু জমত ভাল।

: কেন আর লজ্জা দেন মিঃ আগরওয়াল? অপিসে ওসব বন্দোবস্ত যে থাকেনা সে তো আপনি জানেনই। বীয়র কেন, ভাল মার্টিনী আনিয়েছি কিছু। খানদানী ফরেন মাল। আসুন না সন্ধ্যা বেলায়—

: কোথায়? আপনার বাড়িতে?

: আরে না, না, বাড়িতে নয়। কৌশল্যাদেবীর ওখানে—

আগরওয়াল হেসে বলেন, ধন্যবাদ, না আজ আর সে অমৃতে ভাগ বসানো চলবেনা। রাতের গাড়িতেই কলকাতা যেতে হবে। কিন্তু অধমকে তলব করেছিলেন কেন, সে কথাটা তো বললেন না?

: না না, তলব নয়—এই একটু খবরা খবর নিতে। আপনার ভলান্টিয়ার কোর ঠিকমত মবিলাইজড হচ্ছে তো? টাকা পয়সার দরকার থাকলে—

বাধা দিয়ে ময়ূরকেতন বলেন, এটা কি রকম কথা হল স্যার ? আপনি কি এবার প্রথম ইলেকসানে দাঁড়াচ্ছেন ? টাকার জন্য কবে আপনার কাজ ঠেকে থেকেছে।

জীমূতবাহন হেঁ-হেঁ হাসি হাসেন : আপনার কাছে অবশ্য আমার কোন সঙ্কোচ নেই—

: সঙ্কোচ ! বিলক্ষণ ; আমি কি বিনা স্বার্থে কাজ করছি ? আমি কি জানিনা যে আপনারা গদিতে বসে থাকলেই আমরা শান্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারব। আর আলিসাহেবের দল গদিতে চড়ে বসলে সব তছনছ হয়ে যাবে।

: ভালকথা আপনার ড্রাইভার কাজে লেগেছে তো ?

আগরওয়াল তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদলে বলেন, হ্যাঁ, তাকে আজই বহাল করেছি। ফিয়াট গাড়িটা চালাচ্ছে। তা গাড়িসমেত ওকে ক'দিনের জন্য আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেব। এখানেই থাকুক, মানে ইলেকসান পার্পাসে—

: সে'কি ! ও আপনার গাড়ি চালাচ্ছে না ?

: আপনাকে আগে বলিনি। বস্তুতপক্ষে আপনার লোক আসার আগেই আমি আমার গাড়ির জন্য অন্য একজনকে চাকরিতে নিয়েছি ! মানে আরকি উপরোধে পড়ে।

জীমূতবাহন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আগরওয়ালকে একবার যাচাই করে নেন। তারপর বলেন, না, না, গাড়ির আমার প্রয়োজন নেই। ও সুজাতার গাড়িটাই চালাক বরং। বাপ মারা যাবার পর মেয়েটা বড় মনমরা হয়ে পড়েছে—

দুজনেই কিছুটা চুপচাপ। তারপর জীমূতবাহন যেন হঠাৎ মনে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, ভাল কথা, শুনলাম রেলওয়ের অর্ডারটা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন ? সত্যি নাকি ?

আগরওয়াল সিগারটাকে নিপুনভাবে কাটার দিয়ে কাটতে কাটতে বলেন, হ্যাঁ, অতবড় অর্ডার এখন আমি নেব কেমন করে ? এখন যা প্রডাকশান হচ্ছে তাতে অতবড় অর্ডার ধরবার মত আমাদের সামর্থ্য নেই।

জীমূতবাহন বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, কী বলছেন মশাই ! লোক বাড়ালেই তো প্রডাকশান বেড়ে যাবে। আপনি মাত্র আট-দশ জন লোক লাগিয়ে ছেলে খেলা করছেন। বেড়াল দিয়ে লাঙল চাষ হয় ?

অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে আগরওয়াল বলেন, সুজাতা টেলিফোন করেছিল বুঝি ?

চমকে ওঠেন জীমূতবাহন, আরে না না, সুজাতা কেন বলবে ? আমি নিজে চোখেই তো সেদিন আপনার কারখানা দেখে এলাম। মনে নেই ?

আগরওয়াল সোজা হয়ে বসেন, বলেন, দেখুন স্যার, লোক বাড়ালেই যে প্রডাকশান বাড়বে এই সামান্য কথাটা আমার মত ব্যবসায়ীকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু আজে বাজে লোক দিয়ে তো আমার কাজ হবে না। পেটেন্টটা যতদিন না নিতে পারছি ততদিন কারবারে কোন বিভীষণ ঢোকাতে চাই না। আপনি তো সবই জানেন—

: না, আগরওয়াল সাহেব, সবটা জানিনা আমি! পেটেন্ট নিতেই বা দেরী করছেন কেন ? সুজাতা তো এখন আপনার কথায় ওঠে বসে। আপনি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, আমার পরামর্শ দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র, কিন্তু মাপ করবেন মিঃ আগরওয়াল, আপনার পলিসিটা আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঢুকছে না। সোনার খনি আবিষ্কার করেছেন আপনি, আর খনিগর্ভে এক্সকাভেটার নামাতে ভয় খাচ্ছেন ?

ময়ূরকেতন প্রত্যুত্তর করেন না। মিটমিটি হাসতে থাকেন।

কিন্তু তবু জীমূতবাহন এ প্রসঙ্গে ছেদ টানতে রাজি হন না, বলেন, না, না মিস্টার আগরওয়াল, এভাবে হেসে এড়িয়ে যেতে দেবনা আপনাকে। এত বড় আবিষ্কারটাকে ঠিকমত কাজে লাগাচ্ছেন না কেন, তা আপনাকে বলতে হবে। উৎপাদন তো ইচ্ছা করলেই দু-চার-দশগুণ বাড়াতে পারেন আপনি। আপনার ঐ চ্যাটার্জি ব্লকের যা প্রডাকসান কস্ট আসছে তাতে তো এতদিনে এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে একটা বিপ্লব হয়ে যাওয়ার কথা। টাকার অভাব আপনার নেই, জমিও রয়েছে, কাঁচা-মালের ঘাটতি নেই, অথচ—

আগরওয়াল ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনাকে খুলেই বলি। দু-পাঁচ দশ লাখ টাকা এল কি এল না সেটা বড় কথা নয়; কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন স্যার ? কী প্রচণ্ড ঝড় আসছে ? আমার মত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কি এখন এসব দিকে নজর দেবার সময় ? দেশের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না ? ঐ আলি-সাহেবকে সমস্ত বিরুদ্ধ দলগুলি একযোগে সাপোর্ট করছে। গতবার আপনাদের ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব হয়েছিল—ওদের অনেক ভোট ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। এবার আপনাদের স্ট্রেট

কাইট। আপনি যদি রিটার্নড না হন, স্টেব্‌ল্ গভর্নমেণ্ট যদি আপনারা ফর্ম করতে না পারেন, তাহলে আমাদের কি দশা হবে সেটা ভাবতে পারেন! এমনিতেই তো ধর্মঘট, দাবী আর ঘেরাও এর গুতোয় দেশের অর্ধেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ছোটখাট কারবারিরা যন্ত্রপাতি বেচে দিয়ে কারবারে লালবাতি জ্বালছে। বড় ব্যবসায়ীরা যন্ত্রপাতি উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিম বাঙলা থেকে। মজদুর য়ুনিয়নগুলো ওৎ পেতে বসে আছে ইলেকসানের মুখ চেয়ে। এই সময়ে কি আমার মত ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত ব্যবসার কথা ভাবা উচিত?

আগরওয়াল একবার আড় চোখে দেখে নেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ মহাপাত্রের দিকে। 'বিসনেস ম্যাগনেটের' বক্তৃতার ফল 'কিং-মেকারে'র উপর কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে। ওষুধ ধরছে, তাই আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, অবশ্য আপনি যদি বলেন আশঙ্কার কিছু নেই—তাহলে না হয় এদিকে ঢিল দিয়ে ওদিকটা দেখি। পেটেণ্ট নেওয়া, প্রডাকসান বাড়ানো ইত্যাদিতে আবার মন দিই।

এবার সোজা হয়ে ওঠেন জীমূতবাহন মহাপাত্র, না না, থাকনা তাহলে এখন। সত্যিই তো! একসঙ্গে কতদিক দেখবেন আপনি? বেশ, ইলেকসান মিটে গেলেই বরং ওদিকে মন দেবেন। তখনই না হয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফ্লোট করে পুরোদমে কাজে হাত দেওয়া যাবে।

: সে কথা তো হয়েই আছে। শুধু লেখা-পড়াটা বাকি। আমি ভুলিনি স্যার যে, এ আলাদীনের প্রদীপ, ঘটনাচক্রে আমার হাতে এসেছে; এটা আপনার হাতেও পড়তে পারত। আপনি আমি আর সুজাতা। আমরা তিনজনেই হব অংশীদার। আমি যোগান দেব অর্থ, আমি করব প্রডাকসান, আপনি করবেন মার্কেটিঙের ব্যবস্থা, আর সুজাতা—ওটা সেন্টিমেন্টাল কারণে।

: না না, শুধু সেন্টিমেন্টাল কারণ হবে কেন? তার বাবাই এটার আবিষ্কারক, তাকে আমরা বঞ্চিত করব না, মানে মরালি করতে পারিনা—

: আজ তাহলে উঠি?

: উঠবেন? তা আপনি ব্যস্ত মানুষ, আপনাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখা ঠিক নয়। ও, আর একটা কথা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

: উঠেই পড়েছিলেন আগরওয়াল। এ কথায় আবার বসে পড়েন।

বেশ একটু ইতস্তত করে জীমূতবাহন বলেন, কিছু মনে করবেন না আগরওয়াল সাহেব, নেহাৎ বন্ধুলোক বলেই কথাটা বলছি। সুজাতাকে আপনি অন্য কোন বাড়িতে রাখুন। আপনি এ শহরে এলে ঐখানেই থাকেন, মানে, আমি অবশ্য লোকের কথায় কান দিই না; কিন্তু শত্রুর তো অভাব নেই আপনার; তাদেরই বা দুটো বাঁকা কথা বলার সুযোগ আপনি দেবেন কেন?

একটা আড়মোড়া ভেঙে ধীরে সুস্থে আবার উঠে দাঁড়ান আগরওয়াল। বিচিত্র হেসে বলেন: আমি খদ্দর পরিনা স্যার, টেরিলিন পরি; অফিসের ভিতরেই মদ খাই, খাওয়াই; এবং সারাজীবন মেয়ে মানুষ পুষেছি! এ কথা এ কনস্টিটুয়েন্সির সবাই জানে। আমি তাদের পরোয়া করিনা! তার দুটো কারণ, এক নম্বর আমার দু-কান কাটা; দু-নম্বর আমি তাদের ভোটের প্রত্যাশী নই।

জীমূতবাহন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—এটা কি একটা জবাব হল?

: হ'লনা বুঝি? বেশ, তাহলে আরও খোলাখুলি বলি। আমি কনফার্মড ব্যাচিলার, ফলে জৈবিক প্রয়োজনে আমাকে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হয়। এজন্য আপনাদের ভাষায় আমি কনডেমড ডিবচ! তা হোক, আমার কোন ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নেই। কিন্তু আপনাদের তো তা নয় স্যার? আপনাদের সকলেরই ঘরে শুনতে পাই ধর্মপত্নী আছেন। জৈবিক প্রয়োজনে আপনাদের বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তবু মিসেস্ কৌশল্যার সান্ধ্য মধুচক্রে আপনাদের তো যোগ দিতে বাধেনা! না কি আপনারা সবাই অজাতশত্রু? আপনাদের বিরুদ্ধবাদীরা বুঝি বাঁকা কথা বলতে জানে না?

আগরওয়াল আড়চোখে দেখে নেন প্রৌঢ় জীমূতবাহনের মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। তাই হঠাৎ হেসে হালকা করে দেন, কাঁচের ঘরে আমরা সবাই বাস করি স্যার। ইতর লোকের ও সব ছেঁদো কথায় আপনার মত দেশবরেণ্য লোকের কান দেওয়া কি উচিত? আচ্ছা আজ চলি!

হাত দুটি জোড় করে একটা নমস্কার করেন। তারপর ধীর পদে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চল বসে থাকেন মহাপাত্র। এমন স্পষ্ট ভাষায় কেউ যে তাঁকে সরাসরি অপমান করতে পারে এ ছিল তাঁর ধারণার অতীত।

কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। জীমূতবাহন এখন বেকায়দায় পড়েছেন; সামনে তরঙ্গ সংকুল নির্বাচন সমুদ্র। আগরওয়াল একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কাণ্ডারী—তিন তিনবার সে তাঁকে পার করে দিয়েছে এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, এবং এবারও তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দীর্ঘদিনের লেন দেন। তাছাড়া ঐ কালোবাজারি ধনকুবের তাঁর অনেক দুর্বলতার সঠিক সন্ধান রাখে, কে জানে হয়তো প্রমাণও সংগ্রহ করে রেখেছে; অথচ ঐ অন্ধকারের ব্যাপারীর বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। সুযোগ তিনি হেলায় হারিয়েছেন। ডাঃ চ্যাটার্জির মৃত্যুটাকে সন্দেহজনক লেগেছিল তাঁর, কিন্তু তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। উপায় ছিল না। জীমূতবাহনকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অংশীদার করে নিতে লোকটা এককথায় রাজি হয়ে গেল যে। তাছাড়া তখন ইলেকসানও এসে গেছে নাকের ডগায়।

এখন বুঝতে পারেন, ভুল করেছেন। এসব লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হয়। না চললে উপায় নেই—এ হচ্ছে রাজনীতির খেলা। কিন্তু এদের মৃত্যুবান তার আগে সংগ্রহ করে রাখতে হয়। সম্প্রতি এ সত্যটা অনুধাবন করেছেন। উদ্যোগী পুরুষ সিংহ তিনি। আগরওয়ালের ছিদ্র অনুসন্ধানে তখনই লোক নিয়োগ করেছেন। লোকটার মৃত্যুবান সংগ্রহ করে রাখা চাই। অ্যাটম বোমা ফাটাবার দরকার হয় না, শুধু দুনিয়াকে জানিয়ে রাখাত হয়, ওটা আমার ভাঁড়ারেও আছে। ময়ূরকেতন যে বাঁকা কথাগুলো বেপরোয়া ভাবে নির্বিচারে বলে গেল তা শুনে মনে হচ্ছে এ বিষয়ে আরও আগে অবহিত হওয়া উচিত ছিল তাঁর।

মনে পড়ে গেল পুরাতন ইতিহাসটা। বেদনাদায়ক ইতিকথা। সুযোগ তিনি হেলায় হারিয়েছেন।

॥ ছয় ॥

সুজাতা তার পাগল বাবাকে নিয়ে সর্বপ্রথমে জীমূতবাহনের দ্বারস্থ হয়েছিল। তখনও তারা আগরওয়ালকে চিনত না। জীমূতবাহন এ জেলার একজন স্বনামধন্য লোক, আজীবন দেশের সেবা করে গেছেন। সুজাতা আশা করেছিল তাঁর মাধ্যমেই সরকারী সহায়তা পাওয়া যাবে। জীমূতবাহন সেই দুর্লভ সুযোগটা ঠিকমত হাত বাড়িয়ে ধরতে পারেন নি। ঠিকমত খেলিয়ে মাছটা গাঁথতে পারেননি; সুতো ছিঁড়ে মাছটা চলে গেল। ডাঃ চ্যাটার্জির কার্ডের বিলাতী অক্ষরগুলি নজরে না পড়লে ব্যস্ত মানুষ মহাপাত্র হয় তো দেখাই করতেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলেই উনি বুঝতে পারেন কী প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় প্রস্তাব এসেছে তাঁর সামনে।

মানুষের নামের সঙ্গে তার চরিত্রের মিল একটা কাকতালীয় ঘটনা। কারণ চরিত্র রূপ পরিগ্রহ করবার অনেক আগেই নামের সজ্ঞায় প্রতিটি মানবক সুচিহ্নিত হয়ে যায়। তবু দুর্লভ কোন কোন ক্ষেত্রে, বোধকরি ব্যতিক্রমটাই যে নিয়মের পরিচায়ক এটা প্রমাণ করতেই, দেখা যায় অন্ন-প্রাশনে আদর করে দেওয়া নামের যাথার্থ্য প্রমাণিত করেছেন কেউ কেউ উত্তরজীবনে। ডাক্তার সদাশিব চট্টোপাধ্যায় তেমনি এক ব্যতিক্রম। দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। সেখানেই রিসার্চ করেছেন। বিবাহ করেননি। সুজাতা তাঁর পালিতা কন্যা মাত্র। কোন এক অনাথ-আশ্রম থেকে তাকে নিয়ে এসে মানুষ করেছিলেন খেয়ালী বৈজ্ঞানিক। তা সেই সুজাতাই ছিল তাঁর সহায় সচীব। ডাঃ চ্যাটার্জির তরফে সেই গুছিয়ে বলেছিল ব্যাপারটা। ওঁর আবিষ্কারের কথা, তার প্রচণ্ড সম্ভাবনার কথা এবং অবশেষে তাঁর প্রস্তাব—সরকারী অর্থানুকূল্যে বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কারকার্য সম্পূর্ণ করতে চান। ইটের বিকল্প হিসাবে তিনি যে হলো-ব্লক তৈরী করেছেন তাতে বাস্তুনির্মাণ-শিল্পে যুগান্তর আসবে। কন্যার কথা শুনতে শুনতে পিতার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তিনি নিজেই অতঃপর সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব বোঝাতে শুরু করেছিলেন—এই হলো-ব্লকের ইটের দেওয়াল গাঁথার

খরচ শতকরা পঞ্চাশভাগ কমে যাবে; এবং ইটের পিছনে যেহেতু সাধারণ পাকা বাড়িতে শতকরা বিশ-পঁচিশভাগ টাকা খরচ হয়, ফলে গোটা বাড়ির নির্মাণব্যয় টাকায় দু-আনা কমে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ যদি ধরা যায় পশ্চিমবঙ্গে বছরে পাঁচ কোটি টাকায় এ জাতীয় ইটের বাড়ি তৈরী হয়, তাহলে বছরে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে আধ কোটি টাকার মত। ডাঃ চ্যাটার্জি সামান্য রয়ালটির বিনিময়ে এ সুযোগ রাষ্ট্রকে দিতে ইচ্ছুক। তাঁর মতে এ যুগান্তকারী আবিষ্কারের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পরিণতি হল পাবলিক সেক্টারের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা। জীমূতবাহন সমস্তটা শুনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এ পরিকল্পনার সাফল্য বিষয়ে তাঁর নিজেরও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ ক্ষুদ্র পরিসরে ডাঃ চ্যাটার্জির মত বৈজ্ঞানিক হাতে-কলমে ঐ জাতীয় ইট তার আগেই নির্মাণ করেছেন, তার নির্মাণব্যয় কষে বার করেছেন, সে ব্লকের ক্রাশিং স্ট্রেংথ নির্ধারণ করে সন্দেহাতীত প্রমাণ রেখেছেন যে সাধারণ ইটের চেয়ে সেগুলি বেশী ভারসহ। কাগজ পত্রগুলি জীমূতবাহন মোটামুটি পরীক্ষা করে দেখেও নিলেন।

কিন্তু একটি বিষয়ে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে জীমূতবাহন একমত হতে পারেন নি। তিনি বিকল্প প্রস্তাব রাখতে চেয়েছিলেন আবিষ্কারকের সামনে। বলেছিলেন, আশাকরি আপনি বুঝবেন, এসব বিষয়ে সরকারী অর্থানুকূল্য লাভ করা কত কঠিন। নূতন কোন পরীক্ষা করে দেখতে চায় না কেউ। সরকারী এঞ্জিনিয়াররা স্বভাবতই রক্ষণশীল। আপনার পরীক্ষা যদি সাফল্যলাভ না করে তবে পাবলিক মানির অপব্যয় হবে। আমাদের দায়িত্বটা তো বোঝেন; নিজের টাকা তো নয় যে যথেচ্ছ রিস্ক নিতে পারি। আপনি যদি নিজের নামে পেটেন্ট নিয়ে নিজব্যয়ে ছোট একটি কারখানা গড়ে তুলতে পারেন, ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলেও ওটা তৈরী করা যাচ্ছে তা প্রমাণ করতে পারেন, তখন না হয় ফিনান্সকে রাজি করাবার চেষ্টা হতে পারে,—কারখানাটা সম্প্রসারণের জন্য।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক জবাব দেন নি। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নেন, পকেট হাতড়ে রুমাল খুঁজে না পেয়ে কন্ডার আঁচলটা তুলে নিয়ে নীরবে কাচ দুটো মুছতে থাকেন। কন্যা সুজাতাই বলে, কিন্তু কুটিরশিল্প গড়ে তুলবার মত সামর্থ্য থাকলে বাপি আপনার কাছে আসবে কেন বলুন?

এ পরীক্ষায় পিছনেই যে তিনি সর্বস্ব ব্যয় করেছেন। আপনার কাছে গোপন করে লাভ নেই, আমাদের এ মাসের খরচ চলাই এখন মুশ্‌কিল। মাসান্তে বাড়িওয়ালাকে কি ভাবে ভাড়া দেওয়া যাবে এটাই এখন ওঁর প্রধান চিন্তা।

জীমূতবাহন পিতা থেকে কন্যা এবং কন্যা থেকে পিতার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত কন্যাকেই বলেছিলেন, তোমার বাবা রাজি থাকলে সে দায়িত্ব আমি নিতে পারি।

: আপনি? কি ভাবে?—কৌতূহলী হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক।

: সরকারী ইণ্ডাসট্রিয়াল এস্টেটে আপনাকে খান দুই সেড এ্যালট করিয়ে দিচ্ছি। হাজার দশেক টাকা ক্যাপিটালও না হয় দেব।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন বৈজ্ঞানিক—সে তো খুবই ভাল প্রস্তাব! আমি এখনই তাতে রাজি—

বাধা দিয়ে সুজাতা বলেছিল, ঠিক বুঝলাম না; আপনি যে এই মাত্র বললেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিনান্স টাকা স্যাংসান করবেনা, দশ হাজার টাকা তাহলে—

বাধা দিয়ে জীমূতবাহন বলে ওঠেন, তুমি ভুল করছ, আমি সরকারী অর্থ সাহায্যের কথা বলছি না। দেশের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে? তোমার বাবার মত আবিষ্কার হয়তো আমি করতে পারিনা, কিন্তু তাঁর মত দেশের একটি সম্পদকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য তো করতে পারি।

দু-চোখে আশার আলো জলে উঠেছিল সদাশিবের। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আপনি মহান!

সুজাতা কিন্তু অতটা উচ্ছ্বসিত হতে পারেনি। বাপিকে কোটের আস্তিন ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিল। সে বিজ্ঞানের ছাত্রী নয়, ইকনমিক্স পড়া মেয়ে। ধীর স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, আপনি দেবেন টাকাটা? কী সর্তে? কী সুদ দিতে হবে আপনাকে?

: সুদ আবার কিসের? হেসে উঠেছিলেন জীমূতবাহন,—আমি মহাজনী কারবার করিনা। টাকাটা আমি বিনা সুদেই ধার দেব। ডক্টর চ্যাটার্জি একটা হাণ্ডনোটে টাকাটা নেবেন, যখন সুবিধা হবে শোধ দেবেন।

উচ্ছ্বসিত বৈজ্ঞানিক আবার চোখ থেকে চশমটা খুলে ফেলেন। বোধ

করি চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর। জীমূতবাহনের মহানুভবতায়। রুমালের অভাবে হাতের উল্টোপিঠ দিয়েই চোখটা মুছে নেন।

সুজাতার সন্দেহ কিন্তু তাতেও ঘোচেনি, বলে—বিনিময়ে কিছুই দিতে হবেনা আপনাকে, একেবারে নিঃস্বার্থ দান ?

: বেশ তো তোমাদের বিবেকে যদি এতই বাধে, তবে পেটেন্ট নেবার সময় না হয় আমাদের দুজনের নামে নেওয়া হবে। এ আবিষ্কার থেকে যে রয়্যালটি পাওয়া যাবে, তার অর্ধেক আমার, অর্ধেক ডঃ চ্যাটার্জির।

ডঃ চ্যাটার্জি খুশী হয়ে বলেন, বেশ, বেশ, এ আর শক্ত কি ?

তাঁকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল সুজাতা, তুমি চুপ কর বাপি। তারপর জীমূতবাহনের দিকে ফিরে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, কী বলছেন আপনি ? বাপির এ আবিষ্কার থেকে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ টাকা রয়্যালটি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তার অর্ধেক আপনি লিখে নিতে চান মাত্র দশহাজার টাকার জন্য ? তাছাড়া পেটেন্টে আপনার নাম থাকা মানে আবিষ্কারের সম্মানের আধখানাও আপনি ঐ অর্ধমূল্যে কিনে নিতে চাইছেন।

জীমূতবাহন বলেছিলেন, কিন্তু আমার দিকটাও ভেবে দেখ একবার। তোমার বাবা দশ-বিশখানা হলো-ব্লক তৈরী করেছেন মাত্র। বৃহৎ পরিসরে ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে তৈরী করতে গেলে অত কম খরচে সেটা নাও হতে পারে। ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে তৈরী করবার সময় অনেক ওভার-হেড খরচ পড়বে। জমির দাম, ফ্যাকটারির দাম, লোকজনের মাইনে ইত্যাদি ইত্যাদি, যা তোমার ল্যাবরেটারিতে দাম-কষবার সময় ধরা হয়নি। ব্যাপক ক্ষেত্রে হয়তো দামটা এত কম হবেনা যাতে এটা ইটের বিকল্প হিসাবে বাজারে আমরা চালাতে পারি। তোমার বাবার কোন সম্পত্তি নেই যে মর্টগেজ রেখেন, ফলে আমার টাকাটা আমি বন্ধকী-ঋণ দিতে পারছি না। সুতরাং তোমার বাবা সাফল্যলাভ না করলে আমার দশহাজার টাকা জলে যাবে।

ডক্টর চ্যাটার্জি বলেন, যুক্তিপূর্ণ কথা !

সুজাতা হেসে বলেছিল, তা হবে। আমার বুদ্ধি কম, আমার মাথায় সেটা ঢুকছে না। প্রথমতঃ ল্যাবরেটারিতে দু-দশটা স্পেসিমেন তৈরী করতে যে খরচ পড়ে ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে তৈরী করতে খরচ তার চেয়ে বেশী হতে পারে এমন আজব কথা আমি কখনও শুনিনি। তবে তুমি বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী আর উনি নানান ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, ফলে আমার

এ বিষয়ে কথা বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ আপনি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দিচ্ছেন। একথা ঠিক যে বাপি আজ নিঃস্ব। কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখার ক্ষমতা নেই তাঁর। তবু একটা জিনিস তাঁর আছে, যেটা আপনি ভাল করেই জানেন। সেটা হচ্ছে তাঁর বার্লিন য়ুনিভার্সিটির ডক্টরেট অফ এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিটা। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তিনি যে কোন ফার্মে জয়েন করে মাসে দেড় দু-হাজার টাকা রোজগার করতে পারবেন। আপনি ব্যবসায়ী, বেশ ভাল ভাবেই জানেন, হ্যাণ্ডনোটের জোরে তাঁর মাইনে এ্যাটাচ করিয়ে অনায়াসে টাকাটা আপনি উশুল করতে পারবেন।

ঐ একফোঁটা মেয়েটার ফোপরদালালিতে মর্মান্তিক চটে উঠেছিলেন পোড় খাওয়া ব্যবসায়ী জীমূতবাহন। তবু সংযত উত্তরই দিয়েছিলেন তিনি,—তুমি শুধু খারাপ দিকটাই দেখছ।

ডাঃ চ্যাটার্জি দেখা গেল তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। টেবিলে একটা চাপড় মেরে তিনি বলে ওঠেন, এক্সজ্যাক্টলি। শুধু ডার্ক সাইডটাই দেখছিস তুই সু, বি অপটিমিস্টিক! আমরা নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ করব।

সুজাতা সেকথায় কর্ণপাত করেনি, বলেছিল মাপ করবেন স্যার, আমরা ব্যবসায়ী মিস্টার জে. বি. মহাপাত্রের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমরা এসেছিলাম দেশসেবক জীমূতবাহন-মহাশয়ের কাছে, যাঁর নাকি সরকারের উপর মহলে অখণ্ড প্রভাব। বাপির ধারণা এ আবিষ্কার থেকে লক্ষ লক্ষ কেন, ভবিষ্যতে কোটি কোটি টাকা লাভ হতে পারবে। তিনি সে অধিকার রাষ্ট্রকে দিতে চেয়েছিলেন, আপনার মাধ্যমে। প্রাইভেট সেকটারের সাহায্যই যদি নিতে হয় তবে আপনার কাছে আসবেন কেন? অনেক ভাল সর্তে বাপি অর্থসাহায্য পাবেন। অন্ততঃ আপনাদের কল্যাণে যতদিন বাঙলা দেশে কাবুলিওয়ালা আছে।

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল জীমূতবাহনের; কিন্তু খাপখোলা তলোয়ারের মত মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল, হাত দুটি বুকের কাছে জড়ো করে বলেছিল, আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা নষ্ট করে দিয়ে গেলাম। নমস্কার! এস বাপি।

ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা।

জীমূতবাহন কিন্তু হাল ছাড়েন নি। আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেই

পাগল এঞ্জিনিয়ারকে। বাপকে নয়, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মেয়ের হাতেই কলকাঠি। নিজে যাননি, পাঠিয়েছিলেন উপযুক্ত পুত্রকে। পুত্র অরূপরতন ওকালতি পাশ করেছে সম্প্রতি। কথাবার্তায় চৌখস, তদুপরি দেখতে সুন্দর এবং বয়সটা অনুকূল। সুজাতাকে তো আর তিনি পুত্রবধূ করতে যাচ্ছেন না, তাই দৌত্যকার্যে পাঠিয়েছিলেন অরূপকে। লাভ হয়নি। দোষ অরূপের রূপের নয়, তার আগেই ময়ূরকেতন আগরওয়ালের টোপ গিলে বসে আছে বাপ-বেটি। অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি ঐ ময়ূরকেতন, ওদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে তুলেছে কাঁটা তারে ঘেরা তার কারখানার ভিতরে দ্বিতল বাড়িটায়। ছোট ফিয়াট গাড়িটা দিয়েছে তাঁকে। কারখানার ম্যানেজার নকুল দুইকে অর্ডার দিয়ে রেখেছে চ্যাটার্জি-সাহেব যা কাঁচা মাল চাইবেন তাই যেন তাঁকে সরবরাহ করা হয়। একটি গোয়ানিজ পাচককে পাঠিয়ে দিয়েছে রান্না করার জন্য, আর বনোয়ারীলাল তো আছেই অন্যান্য কাজের জন্য। আসলে এভাবে এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে ফেলেছিল আগরওয়াল, ব্যূহ ভেদ করে জীমূতবাহন সদাশিবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি।

একটা জিনিস আজও বুঝে উঠতে পারেন না জীমূতবাহন। অমন বুদ্ধিমতী মেয়েটা কেমন করে ময়ূরকেতনের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। ময়ূরকেতন মানুষটাকে এ জেলার মানুষের চিনতে বাকি নেই, এ শহরের মানুষ তো বিশেষ করে চেনে। বছর তিনেক আগে ওর বাগানবাড়ির সংলগ্ন জমিতে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছিল, এ কথা কে না জানে। সে কেসে ময়ূরকেতনের নামও জড়িয়ে গিয়েছিল, যদিও সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তার গায়ে আঁচড় লাগেনি। এ হেন ময়ূরকেতন আগরওয়ালের বিষয়ে ওরা নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে মাথা গলালো কোন সাহসে? বাপটা অপদার্থ, কিন্তু মেয়েটাকে দেখে তো তা মনে হয়নি! আর সবচেয়ে অবাক করা খবর হচ্ছে এই যে ঐ আবিষ্কারের গোপনসূত্রটা মূর্খ বৈজ্ঞানিক গোপন রাখতে পারেন নি! লেখা পড়া হবার আগেই তার আবিষ্কারের মূল তথ্যটা হতভাগা জানিয়ে দিয়েছিল আগওয়ালকে। এটা যে কেমন করে সম্ভবপর হল তা আজও আন্দাজ করতে পারেন না জীমূতবাহন। তবু এ কথা সত্য। মেয়েকে পর্যন্ত যে কথা বলেনি ঐ মূর্খ বৈজ্ঞানিক কথায় কথায় সে-কথা বলে ফেলেছিল আগরওয়ালকে। না হ'লে সদাশিব হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যাবার পর আগরওয়াল ঐ নামে ঐ হলো-ব্রক তৈরী করতে পারত

না। অথচ সুজাতা এ গোপন আবিষ্কারের মূলসূত্রটা আজও জানে না। যতদূর সংবাদ পেয়েছেন, ডাঃ চ্যাটার্জির রিসার্চের কাগজগুলো এত দুঃখেও হাতছাড়া করেনি তাঁর মেয়ে। কিছুতেই সেগুলো কাউকে দেখতে দেয়নি, না আগরওয়ালকেও নয়। এ কথা সুজাতা স্বয়ং স্বীকার করেছে জীমূতবাহনের কাছে, পিতার মৃত্যুর পর। সুজাতা তাঁকে ফোন করে জানিয়েছে। বস্তুতঃ মনে হয় অরূপরতনের কাছে সে সাহায্যও চেয়েছে। অরূপ ছেলেটা চাপা, কথা বলে কম। তার মনোগত ভাবটা উনি বুঝে উঠতে পারেন নি। সুজাতাকে সে কী ভাবে দেখছে তা সেই জানে। সুজাতার এক্তিয়ারে যে একটা গুপ্তধনের চাবিকাঠি লুকানো আছে এ খবরটাকে বোধকরি অরূপরতন গুরুত্ব দিচ্ছেনা, সুজাতা যে সুন্দরী, সে যে নারী, সে অসহায় এইগুলোই হয়তো তাঁর ব্যাচিলার রোমান্টিক ছেলের কাছে বড় কথা! বাপে ছেলেতে এ নিয়ে খোলা কথা কোনদিন হয়নি। অরূপ যে ধাতুতে গড়া তাতে তার সঙ্গে এ সব বিষয়ে খোলা কথা বলতে সাহস হয়না তাঁর। বাধ্য হয়েই তাকে এড়িয়ে সরাসরি সুজাতার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে হয়েছে তাঁকে। টেলিফোনে। সুজাতাকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন কাগজগুলো গোপনে রাখতে। আগরওয়াল অবশ্য কিছুটা জানতে পেরেছে, সদাশিবকে পটিয়ে, কিন্তু পেটেন্ট নিতে গেলে যতটা জানা দরকার ততটা নিশ্চয়ই সে জানেনা। সেটুকুও জানা থাকলে সে নিজের নামে এতদিনে পেটেন্ট নিয়ে ফেলত। জীমূতবাহন ইলেকসানে নেমেছেন, তাই ময়ূরকেতন সময় করে উঠ্তে পারছেন না, এমন হাস্যকর কথাটা আর যেই হ'ক তিনি বিশ্বাস করেন না। তা হ'ক, ময়ূরকেতন লোকটা অতি ধূর্ত। স্বেচ্ছায় অধিক লভ্যাংশ সে দিয়ে যাচ্ছে আবিষ্কারকের একমাত্র কন্যাকে, যদিও আসল কাগজগুলো সুজাতা হস্তান্তর করেনি, এমন কি দেখতে পর্যন্ত দেয়নি। যত্নের শেষ নেই তার। সুজাতার জীবনযাত্রায় কোন অভাব সে রাখতে দিচ্ছে না। কী ভাবে ঐ অজগরের বিবর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনা যায় ভেবে তার কোন কূল কিনারা করতে পারছেন না। ঐ গোয়ানিজ রাঁধুনিটা একটা দাগী লোক। ওর ইতিহাসটা ঠিক জানেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন ও আছে ঐ আগরওয়ালের কারবারে। হয়তো ঐ লোকটাও আঁধারের কারবারী। নকুল হুই অত্যন্ত ভালমানুষের মতো হাত দুটি জোড় করে থাকে বটে কিন্তু সেও সুবিধার নয়। সেও অত্যন্ত ধূর্ত। সুতরাং

আগরওয়ালের অনুপস্থিতকালেও বিশেষ কিছু করা যাচ্ছে না। আর শুধুমাত্র মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনলেই তো চলবে না, ঐ সঙ্গে কাগজগুলোও উদ্ধার করতে হবে। মুশকিল এই যে সুজাতা তাঁর সাহায্য চাইছে বটে, কিন্তু মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ জীমূতবাহন বেশ বুঝতে পারেন, মেয়েটি এখনও তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। এ বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারত অরূপরতন, কিন্তু ছেলের মনোগত ইচ্ছাটাই তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেন নি। অপরপক্ষে আগরওয়াল নির্বাচনের রণাঙ্গনে তাঁকে অকুণ্ঠ সাহায্য করছে। আগরওয়ালকেও এ সময় চটালে চলে না—ব্যবসায়ী মহলের সলিড সাপোর্ট লোকটা দিতেও পারে, কেড়ে নিতেও পারে।

ভৃত্য এসে একখানা দামী ভিজিটিং কার্ড রাখে টেবিলের উপর। জীমূতবাহন কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখলেন—এস. পি. সিং। সেই বাসরুট পারমিটের প্রার্থী। লক্ষপতি মানুষটা সকাল-সন্ধ্যা ধর্না দিতে শুরু করেছে আজকাল। বোধহয় ও বেটা ভয় পেয়েছে নির্বাচন শেষ হলে সব ওলট পালট হয়ে যাবে। তাই রাতারাতি পারমিটটা বার করে নিতে লোকটা আদাজল খেয়ে লেগেছে। এই লোকগুলো বোঝেনা কেন যে জীমূতবাহন ভগবান নন। এই সব ঝামেলা এড়াবার জন্য মন্ত্রীত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি তিনি, অথচ লোকগুলো নাছোড় বান্দা। পার্টিফাণ্ডে চাঁদা আর প্রাইভেট ফাণ্ডে চাঁদির যোগান দিয়েই দিনকে রাত করা যায় এই ওদের ধারণা। বোঝেনা, জীমূতবাহনকেও পার্টির নির্দেশ মেনে চলতে হয়, তাঁকেও কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হয়।

: বৈঠনে বোলো, কুছ দের হোগা।

বসে থাকুক বেটা আপাতত।

॥ সাত ॥

কৌশিকের ডায়েরিতে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। কলেজ জীবনের শেষ পর্যায়েও সে ছন্দোবদ্ধ সমিল কবিতা লিখছে। কিন্তু গদ্য রচনা আর শেষদিকে সাধু ভাষায় নয়। অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে তার কিছুটা বিবর্তন হচ্ছে বটে, কিন্তু তার কবিমানসের বিশেষ কোন পরিবর্তন

আমার নজরে পড়েনি। কুলি বস্তীর জীবনযাত্রায় সে দুঃখ বোধ করেছে, নিয়ামতের প্রতি সমাজের উপেক্ষায় সে বেদনাহত—কিন্তু আগেই বলেছি, এসব ক্ষেত্রে সে বিদ্রোহী নয়। তার রোমান্টিক কবিমন আত্ম-প্রতারণার পথে তির্যক সান্ত্বনা খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে। এই পর্যায়ের আরও একটি কবিতা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে পারি। এটাও ওর কবি মনের বিবর্তনের একটা পর্যায়। সার্ভে চেনের প্রসঙ্গে যে কবি ছিল সম্পূর্ণ রোমান্টিক, আত্মরতিতে বিভোর, চিনিকলের কুলি বস্তীতে তাকে দেখলাম বেদনাহত ব্যথাতুর। তবু সে জীবন জিজ্ঞাসার সহজ নেতিমূলক সমাধান করতে চেয়েছিল। নিয়ামৎ মিস্ত্রির বঞ্চিত মানবাত্মা তাকে যতটা বিক্ষুব্ধ করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে করে তুলেছিল রোমান্টিক। এবার যে উদাহরণটি রাখছি তাতে লক্ষণীয় কবি নিজ অভিজ্ঞতার কথাই বলছেন; এখানে তিনি দর্শক নন, নিজেরই অনুভূতির কথাই লিখেছেন। হয়তো এতক্ষণে আঁতে ঘা লেগেছে বলেই এঞ্জিনিয়ার কবি এবারে প্রণিধান করেছেন যে প্রতিপক্ষও একজন আছে। চিনিকলের কুলিদের দুঃখগাথায় ধনতান্ত্রিক মিল মালিকের ভূমিকা সম্বন্ধে কবি ছিলেন উদাসীন, নিস্পৃহ, নীরব; নিয়ামৎ মিস্ত্রির বঞ্চনার ইতিহাসের সঙ্গে মুনাফা শিকারী ঠিকাদারের ভূমিকাটা তাঁর নজরে পড়েনি; কিন্তু এবার এই আত্মনেপদী কবিতাটিতে দেখছি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মেহনতি মানুষদের, কারীগরী কাজ জানা মানুষের বঞ্চনার মূল কারণটার দিকে তাঁর নজর পড়েছে। কবি লিখেছেন,

গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণে আমিও আমন্ত্রিত
গৃহকর্তার সাদর বিনয়ে হলাম আপ্যায়িত।
মঙ্গলঘট আম্র পত্র থেকে
কিছু বাদ নাই—বাড়িটি দিয়েছে ঢেকে।
লালনীল আর সবুজ কাগজ জুড়ে
আপাদশীর্ষ বাড়িটা দিয়েছে মুড়ে।
ট্রাম লাইনের মডার্ন বাঙলোখানি
ভারি গহনায় বেনারসী পরে সেজেছে পটের রাণী।
গৃহকর্তার ইয়ার বন্ধু এসে
সমঝদারের বিচিত্র হাসি হেসে

তারিফ করেন আমার রুচিকে সবে।
লাল হয়ে উঠি আপনার পরাভবে।

* *

গৃহকর্তাই এ বাড়ির আজ প্রভু
সেই সাথে ফের জানিয়ে রাখছি তবু
এ বাড়ি উঠেছে অধমেরই ডিজাইনে
গৃহকর্তাই অর্থমূল্যে নিয়েছেন তারে কিনে॥

* *

অজাতশিশুর অজানা হাসিটি যখন গোপন থাকে
আসন্নমাতা আপন স্বপ্নে তাকে
আপনার করে জানে।
তেমনি যখনই চেয়েছি প্ল্যানের পানে
হিজিবিজি সেই চিহ্নের মাঝে খুঁজে
এ বাড়ির এই আজকের রূপ তখনই নিয়েছি বুঝে।
এর শৈশব ভিত্তির মূলে আমারই পরশ আছে
বনিয়াদ তলে বাল্যজীবন কেটেছে আমারই কাছে।
ফুটফুটে সেই ছোট্ট মেয়েটি আজ
রাঙা চেলি পরে সেজেছে পটের সাজ।
হাল-আমলের ছিমছাম রুচি মেখে
গহনার ভারে সজল চক্ষে আছে মোর পানে চেয়ে।
পোর্টিকোর পরে ক্যান্টিলিভার বারান্দাটার থেকে
দেবদারু পাতা আগাগোড়া দেছে ঢেকে।
ক্রীম-কালারের সী-সেম রঙের পাশে
লাল শালুখানা রক্তচক্ষে উঠিয়ে মারতে আসে॥

* *

ভোজন পর্ব শেষে
পথের প্রান্তে দাঁড়ালেন ফের এসে।
গৃহ-প্রবেশের মন্ত্র এ নিমন্ত্রণ,
ধনিক-মূর্খ জামাতার করে আমার বিদুষী কন্যা সমর্পণ!
পিতৃস্নেহের শেষ হল অধিকার
বিদায় মা আমার॥

বেশ বুঝতে পারি, কবি এখানে শুধু রোমান্টিক নন, তিনি পলায়নপর, এসকেপিস্ট। এই ট্র্যাজেডির মূলে কী আছে তার সন্ধান যে তিনি জানেন না তা মনে হয়না; কিন্তু উটপাখীর মত তিনি বালিতে মুখ গুঁজে সমস্যাটা এড়াতে চাইছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত ভাষা কবির কলম তখনও খুঁজে পায়নি।

এই কবিতাটি কিন্তু কবি কৌশক মিত্র তার কলেজ জীবনে লেখেনি। ইতিমধ্যে ফার্স্ট ক্লাস বি. ই ডিগ্রি নিয়ে সে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তার ভাষাতেই বলি: "প্রায় ছয় মাস হতে চলল পাশ করে বেকার বসে আছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। আশ্রয় নিতে হয়েছে বন্ধুর মেসে, তারই দাক্ষিণ্যে। আশৈশব আমার খরচ টেনে এসেছিলেন যে বৃদ্ধ কাশীবাসী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক তাঁর স্কন্ধে গিয়ে ভর করতে সঙ্কোচ হল। সংসার বিষয়ে বাবা এখন বেশ নির্লিপ্ত। পাশ করেছি শুনে খুশী হলেন, চাকরি পাচ্ছিনা বলে দুঃখিত হলেন; কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তাঁর মনে এসব কথায় আর দাগ পড়ে না।

কিন্তু কোথাও একটা চাকরি যোগাড় না করতে পারলে আর চলছে না। বাপির কাছ থেকে সঙ্কোচে পালিয়ে এসেছি, তাঁর পেনসনে ভাগ বসাবো না বলে; কিন্তু বন্ধুর ঘাড়েই বা কদিন বসে খাওয়া যায়? একের পর এক ইণ্টারভিয়ু দিয়ে চলেছি। কোন ব্যাটাই ডাকছে না, অথচ প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে পাঁচটাকার পোস্টাল অর্ডারসহ দরখাস্ত করতে। বাধ্য হয়ে স্লাইড রুলটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দামে বেচে দিতে হল। একটা গরম কোটও বেচে ফেলেছি! পরশুদিন ইনটারভিয়ু দিতে গিয়ে একটা নতুন প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিলাম,—এই ছয়মাস স্রেফ বসে আছেন? কিছুই করছেন না?

"যেন অপরাধটা আমারই। ঠিকাদারী করতে গিয়েছি, শুনেছি এখন নূতন ঠিকাদারের এনলিস্টমেণ্ট হচ্ছেনা। কারণ? কাজের অপ্রতুলতা, ঠিকাদারের আধিক্য। বিনা এনলিস্টমেণ্টেও কাজ করা যায়। ওপন টেণ্ডার। কিন্তু সে কাজের পরিমাণ দু-লক্ষ টাকার উপর। সে কাজ তুলবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আছে, কিন্তু ক্যাপিটল কই? চাকরি ধরতে গিয়েছি, শুনেছি কাজ কোথাও খালি নেই। হেতু? কাজের অপ্রতুলতা, এবং এঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাধিক্য।

"অথচ কেন এমনটা হল?"

"প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে সারা ভারতবর্ষে মাত্র পঁয়ত্রিশটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল। যাঁরা পরিকল্পনা করলেন, তাঁরা বললেন,—অভাব অর্থের নয়, অভাব কাঁচা মালের নয়, অভাব শুধু এঞ্জিনিয়ারের। অভাব কারিগরী কাজ জানা মানুষের। আমাদের মত সহস্র সহস্র ছেলে খবরের কাগজে বড় বড় বক্তৃতার অংশ পড়ল, প্রত্যহ বেতারে কর্তাদের বক্তব্য শুনল, তারা উৎসাহিত হল। দলে দলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল এঞ্জিনিয়ার হবে বলে। হাজার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার হল থেকে তারা বাড়ি ফেরে না, ছোটে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এ্যাডমিশন্ টেস্টের পুরানো প্রশ্নপত্রের খোঁজে। কাকে ধরলে ঢোকা যাবে ঐ স্বর্গলোকে? যারা প্রথম বিভাগে পাশ করবার ভরসা রাখে না, তারাও বসে নেই—কোনও এল. সি. কলেজে ভর্তি হওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা করতে থাকে। নিদেন ওভারসিয়ার হতে হবে। তারপর নিজের চেষ্টায় যদি এ. এম. আই. ই পাশ করা যায় তাহলে তো পুরাদস্তর এঞ্জিনিয়ার! দশবছরের মধ্যে পঁয়ত্রিশ থেকে কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলা হল একেবারে একশ এগারোতে। তিনগুণেরও বেশী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে প্ল্যানিং কমিশন আর একবার ভাল করে দেখতে চাইলেন কারিগরী কাজ জানা মানুষের অভাব কতটা পূরণ হল। সরকার নিয়োজিত একটি বিশেষ কমিটি এজন্য তথ্য সংগ্রহ করল। বিভিন্ন চেম্বার-অফ কমার্স, সরকারী আধা-সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন। তাতে বলা হল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জন্য নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলায় কারিগরী কাজ জানা মানুষের একান্ত অভাবটা কিছু পরিমাণে কমেছে; তবু তাঁদের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ ডিগ্রি ধারীদের অভাবটা দাঁড়াবে আন্দাজ আঠারো শ,' এবং ডিপ্লোমাধারীদের অপ্রতুলতা হবে আন্দাজ আট হাজার! সুতরাং ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটি আরও নূতন আঠারোটি ডিগ্রি কলেজ এবং বাষট্টি নূতন পলিটেকনিক খোলার পরামর্শ দিলেন। ফলে অচিরেই......"

এসব নেহাৎ সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপার। এ কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজন। তিনটে পরিকল্পনায় দেশে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কী দ্রুত উন্নতি হয়েছে তার হিসাব জানবার জন্য কৌশিকের ডায়েরি ঘাঁটার প্রয়োজন নেই। প্রচার দপ্তরে খোঁজ করলেই তা পাওয়া যাবে। শেষ দিকে কৌশিক লিখছে

"সারা ভারতে আজ বেকার এঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যাটা ঠিক কত তাই কেউ হিসাব করে বলতে পারছেন না। কেউ বলেন বিশ হাজার, কেউ বলেন, ত্রিশ।

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ইট-তৈরীর কারখানা খুলেছেন ফলতায়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইট তৈরীর কারখানা। চাকরির সন্ধানে একবার ঢুঁ মারতে গিয়েছিলাম সেখানে। বিদেশ থেকে হরেক রকম যন্ত্রপাতি আনিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইট তৈরি করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কলকাতা শহরকে পরিশ্রুত জল সরবরাহ করতে গঙ্গানদী থেকে জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বিরাট বিরাট কৃত্রিম জলাশয়ে—ওঁরা বলেন সেট্‌লিং ট্যাংক। গঙ্গার ঘোলা জলের পলিমাটি তলায় থিতিয়ে পড়ে। উপর থেকে জলটা টেনে নিয়ে সেটাকে পরিশ্রুত করে সরবরাহ করা হয় টালা ট্যাংকে। কিন্তু তলায় থিতিয়ে পড়া পলি মাটির গতি কি হবে? গতি হয় না। ফলে এই বিরাটাকার কৃত্রিম জলাশয়গুলি একে একে ভরে উঠছিল। এতদিন এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল নূতন নূতন জলাশয় খনন করা। একটি জলাশয় পলিমাটিতে ভরে উঠলে নূতন একটি খুঁড়ে অভাব পূরন করা হত; কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার সম্প্রসারনের পর আর নূতন জলাশয় খননের উপযুক্ত জমিও পাওয়া যায় না আজকাল। তাই এই নূতন প্রকল্পটিতে হাত দিয়েছেন সরকার। পলিমাটি থেকে তৈরী করছেন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোড়া ইট। অনেক টাকার বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে এসেছে এক্সকাভেটার, কেরিয়ার, মিক্সার, হপার, ফীডার এবং যান্ত্রিক চুল্লি। কলকাতা শহরের ইটের চাহিদাও তো বড় কম নয়।

"ভেবেছিলাম এখানে হয়তো কোন কাজে আমার মত লোকের অন্নসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হলনা। ফলতা ইটের কারখানার ভারপ্রাপ্ত সরকারী এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হল। আমাদেরই কলেজ থেকে পাশ সুরেন রায়। মুখচেনা ছিল। ওঁর বাবা ছিলেন সরকারী কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। সেই পরিচয়ে তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। চা এবং বিস্কুট খাওয়ালেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমাকে নিতে পারছেন না বলে। বললেন, আপনাদের ব্যাচের একটি ছেলে আমাদের এখানে আছে, সুরেশ নাগ, চেনেন?

"—খুব ভাল ভাবেই চিনি। আমাদেরই হস্টেলে ছিল। সুরেশ এখানে চাকরি পেয়েছে?

"পেয়েছে, তবে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে নয়। দাঁড়ান ওকে ডাকি।

"বেল বাজিয়ে পিওনকে ডাকলেন। বললেন, সুরেশবাবুকে ডাক।

"সুরেশের আসতে যেটুকু সময় গেল, তারই মধ্যে আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, এঞ্জিনিয়ার হিসাবে নয়, মানে?

"উনি বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা: আমাদের প্রয়োজন ছিল একজন কেরানীর। কিন্তু কেরানীর পোস্টের স্যাংশন পাওয়া গেল না। ফ্যাকটারী বর্তমানে যথেষ্ট লাভ দেখাতে পারছে না, ফলে নূতন ক্লার্ক স্যাংশন হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে আমরা একটা তির্যক পন্থায় অভাব পূরণ করেছি। ডেলি-লেবার লাগাবার জন্য আমাকে কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। দৈনিক মজুর লাগাবার অধিকার আমার আছে। আপনার বন্ধুকে দৈনিক আড়াইটাকা মজুরির হারে চাকরি দিয়েছি আমি। খাতা কলমে সে মাটি-কাটা কুলি, যদিও আসলে তাকে দিয়ে কেরানীর কাজ করাচ্ছি।

"অবাক হয়ে বলি—সুরেশ দৈনিক আড়াই টাকা হারে দিন মজুরী করছে? বলেন কি?

"সুরেশ এলে তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন বরং। এখান থেকে সত্তর পঁচাত্তর পায়, সন্ধ্যা বেলা দুটি ছেলেকে পড়ায়। সপ্তাহে তিনদিন একে, তিনদিন ওকে। দু জায়গায় থেকে মিলিয়ে পায় শ' দেড়েক। অর্থাৎ সব-সাকুল্যে শওয়া দুশ' মতন রোজগার করছে। উপায় কি বলুন?

": আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। আমাদের কলেজের বা রেওয়াজ।"

": বেশ তো, তাই না হয় বলব। ঐ তোমার বন্ধু এসে গেছে, সুরেশ, একে ফ্যাকটারীটা দেখিয়ে আনো। তোমার বন্ধু, পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই আশা করি।

সুরেশ আমাকে ইট-তৈয়ারীর প্রণালী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। সেট্‌লিং ট্যাংকের মাটি-কাটা থেকে শুরু করে ইটের থাক দেওয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থা। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সুরেশ নাম যদিও আড়াই টাকা হারে মাটি কাটা কুলি, কিন্তু সে কথা বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা মনে রাখেনি। যেখানেই সে আমাকে নিয়ে গেল, সেখানেই নিম্নশ্রেণীর কর্মীরা ওকে হাত তুলে নমস্কার করল, কেউ কেউ মুখে বললও—নমস্কার স্যার।

জনান্তিকে সুরেশকে বলি, তোকে এরা স্যার বলছে কেন? ওদের অনেকের রোজগার তো তোর চেয়ে বেশী?

ম্লান হেসে সুরেশ বলে, অনেকে আসল খবরটা জানে না। অনেকে জানে, তবু আমাকে নমস্কার করে দেখি। বোধ করি ও নমস্কারটা আমার প্রাপ্য নয়, আমার ডিগ্রিটার প্রাপ্য।

সুরেশের কাছে কয়েকজন সতীর্থের সংবাদ পেলাম। ভাগ্যবান কেউ কেউ চাকরি পেয়েছে। দু একজন জব-ভাউচার যোগাড় করে বিলেত গেছে। সুরেশ, রবি আর সুবিমল একটা যৌথ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান খুলেছে। কাজ যোগাড় করতে পারেনি, টেণ্ডার দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। শিবু তার বাবার ডিসপেন্সারীতে বসছে। কম্পাউণ্ডিং পরীক্ষা দেবে এবার। গোরা, বনি আর ছোটন স্কুল-মাষ্টারী করছে। তার মধ্যে গোরা হয়েছে প্রাইমারি স্কুলের টিচার। সতু বাটার জুতোর দোকানে সেলস্-ম্যানের চাকরি পেয়েছে। অধিকাংশই অবশ্য এখনও ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সমস্ত কারখানাটা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে সুরেশ বলে, চল, তোকে এককাপ চা খাওয়াই। হাজার হোক আমার চাকরি হয়েছে, তুই এখনও বেকার।

হেসে বললুম, না ভাই সুরেশ, তোর এ চাকরি পাওয়ায় আমি খুশী হতে পারিনি। মাটি-কাটা কুলির আড়াই টাকা রেটের চাকরির জন্য তুই পাঁচবছর এঞ্জিনিয়ারিং পড়িস নি! তারচেয়ে চল গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। সুখ-দুঃখের গল্প করি বরং কিছুক্ষণ।

গঙ্গার ধারে বসে অনেক গল্প হল। কলেজ জীবনে আমরা কত স্বপ্নই না দেখতুম। বাস্তব দুনিয়ায় দেখছি সে সব স্বপ্নের কোন ঠাঁই নেই। সুরেশ বলে, আচ্ছা কৌশিক, তুই তো জেনারেল স্কলার ছিলি, তুই মরতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এলি কেন?

"হেসে বলি, সুরেশ, তুইও কিছু থার্ড-ডিভিসনে টিকিয়ে টিকিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করিস নি, এই মাটিকাটা কুলি হবার জন্যে তুইই বা সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলি কেন?"

"সুরেশ হাসে। একটা চারমিনার সিগারেট ধরায়, বলে, চার্জ অব দ লাইট্ ব্রিগেড কবিতাটা মনে আছে? কোন শালা সেনাপতি মদের ঝোঁকে কি হুকুম দিয়ে বসল, আর ছ'শ সৈনিক কামানের মুখে ছাতু হয়ে গেল! মারো গুলি!

প্রসঙ্গটা বেদনাদায়ক, তার মোড় ফেরাবার জন্য বলি, ও কথা থাক, আচ্ছা এই ফ্যাকটারীর কোনও এক্সটেনসন হবে? আজ না হ'ক ভবিষ্যতে কিছু হবার আশা আছে?

: খোল এবং নলচে দুটি বদল না হলে নয়।

: তার মানে ?

এ এক বিচিত্র ব্যাপার যে কৌশিক। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা কি করে চলে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। এই ফলতা ব্রিক ফ্যাকটারিতে সরকারের একটি বিভাগ যে ইট তৈরী করছেন, তা বাজারের সাধারণ ইটের তুলনায় সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এর ভারবাহী ক্ষমতা বেশী, এতে মশলা লাগে কম, এতে লোনা ধরার সম্ভাবনা কম, এর ব্রেকেজ নেই বললেই চলে। এ সত্য সবাই মেনে নিয়েছেন, সরকারের সমস্ত এঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা থেকে বড়কর্তারা এসে দেখে গেছেন ফ্যাকটারী, এবং সবাই তা স্বীকার করেছেন। অথচ আমাদের এ কারবারে লোকসান হচ্ছে, তার কারণ কেউ এ ইট কিনছে না। সবচেয়ে মজার কথা সরকারী কাজেই এ ইট ব্যবহৃত হচ্ছে না। তার কারণ যেসব সরকারী বিভাগ ইট ক্রয় করেন, তাঁদের কারও গরজ নেই এই প্রকল্পটি সার্থক করে-তুলতে। বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কর্তা। তাই সরকারের একটি বিভাগ পাহাড় প্রমাণ উৎকৃষ্ট ইটের স্তূপ বিক্রি করতে না পেরে লোকসান গুনছেন, এবং অপর সব কয়টি বিভাগ বাজার থেকে নিকৃষ্টতর ইট খরিদ করে প্রাইভেট সেকটারকে মদৎ যোগাচ্ছেন! সাধ করে কি আর সেকেন্দার শাহ' বলেছিল : সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! মারো গুলি!

ফলতা ইট-ভাঁটায় চাকরি আমার হয়নি। তবু একটা নতুন জিনিস দেখে এলাম। সুরেশ নাগ, বি. ই. সি-ই দৈনিক আড়াই টাকা হারে মাটি-কাটা-কুলির লেজারে নাম লিখিয়েছে! এ দিনের অভিজ্ঞতার আর একটি নগদ লাভ কবিতার খাতায় একটি নূতন সংযোজন। কবিতাটির নাম :
$৯\frac{৩}{৪} \times ৪\frac{৩}{৪} \times ২\frac{৩}{৪}$!

"চেন কি আমারে ? বন্ধু যে আমি তোমাদেরই কয়রেক্ত
ওদের সৌধ ভিত্তির মূলে আপন অস্থি দিছি ভেট,
দলে দলে মোরা শায়িত হয়েছি, নেমেছি সোপানে সোপানে,
সে সোপান বাহি, ওরা সারি সারি উঠেছে উর্ধ্ব উজানে।
পথের তলায় ধূলা বালি মাখা আমাদের শব শায়িত
ওরা পীচ ঢেলে গড়েছে কবর, রেখেছে লুক্কায়িত।
লক্ষ চরণ বক্ষে-নিত্য আঁকিছে পুরস্কার,
প্রিয় কয়রেক্ত! পারনা চিনিতে দুঃখের গাথা কার?

তুমিও তো ভাই মোদেরই মতন মরেছ,
জঙ্গল কেটে আজাদীর পথ গড়েছ,
সে পথে আজ কি পারছ মোটর চালাতে ?
রয়েছ তো পড়ে পথের সোলিং তলাতে।
মোদেরই মতন পড়ে আছ ভাই নিচুতে,
তবুও আমায় পারনা চিনিতে কিছুতে ?

ছেলেবেলা পাতেরায় কি যে ছাপ এঁকে যায়
সেই ছাপ নিয়ে ভালে কাটে নিশিদিন,
পোড়া কপালের গুনে পুড়িয়াছি কী আগুনে
জলে পুড়ে মাটি-মন হয়েছে কঠিন !
এই ধরণীর বুকে শুয়েছিনু মোরা সুখে
এক হয়ে ছিনু সবে, নাই ভেদাভেদ,
ওরা কোদালের ঘায় কেড়ে নিয়ে চলে যায়
কাঠের খাঁচায় ফেলে, হানে বিচ্ছেদ।
ওদের খেয়ালমত মরি মোরা শত শত
ভাঁটার আগুনে দেহ জলে পুড়ে যায়,
কখনও খেয়াল হ'লে মাথার উপরে তোলে
কখনও চুবায়ে রাখে চৌবাচ্ছায়।
তারপরে আমাদের ঝামা আর আমা-দের
তফাতে সরায়ে দেখি স্ট্যাকে নিয়ে যায়
খুশিমত গড়ে তবু খেয়াল হইলে প্রভু
ছেঁটে ছুটে নেয় ফের বাঁশুলির ঘায়।
ভিত ছাদ যে যেখানে ঠাঁই পেলে মানে মানে
পড়ে থাক সেইখানে সারাটি জীবন,
আজীবন কারাবাস, নাই মুক্তির আশ,
নাই ভিজেকের ঠাঁই পরিবর্তন।

তুমিও তো ভাই মোদেরই মতন বন্দী
অত্যাচারিত সমাজ ব্যবস্থায় ;

এঁটেছ-কি কভু পালাবার কোন কদি
কারাগার ভেঙে মুক্ত আবহাওয়ায় ?
দুঃখের গাথা শুনলে তো আমাদের
শোন চুপি চুপি মুক্তির কথাটাও
দেখ কমরেড ! এতে যদি তোমাদের
মুক্তি পথের সন্ধান কিছু পাও।

মা জননী আজও তাই সন্তানে ভোলে নাই
ভোলে নাই মানুষের নীচ অত্যাচার
সুনিভৃতে ক্রন্দনে গুমরিয়ে মরে মনে
মনে পড়ে কেড়ে নেওয়া সন্তানে তার।
জানি মোরা একদিন বন্ধন হবে ক্ষীণ
আকাশে উঠিবে মা'র আর্ত নিনাদ ;
জননী ভূ-কম্পনে টেনে নেবে জনে জনে
টুটে যাবে অচলায়তন এই বাঁধ !
সব বাধা হবে গত ছুটে যাব শত শত
ধরণী মায়ের কোলে আমরা আবার
ধ্বংসের পানে চেয়ে বোকা হবে সবচেয়ে
নক্সাটি হাতে লয়ে মূঢ় বাস্তুকার ॥"

নিঃসন্দেহে বেকার এঞ্জিনিয়ার কবি কৌশিক মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। তার কবিমানসের বিবর্তন লক্ষণীয়। কুলি-ধাওড়ায় আখের রসের সঙ্গে নররক্তের সংমিশ্রণ দেখে যে কবির রোমান্সের মোহ ভাঙেনি, নিয়ামৎ-মিঞার শিল্পী-সত্তার অবমাননায় যে তাকে শেলী-কাস্তের ইউটোপিয়ান স্বর্গ-লোকে ঠেলে তুলে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেছিল, ধনিক-গৃহস্বামীর কাছে কন্যাস্বরূপা মর্ডান-বাংলোটিকে উৎসর্গ করে ম্লানমুখে বাড়ি ফিরে এসেছিল, সে আজ ইটের স্ট্যাকগুলোকে রুখে দাঁড়াতে বলছে। রোমান্টিক-কবি একদিনে ১$\frac{3}{8}$" × ৪$\frac{3}{8}$" × ২$\frac{3}{8}$" আকারের একখানি কবিতা থানইটের মত ছুঁড়ে মারতে চেয়েছে এই সমাজ-ব্যবস্থার মাথা লক্ষ্য করে। তার রোমান্সের স্বপ্ন ছুটে গেছে। তা সত্ত্বেও একটা জিনিস আমি লক্ষ্য না করে পারিনি। তবু একটা কিন্তু রয়ে গেল। কথাটা এই যে কবি কৌশিক এখনও ঠিকমত

পথের সন্ধান পায়নি। সমস্যা সম্বন্ধে সে সচেতন, শত্রুর ঠিকমত পরিচয়ও সে পেয়েছে, এমন কি তার এই কবিতায় সে 'কমরেড' শব্দটা একাধিকবার ব্যবহার করেছে, তবু আমার মনে হয়েছে—নিজের শক্তির প্রকৃত উৎসটার সন্ধান সে পায়নি। একতার মধ্যে, সংহতির মধ্যে সে মুক্তি মন্ত্রের সন্ধান করেনি—এখনও সে দৈব নির্ভর। সে আশা করে আছে বাইরে থেকে আসবে তার সাহায্য! কবে ভূমিকম্পে মা জননী এ অচলায়তন ভেঙে ফেলবে সেই আশাতেই দিন গুনছে তার বন্দী দল! আত্মসচেতনার মধ্যে নয়, আত্মবিশ্বাসে নয়; তার মুক্তিমন্ত্র যেন বিদেশ থেকে পাকা ফলটির মত তার হাতে এসে পৌঁছাবে। রাশিয়া থেকে? না কি চীন থেকে?

॥ আট ॥

ময়ূরকেতনের গাড়িটা বেরিয়ে যাবার পর সুজাতা ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে ফিরে আসে। বসে গিয়ে নিজের ঘরে। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে তার। কিছুই ভাল লাগছে না। কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে তার ভাগ্যটা, কী অদ্ভুত পরিবর্তন। বাল্য আর কৈশোর তার কেটেছে একটি অনাথআশ্রমে। সেখান থেকে হঠাৎ খেয়াল বশে তাকে তুলে এনেছিলেন ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়। কন্যাত্বে বরণ করেছিলেন তাকে। কন্যার মর্যাদাও দিয়েছিলেন, ভালবাসাও। সেও প্রাণভরে ভালবেসেছিল ঐ আধা-পাগল বৈজ্ঞানিককে। প্রথম প্রথম তার অদ্ভুত লাগত, পরে বুঝেছিল এটাই স্বাভাবিক। জিনিয়াস মাত্রেই পাগল। ভগবান এক হাতে দিলে অন্য হাতে কেড়ে নেন? যুগান্তকারী আবিষ্কার যে করে সে তোমার-আমার মতো স্বাভাবিক নয়। অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর সুজাতার উপর। জামা-কাপড় টাকা-পয়সা জমা-খরচ সবই সুজাতা করত। উপার্জন যা করতেন, না গুনেই মেয়ের হাতে তুলে দিতেন, আবার যখন প্রয়োজন হত তার কাছেই এসে হাত পাততেন। শুধু একটি বিষয়ে তিনি মেয়েকেও বিশ্বাস করেন নি। না, কথাটা বোধহয় ঠিক হলনা। এ ঠিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। তোমার অতি আপনজন যদি তার জপের বীজমন্ত্র তোমাকে না জানায় তবে কি তুমি বলবে যে সে তোমাকে

বিশ্বাস করেনা? তা তো নয়। বাপিও যে তাঁর আবিষ্কারের মূলকথাটা তার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন তার পিছনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। এ মন্ত্রগুপ্তি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকদের কাছে অলিখিত আইন, অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। তাই তো আরও অবাক হয়ে যায় সুজাতা। এমন মানুষের কাছ থেকে কেমন করে সেটা আদায় করল ময়ূরকেতন? অথচ আদায় যে করেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আগরওয়াল দিয়েছে। হাতে নাতে সেই হলো-ব্লক তৈরী করিয়েছে ময়ূরকেতন, অত সস্তায় না হলেও প্রায় ঐ দামে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার ভারবাহী ক্ষমতাও যথেষ্ট এবং তাতে প্রয়োজনীয় সিমেন্টের মাত্র অর্ধেক দেওয়া হচ্ছে। আগরওয়াল দাবী করেছেন মৃত্যুর পূর্বেই ডাক্তার চ্যাটার্জি তাঁকে মৌখিক জানিয়ে ছিলেন রাসায়নিক পদার্থটার নাম, তার পরিমাণ। আগরওয়াল বৈজ্ঞানিক নন, তাই সবটা বুঝতে পারেন নি, তা পারলে তিনি এখনই গিয়ে এটার পেটেন্ট নিতেন। যতটুকু তিনি জানেন ততটুকু তিনি সুজাতাকে জানাতেও রাজি আছেন, একটি মাত্র সর্তে। বিনিময়ে সুজাতা যদি ডাঃ চ্যাটার্জির রিসার্চের কাগজগুলো তাঁর হাতে তুলে দেয়। এ আবিষ্কারকে বন্ধ কাইলের অন্ধগুহায় ফেলে রাখলে কারও কোন লাভ নেই। সুজাতার পক্ষে ও রিপোর্ট পড়ে তার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব, বস্তুত সেটা আগরওয়ালের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। এর একমাত্র সমাধান যদি দুজনে যৌথভাবে চেষ্টা করে দেখে। আগরওয়াল ব্যবসার দিকটা দেখবে, সুজাতা দেখবে এ্যাডমিনিস্ট্রেশান, এবং দুজনের অনুমোদিত কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে ঐ দুর্বোধ্য রিসার্চ কাগজগুলোর পাঠোদ্ধার করতে হবে। সেই বিশেষজ্ঞকেও দিতে হবে মোটা অর্থ। তা আগরওয়াল দিতে রাজি আছে। আর তারপর যে কারবার খোলা হবে তাতে সুজাতার থাকবে লাভের অর্ধাংশের অধিকার। বস্তুত লেখাপড়া না হওয়া সত্ত্বেও আগরওয়াল বর্তমানে তাই দিয়ে চলেছেন তাকে।

সুজাতাই বরং এ ব্যবস্থায় রাজি হতে পারেনি। পররাজিও হয়নি। সে ভেবে দেখার সময় চেয়েছে শুধু। সত্যি কথাটা এই যে সে আজও আগরওয়ালকে বিশ্বাস করে উঠ্‌তে পারছে না। সাধারণ বুদ্ধিতে তার মনে হয়েছে এগ্রিমেন্টখানা আগে রেজিষ্ট্রি হওয়া উচিত, তারপর কাগজগুলো সে তুলে দিতে পারে আগরওয়ালের হাতে। এ খেলায় তার হাতে আছে

একটি মাত্র রঙের টেক্কা। ঐ একটা পিঠই তুলতে পারে সে, বিপক্ষ যতই শক্তিমান হকনা কেন। সেই একাগ্নি-বাণ সে অযথ ব্যয় হতে দিতে পারেনা! রঙের টেক্কা আগেই যদি পেড়ে খেলে আর পিঠ তোলার আশা নেই তার! আর সে এন্ট্রি পাবেনা।

বনোয়ারিলাল এসে দাঁড়ায়, বলে, ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন নতুন ড্রাইভারকে কোথায় থাকতে দেওয়া হবে।

: ম্যানেজারবাবু কোথায়?

: নীচে অফিস ঘরে।

: বল, আমি আসছি।

নিচে অফিস ঘরে নেমে এসে দেখে নকুলবাবু তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে কাজ করছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স ভদ্রলোকের। ক্ষীণজীবী চেহারা, মাথার সামনের দিকে টাক। সেই টাক ঢাকবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা তিনি করেন পিছনের লম্বা চুলগুলোকে চিরুনীর উজান টানে সামনের দিকে টেনে এনে। চোখে নিকেলের চশমা। ক্ষুদ্রকায় মানুষটি তাঁর পৌরুষ রক্ষা করতেই বোধকরি একজোড়া বোম্বাই গোঁফ রেখেছেন। সর্বদা গলাবন্ধ কোট পরে থাকেন, তদুপরি গলায় একটি রঙ-বেরঙের বিচিত্র উলের কম্ফর্টার। সুজাতাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। হাত তুলে নমস্কার করেন। এই অতি বিনয় একেবারে সহ্য হয়না সুজাতার; কিন্তু ম্যানেজার নকুল হুই সর্বদাই বিনয়াবনত। প্রতিদিনই সকালবেলা একবার এভাবে হাত তুলে নমস্কার করবেন তিনি।

নকুলবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই ড্রাইভারটা। এও দেখি এক বিনয়ের অবতার। গরুড়পক্ষীর মত হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আর সুজাতা চোখ তুলে তাকায় না তার দিকে। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যাবার সময় নকুলবাবুকে বলে যায়, ওকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছে কি বসেনি লোকটা এসে দাঁড়ায়।

তার দিকে তাকিয়েই সুজাতা একটা ধমক লাগায়, অমন হাত জোড় করে আছ কেন? তুমি কি কোন অপরাধ করেছ?

লোকটা থতমত খেয়ে যায়। কোনক্রমে ঘাড়টা চুলকে বলে, আজ্ঞে না, তা নয়, হাজার হোক আপনারা অন্নদাতা!

কেমন যেন বিশ্রি লাগে সুজাতার।

: বাড়ি কোথায় তোমার ?

: আজ্ঞে হাবড়া, গুমা হাবড়া, আমরা রিফুঃ!

: রিফু ? ও রিফুজি! ও কথা ভুলে যাও। বিশ বছর আগে রিফুজি ছিলে হয়তো, এখন আর ও পরিচয় দিওনা।

: আজ্ঞে না! অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে লোকটা সায় দেয়।

সুজাতা একবার আপাদমস্তক লোকটাকে দেখে নেয়। বেশ সপ্রতিভ সুন্দর চেহারা। বয়সে ওর চেয়ে বছর চার পাঁচের বড়ই হ'বে, অথচ দারিদ্র্যের তাড়নায় মেরুদণ্ড বলে লোকটার আর কিছু নেই।

: কে কে আছেন দেশের বাড়িতে ?

: আজ্ঞে, বাবা আছেন শুধু।

: সব কথায় 'আজ্ঞে' বলছ কেন ?

: আজ্ঞে, আর বলব না!

সুজাতা হেসে ফেলে। বুঝতে পারে এ রোগ ওর শোধরাবার নয়। একে লেখাপড়া শেখেনি, তায় নিম্নবিত্তের ঘরে মানুষ হয়েছে, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ওর মজ্জায় মজ্জায়।

মাইনে পত্র কি পাবে তা কথা হয়েছে আগরওয়ালার সঙ্গে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপাতত পঞ্চাশ করে দেবেন, তবে কাজে খুশি করতে পারলে শীঘ্রই বাড়িয়ে দেবেন। আর বলেছেন খাওয়া থাকা ফ্রি। তাই বনোয়ারিদাকে শুধাচ্ছিলাম, কোথায় থাকব আমি, তা তিনি—

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, বনোয়ারিলাল তোমার দাদা হ'ল কোন সুবাদে ?

: আজ্ঞে কী যে বলেন! উনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, চাকরিতেও সিনিয়র।

: সিনিয়র ? তুমি ইংরাজি জান ? লেখাপড়া কতদূর শিখেছ ?

বিত্ত ড্রাইভার লজ্জা পায়। আবার ঘাড়টা চুলকায়। ঘাড় চুলকানোটা বোধহয় ওর মুদ্রাদোষ। বলে, কী যে বলেন স্যার! পড়াশুনা আবার করলাম কবে, তবে শুনে শুনে দু'একটা সব্দ জেনে ফেলেছি।

সুজাতা এবার আর হাসেনা। লেখাপড়া কতদূর করেছে সেকথা

দ্রাইভার খোলাখুলি জানায় নি, কিন্তু তার লেখায় জানই প্রমাণ করে আগরওয়াল ঠিকই বলেছেন, ডি-এইচ লরেন্স ওর কাছে গ্রীক! আগরওয়ালের অশ্লীল রসিকতাটার মর্মোদ্ধার করার ক্ষমতা কোনকালেই হবেনা বিশ্বনাথ দাসের!

কয়েক সেকেণ্ড সুজাতা জবাব দেয় না। সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটাকে দেখলে মনে হয় ভদ্রঘরের, সুন্দর স্বাস্থ্য, সুগঠিত শরীর—চেহারাও বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল; কিন্তু ওর সব গুণ ঢাকা পড়ে গেছে একটিমাত্র দোষে—দারিদ্র্য। অর্থাভাবেই সে লেখাপড়া শিখতে পারেনি, এবং তারই ফলে চিরদিনের মত ওর মেরুদণ্ডটা বাঁকা হ'য়ে রইল। বনোয়ারিলালের সঙ্গে দাদা-ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে হতভাগা চাকরিটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় আছে।

বনোয়ারিলালকে ডেকে সুজাতা বলে গ্যারেজের উপর যে মেজানাইন ঘরটা আছে সেটা বিশুকে দেখিয়ে দিতে। ওখানেই সে থাকবে। আরও বলে ইন্দির সর্দারকে জানিয়ে দিতে যে বিশু ড্রাইভার এখানেই দু-বেলা খাবে।

বনোয়ারিলাল বিশুকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘর দেখাতে নিয়ে যায়।

সুজাতা কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে থাকে। অফিসে বসাই সার। বস্তুত কোন কাজ নেই তার। দশবারোজন কর্মী এখন ঐ হলো-ব্লক তৈরী করে। তার হিসাবপত্র সুজাতাকে রাখতে দেন না আগরওয়াল। এ বিষয়ে সুজাতারও কোন অনুযোগ নেই। সে জানে রিসার্চ কাগজগুলো যতদিন সে গোপন রাখবে ততদিন আগরওয়ালও তাকে জানতে দেবেন না, কি ভাবে তিনি ওগুলো তৈরী করছেন। সেটাই তো স্বাভাবিক!

বহুবার যেকথা চিন্তা করে কোন কূলকিনারা পায়নি আজও তাই বসে বসে ভাবতে থাকে। সে দিনের পরিস্থিতিটা আর একবার তলিয়ে দেখে। জীমূতবাহনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ওরা এসে আশ্রয়ের সন্ধান করেছিল মহুরকেতন আগরওয়ালের কাছে।

সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আগরওয়াল শুনেছিল নিরুত্তাপ ঔদাসীন-তায়। বলেছিল, আপনি যা বলছেন তার ভিতর আমি যুগান্তকারী সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি; কিন্তু আপনার স্বার্থেই বলুন সবার আগে আপনার উচিত হবে আবিষ্কারটা আপনার নিজের নামে

পেটেন্ট নেওয়া। তার পরেই আইনত সেটার উপর আপনার অধিকার জন্মাবে, এবং তখনই আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তির কথা চিন্তা করতে পারি।

সুজাতা একটু অবাক হয়েছিল। লোকটার কণ্ঠস্বরেই শুধু নয়, তার আন্তরিকতায় কিছুটা মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই সদাশিব বলেছিলেন, কিন্তু মিস্টার আগরওয়াল, সিণ্ডার-ব্লক যে ভাবে আমি জমিয়েছি তাতে বুঝতে পারছি ইটের বিকল্প নয়, এ পরীক্ষা চালিয়ে গেলে আমি সিমেণ্টের বিকল্পও আবিষ্কার করতে পারব। আমার পরীক্ষা শেষ না হলে তো আমি পেটেন্ট নেব না।

আগরওয়াল গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না ডক্টর চ্যাটার্জি। যেটুকু আপনার অধিকারে এসেছে সেটুকুই আপনি পেটেন্ট নিন। হাতের পাখিটাই বনের পাখি জোড়ার চেয়ে বেশী মূল্যবান।

সুজাতা বলে, কিন্তু যেটুকু জেনেছেন সেটুকু যে উনি এখন গোপন রাখতে চান। বাপির ইচ্ছা আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু উনি টাকায় ঠেকে যাচ্ছেন।

: বেশ, তবে তাই হোক। টাকার অভাব যাতে না হয় সেটা আমি দেখব। আমি কিছু অগ্রিম দেব।

: কী সর্তে? প্রশ্ন করেছিল সুজাতা।

: বিনা সর্তে। ডাক্তার সাহেবকে আমি জায়গা দিচ্ছি, বাসস্থান দিচ্ছি, মালমশলা কিনে দিচ্ছি, আগামও দেব। আপনি নিজ অভিরুচি অনুসারে পরীক্ষা চালিয়ে যান, সফল হলে নিজ নামে পেটেন্ট নেবেন। তারপর আমার সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করবেন।

সুজাতা বলে, হ্যাণ্ডনোটে ধার দেবেন?

আগরওয়াল দৃঢ়স্বরে বলেন, না! কোন লেখাপড়া হবেনা। আপনার গবেষণা যেখানে হবে সেখানে আমি নিজেও যাবনা, আমার কোন লোকও তার ত্রিসীমানায় যাবেনা। আপনি সাফল্যলাভ করার পর আমাকে খবর পাঠাবেন। তখন আসব আমি।

তবুও সন্দেহ ঘোচেনা সুজাতার। বলে, এভাবে নিঃস্বার্থ সাহায্য করার অর্থ।

: নিঃস্বার্থ কে বলল ? ব্যবসায় খানিকটা রিস্ক নিতেই হয়। আগরওয়াল ইণ্ডাসট্রিসের পক্ষে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পরীক্ষায় ব্যয় করাটা কিছু নয়। আমি নিশ্চয়ই মনে মনে আশা করছি সাফল্যলাভ করলে ডক্টর চ্যাটার্জি আমার সঙ্গেই সর্বপ্রথম চুক্তিবদ্ধ হতে চাইবেন। আমার সঙ্গে টার্মসে না বনলে তিনি স্বচ্ছন্দে অন্যত্র কথাবার্তা বলতে পারবেন।

এর পরেও সুজাতা বলেছিল একেবারে বিনা গ্যারান্টিতে এমনভাবে অর্থ বিনিয়োগ করতে কোনও ব্যবসায়ী রাজি হতে পারেন, তা ভাবিনি।

আগরওয়াল হেসে বলেছিল, ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে আপনার ধারনাটা খুব উঁচু নয় দেখছি।

শুধু সদাশিব নয়, সুজাতাও এরপর নিশ্চিন্ত মনে খুশি হয়ে উঠতে পেরেছিল।

আগরওয়াল ওদের দুজনকে এনে তুলেছিল এই কারখানায়। নিজের গাড়ি করে। সদাশিব পরদিন থেকেই কাজে নেমে গিয়েছিলেন। তাঁর আদেশ মত এল বেঁস বা সিণ্ডার, বালি আরও কত কি রাসায়নিক পদার্থ। আগরওয়ালের নির্দেশে এল ইন্দির সর্দার তার মাদ্রাজীকুলির দল বল নিয়ে, তাঁরই নির্দেশে কারখানার ঐ অংশটা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। সিমেণ্ট আর লোহার কারবারে যারা কাজ করত তাদের সরিয়ে আনা হল এপারে।

একেবারে নিশ্চিন্তে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। আগরওয়াল তাঁর জন্য একটি ছোট ফিয়াট গাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সদাশিব নিজেই ড্রাইভ করতেন সেটা। এখানে ওখানে যেতেন, কখনও মেয়েকে নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণেও। সুজাতা সংসারের দিকটা দেখত। রান্না করার ভার পড়ল ইন্দিরের উপর, লোকটা পাকা রাঁধুনি। ঘরের কাজ কর্ম করত বনোয়ারি। বস্তুত সদাশিবকে স্বচ্ছন্দভাবে পরীক্ষা চালিয়ে যাবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন ময়ূরকেতন।

এবং সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন সদাশিব। তিন দশকের ভিতরেই তিনি আগরওয়ালকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে তাঁর সিণ্ডার-ব্লকের পরীক্ষা সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করেছে। শতকরা পঞ্চাশভাগ সিমেণ্ট ব্যবহার করেও তাঁর সেই 'চ্যাটার্জি-ব্লক' ইটের চেয়ে বেশী ভারসহ, সস্তা অথচ হাল্কা হয়েছে। সেদিনকার কথা সুজাতা কোনদিন ভুলতে পারবে না।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সেদিন যেন শিশুর মত খুশীয়াল হয়ে উঠেছিলেন। এত খুশী হতে সে কখনও দেখেনি বাপিকে।

সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র আগরওয়াল এসে হাজির হলেন। একা নয়, সঙ্গে এলেন তাঁর একজন নিকট আত্মীয়, দীপচাঁদ আগরওয়াল—ময়ূরকেতনের ভাইপো। আগরওয়াল ইণ্ডাষ্ট্রিসের বোম্বাইয়ের চীফ কেমিস্ট। এ্যাপ্লায়েড কেমিষ্ট্রিতে এম. এস্‌সি পাশ করেছে সে।

ময়ূরকেতন খুব খুশী হয়েছেন, এ কথা নিঃসন্দেহ; কিন্তু বাহ্যত তিনি সেরকম কোন উচ্ছ্বাস দেখালেন না। প্রথামাফিক অভিনন্দন জানিয়ে ডাঃ চ্যাটার্জিকে বলেন, আমি নিশ্চিত জানতাম আপনি সাফল্যলাভ করবেনই, তাই আমার ভাইপোকেও নিয়ে এসেছি, দীপচাঁদ আগরওয়াল, আর ইনিই সেই বিখ্যাত আবিষ্কারক ডাঃ সদাশিব চ্যাটার্জি। ইনি মিস্ সুজাতা!

দীপচাঁদ করমর্দন করেন না, যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করে।

কথা হচ্ছিল নিচের অফিস ঘরে। সুজাতা বলে ওঠে, এবার কি ভাবে এটাকে বাস্তবরূপ দেওয়া যায় বলুন।

আগরওয়াল একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করছিলেন, বলেন, সেইজন্যই দীপুকে নিয়ে এসেছি। আমরা তো ওসব বুঝব না, ও এ্যাপ্লায়েড কেমিষ্ট্রির লোক, ইতিপূর্বে আমাদের বোম্বে ফ্যাকটারিটা ইনস্টল করেছে। ও ওসব জানে। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে এটা তৈরী করার আগে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ফ্লোট করতে হয়—

সুজাতাই আবার বলে—আপনি তার একটা খসড়া করুন।

বাধা দিতে ময়ূরকেতন বলে ওঠে—না সুজাতা দেবী! এখনও তার সময় হয়নি। আমাদের আর একটি প্রধান কর্তব্য বাকি রয়েছে। আমি সেকথা আগেও বলেছি, আপনারা ভুলে গেছেন। যতক্ষণ না ডক্টর চ্যাটার্জি এ আবিষ্কারের পেটেন্ট নিজের নামে নিচ্ছেন ততক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাই না। সুতরাং সেটাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। পেটেন্ট নিতে হলে যেসব কাগজপত্র, প্রোফর্মা ভর্তি করতে হবে সে সব কাগজও আমি নিয়ে এসেছি। আপনি আগে সেগুলো ফিল-আপ করুন। আমার টাইপিস্টকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

সদাশিব বলেন, টাইপিস্ট লাগবে না, একটা মেশিন পেলেই হবে। আমি নিজেই টাইপ করে নেব।

—সে তো আরও ভাল কথা।

দীপঙ্কর বলে ওঠে—ডক্টর চ্যাটার্জি আপনার আবিষ্কারের মূল সিক্রেটটুকু বাদ দিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যদি কিছু বুঝিয়ে বলেন—

এর চেয়ে আনন্দদায়ক কাজ সদাশিবের কাছে আর কিছু নেই। উনি তখনই সবিস্তারে বলতে থাকেন তাঁর আবিষ্কারের কথা—

এদেশে বাড়ি তৈরীর কাজে ইট একটা অনিবার্য উপাদান। ইটের বিকল্প হিসাবে সিণ্ডার-ব্লক বহুদিন অবশ্য বাজারে চলছে। কিন্তু সিণ্ডার ব্লকের খরচ ইটের সমান সমান হওয়ায় ইটের বিকল্প হিসাবে সে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। এই সিণ্ডার-ব্লকগুলির ভিতরটা ফাঁপা। ফলে এর ওজন ইটের চেয়ে কম। এগুলি সিণ্ডার বা ঘেঁসের সঙ্গে সিমেণ্ট মিশিয়ে তৈরী করা হয়। ছাঁচে ঢালাই করে দু'খানি অর্ধেক ফাঁপা ব্লক আবার ঐ সিমেণ্টের সাহায্যেই জোড়া লাগানো হয়। গোটা ব্লকটার ভিতরটা থাকে ফাঁপা, তাই এর অপর নাম হলো-ব্লক। প্রকৃতপক্ষে সিণ্ডার-ব্লক তৈরীর কাজে সিমেণ্টই একমাত্র মূল্যবান উপাদান। যেখানে বালি সস্তা এবং সিণ্ডার বা ঘেঁষ কোন কারখানার অপ্রয়োজনীয় বাই প্রডাক্ট হিসাবে বস্তুত বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এই ধরনের সিণ্ডারকে তৈরীর অর্ধেকের উপর খরচ পড়ে সিমেণ্ট বাবদ। সদাশিব এমন একটি ক্যাটালিস্ট আবিষ্কার করেছেন যার উপস্থিতিতে অন্য একটি অত্যন্ত সহজলভ্য মশলার মাধ্যমে সিমেণ্ট ব্যতিরেকেই ঐ দুটি আধখানা ব্লককে জমিয়ে দিতে পারছেন। মনে করুন এই দ্বিতীয় উপাদানটা স্রেফ গঙ্গামাটি। এখন সদাশিব এমন একটি ক্যাটালিটিক-এজেন্টের সন্ধান পেয়েছেন যার উপস্থিতিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ায় ঐ গঙ্গামাটিই সিমেণ্টের মত জোড় লাগাতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে সিণ্ডার-ব্লকের নির্মাণব্যয় বহুলাংশে কমে যাচ্ছে। সদাশিবের হিসাবমত এতে গৃহনির্মাণের খরচ প্রায় টাকায় দু'আনা কমে যাবে।

দীপঙ্কর বলে, টাকায় মাত্র দুআনা ?

সদাশিব যেন বেদনাহত হয়ে পড়েন, বলেন, এটা কি বলছেন আপনি ? টাকায় দু'আনা কম হল ? তার মানে সাড়ে বারো পারসেণ্ট। যদি ধরা যায় পশ্চিম বাঙলায় সারা বছরে যত ইটের গাঁথনির কাজ হচ্ছে তার মূল্যমান আট কোটি টাকা, তাহলে, একমাত্র বাঙলা দেশেই এ জন্য এক কোটি টাকার জাতীয় সঞ্চয় হতে পারে। সারা ভারতবর্ষের স্ট্যাটিস্টিক্স ধরলে—

দীপচাঁদ বাধা দিয়ে বলে, দাদা ভারতবর্ষে যেখানে যত ইটের গাঁথনি হচ্ছে তার সবই তো আমরা আমাদের এই চ্যাটার্জি-ব্লক দিয়ে রিপ্লেস করতে পারব না—

: কারেক্ট! ভেরি কারেক্ট! খুব ন্যায্য কথা! সেজন্য অতটা আমরা হিসাবে ধরব না। বস্তুত প্রথমাবস্থায় গোটা বাঙলা দেশের কথাও আমরা বাদ দেব। আমি বরং বলব যদি বৃহত্তর কোলকাতায়—

আগরওয়াল ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ওদের কথায় আপনি কান দেবেন না ডঃ চ্যাটার্জি। ওরা কী জানে? কী বোঝে? কেমিষ্ট্রি জানে, তা নিয়ে কথা বলুক, ব্যবসায়ের ওরা কী বুঝবে? আপনি আমার কথার জবাব দিন। আপনি বলছিলেন, আপনার হলো-ব্লক ইটের চেয়ে হাল্‌কা হবে। অথচ ভারবাহী ক্ষমতা হবে বেশী। সেক্ষেত্রে ডেড ওয়েট কমে যাওয়ায় আপনার চ্যাটার্জি-ব্লক ব্যবহার করলে প্রতিটি বাড়ির বনিয়াদ কম লাগবে, বীম, কলাম স্ল্যাব সবেরই মাপ কমে যাবে। প্রচুর পরিমাণে সিমেন্ট ও লোহা বাঁচবে। নয় কি?

: নিশ্চয়ই!

: আপনার টাকায় দু'আনা হিসাবে কি সেটাও ধরেছেন?

একেবারে লাফিয়ে ওঠেন বৈজ্ঞানিক, আপনি ঠিকই ধরেছেন! সেই কথাই বলতে চাইছিলাম আমি। সে সব এখনও আমি হিসাবে ধরিনি। ইটের দাম ইস্ টু ব্লকের দাম ধরেই সাড়ে বারো পার্সেন্ট বলেছি আমি। সেসব ধরলে, জাস্ট এ মিনিট, এখনই একটা স্ট্যাণ্ডার্ড তিনতলা বাড়ি ধরে এস্টিমেট করে দেখি। কিন্তু তিনতলাই বা কেন ফ্রেমড স্ট্রাকচার মাল্টি স্টোরিড বাড়িতে বোধহয় আরও—

সদাশিব উঠে পড়েছিলেন চেয়ার ছেড়ে। ময়ূরকেতনই তাঁকে আবার হাত ধরে বসিয়ে দেন। বলেন, সে হিসাব করতে যথেষ্ট সময় লাগবে আপনার। তাছাড়া ওকাজ আপনার নয়। আমরা মাইনে করা এঞ্জিনিয়ার দিয়ে সেসব হিসাব করাব। আপনার প্রধান এবং একমাত্র কাজ হচ্ছে স্থির মস্তিষ্কে আপনার আবিষ্কারটা লিখে ফেলা। সেটা কি শুধু আপনার মগজের মধ্যেই আছে; না কাগজ পত্রে কিছু কিছু লিখে রেখেছেন?

সদাশিব হেসে বলেন, কিছু কিছু অবশ্য জট্ করা আছে। তবে আমি ছাড়া আর কেউ তার পাঠোদ্ধার করতে পারবেনা। যাঃ, আপনি

ঠিকই বলেছেন। সর্বপ্রথমে একটা রিপোর্ট লিখে ফেলতে হবে। বিস্তারিত রিপোর্ট।

: শুধু রিপোর্ট নয়, ঐ সঙ্গে আপনার ফর্মূলাটা। কি কি উপাদান দিচ্ছেন, কি প্রপোর্সান, কি ক্যাটালিস্ট, কত টেম্পারেচারে—

: জানি, জানি মশাই! সায়েনটিফিক রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় তা আমাকে শেখাতে আসবেন না। আমি জার্মানিতে রিসার্চ প্রফেসার ছিলাম। আপনি এখনই একটা টাইপরাইটার পাঠিয়ে দিন, কিছু কার্বন আর কয়েক দিস্তে কাগজ। আর হ্যাঁ, খানকতক গ্রাফ পেপার।

: কত সময় লাগবে আপনার?

: আজ রাত্রের মধ্যেই তৈরী হয়ে যাবে। কাল সকালেই আপনার গাড়িতে আমরা ক'লকাতা যাব। পেটেন্টটা সবার আগে নিতে হবে, তারপর গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসব এখানে, কি বলিস সু?

গঙ্গাস্নান! হ্যাঁ হঠাৎ গঙ্গাস্নানের কথাই বলেছিলেন বিলেত ফেরত বিলাতী-কেতার মানুষটি! তা সেই গঙ্গাস্নান তার পরের দিন ঠিকই করেছিলেন সদাশিব চট্টোপাধ্যায়। পেটেন্টটা অবশ্য নেওয়া হয়নি!

আশ্চর্য ঘটনা পরম্পরা!

সমস্ত রাত্রি ধরে আলো জেলে কাজ করে ছিলেন সদাশিব। পরদিনই অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সেরিব্র্যাল থম্বোসিস বলেই অনুমান করেছিলেন স্থানীয় ডাক্তার সান্যাল। ছাব্বিশ ঘন্টা বেঁচে ছিলেন তারপর। আগরওয়াল চেষ্টার ত্রুটি করেনি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

গঙ্গাতীরের শ্মশানে শেষ হয়ে গেল সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কারের স্বপ্ন!

॥ নয় ॥

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় জাহাঙ্গীর হোটেলের টু'শ' এগারো নম্বর স্যুইটে টেলিফোনটা বেজে উঠল। আগরওয়াল প্রস্তুত হয়েই ছিল, রিসিভারটা তুলে নিতেই শুনতে পেল রিসেপ্‌শনিস্টের মিহি কণ্ঠ : আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন ; নাম বলছেন না—বলছেন, এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করাই আছে !

—ফ্রেঞ্চকাট দাড়িআলা ভদ্রলোক ?

—ইয়েস, উইথ এ্যান এ্যাম্বিসাস্‌ পেয়ার অব্‌ মৌস্টাসেস্‌ ইন টু দি বারগেন।

—সেণ্ড হিম আপ্‌, ডার্লিং !

এ হোটেলের ঐ সুন্দরী এ্যাংলো রিসেপ্‌শনিস্টের সঙ্গে আগরওয়ালের একটি হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে। হয়তো সেই কারণেই কলকাতার আর পাঁচটা খানদানি হোটেলের ভিতর এইখানেই তার স্থায়ী আস্তানা। জাহাঙ্গীর হোটেলের এই টু'শ' এগারো নম্বর স্যুইটটা তাঁর মাসিক হিসাবে ভাড়া নেওয়া। এ ঘরের চার দেওয়ালের যদি শ্রবণশক্তি থাকত তাহলে অনেক রোমাঞ্চকর সংবাদ সে শোনাতে পারত জগতকে। আগরওয়ালের সঙ্গে এ ঘরের ঐ শয্যায় সে অনেক অভিসারিকাকেই শুতে দেখেছে ; এবং গৃহস্বামীর ব্যবস্থাপনায় শহরের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিকেও ঐ ভাবে এখানে ক্ষণিক সুখের সন্ধানে অভিসারী হতে দেখেছে। দেখেছে বড় বড় অর্ডার আর পারমিটের হাত-ফের, দেখেছে অনেক কালো টাকার লেন দেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর হোটেলের ঐ টু'শ এগারো নম্বর স্যুইটের দেওয়ালের কান নেই। গোপন খবরগুলো প্লাসটিকে ইমালশান পেইণ্ট্‌স্‌-এ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে শুধু।

নক্‌ করতে হলনা ডক্টর আলিকে। দ্বার খুলেই রেখেছিল আগরওয়াল।

: মর্নিং ডক্টর ! বি সীটেড প্লীজ !

ডাক্তার আলি ফোলিও ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে এলিয়ে পড়েন একটা কৌচে, তিনকোনা একটা ভালভোপিলো কুশন টেনে নিয়ে আরাম

করে বলেন। ফ্রিজ খুলে আগরওয়াল বার করে আনে স্কচ, সোডা আর পানপাত্র। টানা ড্রয়ার থেকে উদ্ধার করে আনে এক প্লেট লবণাক্ত কাজুবাদাম। উভয়েই পানপাত্র তুলে নিয়ে প্রথামাফিক গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে বলেন—চিয়ার্স।

আয়াম করে বসলেও আলিসাহেব মুখে একটা ব্যস্ততার ভাব বজায় রেখেছিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বলেন—মিস্টার আগরওয়াল, আজকের এ এ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনি করেছেন। আমার সময় অল্প। একটার সময় আমার জরুরী পার্টি মিটিং আছে। তার আগে একবার রাইটার্স বিল্ডিংস্ যেতে হবে। আমি আধঘণ্টা সময় আপনাকে দিতে পারি। নিন শুরু করুন।

ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে আগরওয়ালের। পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে যায়। ধীরে সুস্থে পকেট থেকে একটা সিগার-কেস বার করে তিনি মোটা একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে বলেন, আয়াম সো সরি ডক্টর আলি। আমি ভুলে গিয়াছিলাম আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। আমি ভেবেছিলাম আজকের এ আলোচনার ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনার আগ্রহটাই বেশী। গতকাল টেলিফোনে কথা বলার সময় ঐ রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা আমার হয়েছিল। কী আপসোসের কথা! যাক আমাদের দুজনেরই ভুল হয়েছে, এবং সেটা আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছি। আপনি কাজের মানুষ, বেশীক্ষণ আপনাকে আটকাবো না। পাত্রটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বরং আজকের আবহাওয়ার কথাটা আলোচনা করতে পারি, কি বলেন?

ডক্টর আলিও একটি চুরুট তুলে নেন, মৃদু হেসে বলেন দর বাড়াচ্ছেন?

: দর! তোবা, তোবা! কী যে বলেন! আমার আবার বাজার দর আছে নাকি?

: আছে! ইলেকশানের বাজারে প্রতিটি ভোটারেরই একটা বাজার দর থাকে। আপনার দরটা অবশ্য ভোটার হিসাবে নয়, ভোট ব্যবসায়ের হোলসেল ডিলার হিসাবে।

যেন খুশী হয়ে উঠলেন আগরওয়াল, বলেন খুব নতুন কথা শোনালেন বা হুঁক। তা নিজের বাজার দরটা আগে জেনে নিই, তারপর দরদামে নামব। কি দামে বর্তমানে বিকোচ্ছি আমি?

আলি সাহেবও হেসে বলেন, আমার নির্বাচন এলাকায় মনুরকেওম আগরওয়ালের বর্তমান বাজারদর 'সাত পয়জার'। তা কিনবার আমার সামর্থ্য

নেই, সে হয় যাচাই করতেও আসিনি আমি; তবে আপনার মৌল প্রশ্নটার জবাবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আজকের এ আলোচনার জন্ত আমরা দুজনেই সমান আগ্রহান্বিত ছিলাম।

: কিন্তু সেটাও তো মৌল প্রশ্ন নয় আলি-সাহেব, মৌল প্রশ্ন হচ্ছে আপনার সময়ের অভাব। আপনার হাতে যে সময় মাত্র আধঘন্টা!

: বেশ তো, আপনি শুরু করুন—না হয় পরবর্তী এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো পেছিয়ে দেওয়া যাবে। এটাও তো গুরুতর কাজ! এখন বলুন, কী শর্তে আপনি আমাকে সাপোর্ট করতে রাজি হবেন।

: বেশ, শুরু করছি। প্রথমেই আমি বলে রাখতে চাই, নীতিগতভাবে আমি আপনাকে সাপোর্ট করিনা, করব না। আমি প্রলিটারিয়েট দলভুক্ত নই;—আপনাদের এ সব ধর্মঘট, বিক্ষোভ আর ঘেরাও-এর থিয়োরিতে আমার সহানুভূতি তো নেইই, একটা বকারজনক বিবমিষা আছে। এই হাইপথেসিস্‌টা মেনে নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিন্তু—

বাধা দিয়ে ডক্টর আলি বলে ওঠেন, কিন্তু এই হাইপথেসিস মেনে নিলে আপনার সঙ্গে আমার এ আলোচনার তো কোন অর্থ ই হয় না। আমাদের শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার ম্যানিফেস্টো যদি আপনি না মেনে নেন—

ঠক্‌ করে গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে আগরওয়াল বলেন—প্লীজ ডক্টর আলি! এখানে আপনার জনগণও নেই, প্রেস রিপোর্টাররাও নেই। নেহাৎ আপনি আর আমি। ও সব কেতাবী বুকনি এখানে ঝাড়বেন না। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা! মাই ফুট!

হঠাৎ মুখটা লাল হয়ে ওঠে আলি সাহেবের। তিনিও সমান জোরে ঠক্‌ করে নামিয়ে রাখেন মদের পাত্রটা, বলেন, হোয়াট ড্যু য়্যু মীন! আমার ক্রীড নিয়ে এমন ভাষা ব্যবহার করার মানে?

: কী আশ্চর্য! আপনি কি মুখোসটা খুলে রেখে আলোচনা করবেন না! কিসের ক্রীড বলছেন? আপনি কি প্রলিটারিয়েট দলের প্রতিভূ? আপনি বছরে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ইনকামট্যাক্স দেন এ খবর কে না জানে? শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে আপনার নিজের কি হাল হয় তা কি ভেবে দেখেছেন? ভারতবর্ষের প্রতিটি জনগণের গড় আয়ের সঙ্গে আপনার রোজগারের কি সম্পর্ক তা কি খতিয়ে দেখেছেন কোনদিন? সুতরাং আপনাকে মেনে নিতেই হবে যে ক্রীড হিসাবে নয়, পলিসি হিসাবে আপনাকে আজ ঐ

বিপক্ষ শিবিরে মাথা বিকোতে হয়েছে। আসলে আপনার ধমনীতেও বইছে আমার মত নীল বুর্জোয়া রক্ত! না, না, আপনি উত্তেজিত হবেন না, এ সোজা কথাটা মেনে না নিলে এ আলোচনার কোন অর্থই হয় না। একটু ভেবে দেখুন না আপনি আজ ক্যাপিটালিস্ট ময়ূরকেতন আগরওয়ালের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করতে জাহাজীর হোটেলে হাজির হয়েছেন, এ কি আপনার শোষণ-হীন সমাজ ব্যবস্থার জীতের জন্য? না কি ইলেকশন জেতার জন্য?

: আপনি কি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন কতকগুলো কটু কথা শোনাবেন বলে?

: দুর্ভাগ্য আমার! কথাটা আপনাকে বোঝাতে পারছি না। এগুলো মোটেই কটু কথা নয় আলী-সাহেব, এগুলো নির্ভেজাল সত্য কথা। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এগুলো কটু কথা হত, অপমানকর কথা হত। কিন্তু এঘরের মধ্যে আমরা একেবারে খোলাখুলি কথা বলব বলেই তো এসেছি! প্যান্টের ভেতর কে আর ন্যাংটো নয় মশাই? শাক দিয়ে যে লোকটার কাছে মাছ ঢাকা দিতে চাইছেন সেই পরম বৈষ্ণব যে নিজেই মালপোয়া দিয়ে মুর্গীর ঠ্যাং ঢাকা দিচ্ছে! আর নেহাৎ যদি আপনার মনে হয় আপনাকে কটু কথা বলেছি, তাহলে আপনিও বলুন—ওহে আগরওয়াল, তুমি একটি বুর্জোয়া কুল-কলঙ্ক! তুমি তলে তলে হাত মেলাতে চাইছ বুর্জোয়া বিরোধী প্রলিটারিয়েট দলের সঙ্গে! আমি রাগ করব না। হেসে বলব, আমি যে কলঙ্কিনী রাই গো!

ইতিমধ্যে দুপাত্র রঙিন পানীয় আলি সাহেবের উদরজাত হওয়ায় তাঁর বুদ্ধি খুলেছে দেখা গেল। হে হে করে খানিক হেসে নিয়ে বলেন, অলরাইট অলরাইট!

আগরওয়াল বলে, তাশ যখন আমরা দুজনের কেউই লুকাবো না স্থির হল তখন খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। তাতে সময়ও সংক্ষেপ হবে। যে কথা বলছিলাম, আমার ধমনীতে নির্ভেজাল নীল রক্ত, তাই আমি আপনাদের ঐ লালসেলামে বিশ্বাস নেই। তবু আপনাকে এ নির্বাচনে গোপনে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিনিময়ে আপনি কি দিতে পারেন বলুন?

: আপনি কি চান, তাই আগে শুনি।

: তিনটি জিনিস চাই। এক নম্বর, কথা দিন, আপনারা যদি গদি পান তাহলে আমার পিছনে লাগবেন না; দু-নম্বর গদি পান না পান, আমার আগারওয়াল কেমিক্যালস্‌ ফ্যাক্টারির ইউনিয়ান যে সতের দফা দাবী দিয়েছে

সেটা তুলে নেবেন এবং তিন নম্বর যদি পান না পান, গণেশদত্তকে আমার এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

একটু ভেবে নিয়ে আলি সাহেব বলেন, আপনার প্রথম দুটি সর্ত হয়তো মেনে নেওয়া চলতে পারে কিন্তু তৃতীয় সর্তটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। গণেশ ঐ এলাকার অবিসংবাদিত শ্রমিক নেতা।

: পার্টি ইচ্ছা করলেই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে অন্য কোন ভাগ্যবানের স্বর্ণলঙ্কায় আগুন জ্বালাতে পাঠাতে পারে।

: লঙ্কাকাণ্ড করা গণেশের কাজ নয় মিঃ আগরওয়াল! সে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করে।

: সে কথা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না আলি সাহেব! আপনি বিধর্মী, আপনার চেয়ে রামায়ণ আমার ভাল করে পড়া আছে। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব এখনও ত্রিসন্ধ্যা তুলসীদাসজী পাঠ করে থাকেন। আমি নিশ্চিত জানি, ও বেটা গণেশ নয়, ও হল খোদ বজরঙবলী! গণেশ হলে তার অমর্যাদা আমার হাতে হত না, মাথায় করে রাখতাম যতদিন না উল্টে যায়, কিন্তু—

বাধা দিয়ে আলি বলেন, রসিকতা থাক, কিন্তু পার্টি ওর মত একজন যোগ্য শ্রমিক নেতাকে হঠাৎ তার কর্মক্ষেত্র থেকে সরাতে রাজি হবে কেন বলুন?

: কারণ, আমি আপনাকে নির্বাচনে সাহায্য করছি। আয়াম নট্ ব্র্যাগিং, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি আমার কন্সটিটুয়েন্সিতে আপনাকে জিতিয়ে দিতে পারি, আবার মহাপাত্রকেও জিতিয়ে দিতে পারি। এ্যাসেম্ব্লির একটা সীট বস্তুত নির্ভর করছে আমার নমিনেশনে! সাত পয়জার না হলেও একটা পয়জার আমাকে তো দেবেন?

: আপনি ডবল্-ক্রশিং করবেন না তার গ্যারান্টি কি?

: এটা কি ছেলে মানুষের মত কথা বললেন ডক্টর আলি? আমি তো সবাই আগেই আমার ট্রাম্প কার্ড পেড়ে লীড দিচ্ছি। আমি তো আগেই আপনাকে জিতিয়ে দিচ্ছি! আপনিই বরং পরে এই নির্জন ঘরে দেওয়া মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারেন।

আলি সাহেব হেসে বলেন, ধরুন তাই যদি করি?

আগরওয়ালও হাসে, বলে, মনুরকেতন আগরওয়ালকে আপনি চেনেন, এটাই আমার গ্যারান্টি! শুধু এ্যাসেম্ব্লির মেম্বার নয়, তার চেয়ে উচ্চতর কোন

গদিতে বসেও কেউ যদি ময়ূরকেতনের সঙ্গে ডব্‌ল্‌ ক্রসিং করে তার কি হাল হবে তা আপনি আন্দাজ করতে পারেন, এটাই আমার ভরসা!

: আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

শত্রুকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দেব এত বড় মূর্খ আমি নই। সুতরাং ভয় আপনাকে ভয় দেখাচ্ছিনা, নয় শত্রু বলে আপনাকে আমি মনে করি না।

আবার একপাত্র ঢেলে নিয়ে আলি সাহেব বলেন, একটা কথা। হঠাৎ আপনি মহাপাত্রকে ছেড়ে এভাবে আমাকে কেন সাহায্য করতে চাইছেন, তা বলবেন?

: আলবৎ! আজ তো দুজনেই খোলাখুলি কথা বলব স্থির হয়েছে। আমি বরাবর মহাপাত্রকে সাপোর্ট করছি, তাঁর সাপোর্টও পেয়েছি। এবারও তাঁকে জিতিয়ে দেবার ক্ষমতা আমি রাখি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়েছে মহাপাত্র জিতলেও এবার ওঁরা মেজরিটি হতে পারবেন না, সরকার গঠন করবেন আপনারা। তাই ঝড়ের আগেই আমি নৌকা সামলাচ্ছি। সোজা কথা!

: বুঝলাম। তাহলে আমাকে খোলাখুলি সাপোর্ট করছেন না কেন?

: কারণ আপনারাই যে মেজরিটি হবেন এটা আমি নিশ্চিত জানিনা। কোয়ালিশান মন্ত্রীত্ব হতে পারে। যে আলিসাহেব আজ শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য কুম্ভীরাশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না এবং মহাপাত্রকে বুর্জোয়া দলভুক্ত মনে করছেন, সেদিন হয়তো দেখব তিনিই রাজ্যপালের কাছে আর দশজনের সঙ্গে মিলিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন ও-কোর্টে গিয়ে খেলবার জন্য!

: কী যা তা বলছেন আপনি!

: যা তা কথা নয় আলিসাহেব, যথার্থ কথা। অমন চমকে ওঠারও কিছু নেই, লজ্জা পাবারও কিছু নেই। এ খেলা আগেও অনেকে খেলেছেন, প্রয়োজন বোধে আপনিও খেলবেন। সে অধিকার পবিত্র সংবিধান আপনাকে দিয়েছে! ভয় নেই। ফলে আমাকেও দু নৌকায় পা-দিয়ে চলতে হচ্ছে।

: কিন্তু আমি কেমন করে বুঝব যে আপনি সত্যিই আমাকে সাপোর্ট করলেন? তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাব কি করে?

: কিছু কিছু প্রমাণ আপনি এখনই পাবেন। বাকিটা জানবেন ব্যালট বাক্স খোলা হলে। আপনি রিটার্নড না হলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন দায় আপনার থাকবেনা—

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আলি সাহেব বলেন—মনে থাকবে? আপনি এইমাত্র যা বললেন, তার অর্থ হল আমি রিটানর্ড না হয়েও যদি আমরা সরকার গঠন করি তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি রাখার কোন দায় থাকবে না! আপনি গোপনে সাপোর্ট করলেও!

আগরওয়াল হেসে বলেন, আই সে হোয়াট আই মীন, এ্যাণ্ড আই মীন, হোয়াট আই সে! হ্যাঁ, মনে থাকবে! তাই বলেছি আমি।

: আই এ্যাকসেপ্ট! —হাতটা বাড়িয়ে দেন আলি সাহেব।

হাতটা গ্রহণ করে আগরওয়াল বলেন সাবজেক্ট টু ওয়ান কণ্ডিসান্!

হাতটা টেনে নিয়ে আলি বলেন, আবার কি সর্ত?

: কিছু মনে করবেন না আলি সাহেব। যে পার্টির নির্দেশে গণেশকে সরানো সম্ভবপর আপনি সে পার্টির লোক নন। নির্বাচনী আঁতাতে তাদের দলভুক্ত হয়েছেন মাত্র। পার্টির তরফে প্রতিশ্রুতি দেবার অধিকার আপনার নেই। আপনাদের দলপতিকেও এ ভাবে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আমাকে। সে কথা এ ঘরেও হতে পারে, তাঁর ওখানেও আমি যেতে পারি। আপনাদের যা অভিরুচি।

আলি বলেন, এই কথা? তাঁর সঙ্গে কথা বলেই আমি এসেছি আপনার কাছে। আমি এখনই টেলিফোনে আপনার সঙ্গে তাঁর কথা বলিয়ে দিচ্ছি।

হাতটা তিনি বাড়িয়ে দেন টেলিফোনটার দিকে। তাঁর হাতখানা চেপে ধরে আগরওয়াল বলেন, অত উত্তেজিত হবেন না আলিসাহেব। এখান থেকে টেলিফোন করা চলবেনা। এটা খানদানী হোটেল। প্রতিটি কলের নাম্বার একটা লেজারে তোলা থাকে। এ স্যুইট আমার নামে পার্মানেন্টলি বুক করা। আর যে নম্বরটা আপনি ডায়াল করতে যাচ্ছেন সেটা বড় মার্কা মারা। এখান থেকে নয়।

: আপনার যেমন অভিরুচি। বেশ, আমি এখনই আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। চলুন।

: চলুন।

উঠে পড়েন আগরওয়াল। ওয়াড্রোব থেকে টাইটা বার করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় দড়ি দিতে দিতে বলেন, ভাল কথা, শনিবার বিকালে কাছারী ময়দানে আপনাদের ইলেকসান মিটিং আছে না?

: হ্যাঁ আছে, কেন-বলুন তো?

: কটায় মিটিং ?

: বিকাল চারটের।

: ওটা পিছিয়ে দিন। না, না, তারিখ ঠিকই আছে। সময়টা পিছিয়ে দিন শুধু। মিটিং শুরু করুন সাড়ে পাঁচটায়। আর সাজেসানটা যে আমার সেটা দয়া করে ভুলে যান।

: কেন বলুন তো ? কি ব্যাপার ?

: বিকাল সওয়া চারটে থেকে কাছারী মাঠের উল্টোদিকে কলেজ মাঠে ফাইনাল খেলা হবে। আপনার মিটিং ভেঙে লোক খেলা দেখতে ছুটে আসবে তার চেয়ে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মিটিংটা শুরু করুন। খেলা ভেঙে গেলে লোকগুলো যখন মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ঠিক তখনই যদি মাইকে আপনাদের স্লোগান-মিউসিক ককটেল বাজতে থাকে তাহলে অকর্মা মানুষগুলো সুড় সুড় করে ঢুকে পড়বে কাছারী মাঠে।

আলিসাহেব বলেন, স্লোগান-মিউজিক-ককটেল মানে ?

আগরওয়ালের টাই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঙার থেকে কোটটা নিয়ে গায়ে চড়াতে চড়াতে ঘুরে দাঁড়ান, বলেন, মশাই আমি রাজনীতি করিনা, ও বস্তুটাকে আপনাদের পলিটিক্সের পরিভাষায় কী নামে অভিহিত করা হয় আমি জানি না। কিন্তু যেখানেই নির্বাচনী মিটিঙ হয়, দেখি মাইকে হিন্দিগান এবং সমবেত কণ্ঠে স্লোগান পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। গানগুলি এক ঢঙের, শুধু স্লোগান শুনে বুঝতে পারি কারা চিল্লাচ্ছেন। এক পক্ষের বাঁধা গৎ 'নইলে গদি ছাড়তে হবে—মারে লাপ্পা লা' অপর পক্ষের অনুষ্ঠানসূচী-'চীনের দালাল নিপাত যাক হিপি-হিপি ইয়া-ইয়া-ইয়া।' আপনারা একে কী নামে অভিহিত করেন জানিনা, আমরা মানে নীলরঙের বুর্জোয়া কুল এর নাম দিয়েছি স্লোগান-মিউসিক-ককটেল !

পবিত্র ক্রীস্তের প্রতি অসম্মানসূচক কথা বলায় আলি সাহেব যতটা বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন পবিত্র স্লোগানের প্রতি এই রসিকতায় কিন্তু ততটা মর্মাহত হলেন না। তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন, বলেন, বেশ আছেন মশাই আপনারা !

বোধকরি ইতিমধ্যে বেঁটে বোতলটা শূন্যগর্ভ হয়ে গিয়েছিল বলেই তাঁর এ বদান্যতা।

ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে আসছিলেন আগরওয়াল হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা। সেটা তুলে নিয়ে আগরওয়াল ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর কয়েক মুহূর্ত

শুনে নিয়ে বললেন, য়ু মে বি অফ্ ডিউটি নাউ, বাট আয়াম নট। সরি⋯ইয়েস, বাই টেন পি. এম⋯বাঈ, বাঈ!

॥ দশ ।

কবি কৌশিক তার দিনপঞ্জিকায় লিখছে :

ইন্টারভিয়ু দিতে গিয়েছিলাম মেসার্স⋯কোম্পানিতে। বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম। কোটি কোটি টাকার কাজ করেন বছরে। ব্রিজ কনট্রাকসনেই এঁদের বিশেষত্ব। নেপাল বর্ডারের কাছে বুঝি কতকগুলো নূতন কাজ হবে, তারজন্য ওঁরা কইনছিক্তু কিছু নূতন সিভিল এঞ্জিনিয়ার খুঁজছেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে চাকরি সম্পূর্ণ অস্থায়ী। আপাতত ছয়মাসের জন্য। অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে যে যোগ্যতানুসারে কিছু লোককে স্থায়ীভাবে রেখে দেবার সম্ভাবনাও আছে। তবু আমার মত দুই'শ সাইত্রিশ জন বেকার এঞ্জিনিয়ার দরখাস্ত করেছে নেপালের তরাই অঞ্চলে যাবার জন্য।

ক'লকাতা থেকে অনতিদূরে কোম্পানির একটি ফ্যাকটারি আছে। স্টিল-ফ্যাব্রিকেশন হয় সেখানে। সেখানেই যেতে হল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা ছিল যে প্রার্থীকে নিজ ব্যয়ে উপস্থিত হতে হবে। অগত্যা শেষ দু টাকার নোট খানা ভাঙিয়ে বাসের টিকিট কাটলাম।

এসে দেখি আমার আগেই অনেকে এসে উপস্থিত। খান কয় বেঞ্চি কর্তৃপক্ষ পেতে দিয়েছেন; কিন্তু তাতে এতগুলি ভাগ্যান্বেষীর স্থান সঙ্কুলান হবার কথা নয়! তিন দিন ধরে নাকি চলছে এই কারবার। বসবার জায়গা নেই, কখনও ডান পায়ে কখনও বাঁ পায়ে ভর দিয়ে সাড়ে নটা থেকে ঘড়ির কাঁটা দুটোকে একটার ঘরে পৌছাতে দেখলাম। দুর্ভাগ্য আমার, আমার নম্বর পৌছানোর আগেই লাঞ্চ আওয়ার্সের বিরতি হল। সিলেকশন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ খানায় বেরিয়ে গেলেন। আমার মত বেকার মানুষের খাবার উপযুক্ত দোকান ওপাড়ায় নজরে পড়ল না। পকেট হাতড়ে দেখি এখনও যা আছে তাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করা যেতে পারে। দু-আনার বাদাম চানা কেনা গেল, দশ নয়া পয়সা দিয়ে এক ফালি কাটা শশাও অমৃতের স্বাদ এনে দিল।

খাওয়া সেয়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাঁচি সিগারেট কিনব কি কিনব না ভাবছি হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে এসে দাঁড়ালো একখানা এ্যাম্বাসাডার।

: কৌশিক! তুই এখানে? কি করছিস্?

: বাজেট এষ্টিমেট করছি! দেখছি, কলকাতা ফেরার ভাড়া বাদ রাখলে একটা সিগারেট কেনা যায় কিনা। কিন্তু তুমি এসে পড়লে, কিনলে এখন দুটো সিগ্রেট কিনতে হয়, সুতরাং এষ্টিমেট বার্স্ট করে গেল কিশোরদা!

হো-হো করে হেসে উঠ্ল কিশোরদা, বললে, খুব হয়েছে, উঠে আয়, আমার কাছে সিগ্রেট আছে।

কিশোর ভালমিয়া চমৎকার বাঙলা বলে। আমাদের একবছরের সিনিয়ার। অবশ্য মাঝে একবছর ফেল করায় আমার সঙ্গে একই বছরে পাশ করেছে। বড় লোকের ছেলে, চকচকে চেহারা, পোষাক আসাকে একটা জৌলুষ, তা হ'ক, দিল্ তার চিরদিনই দরাজ। বললাম, আমার যে এখন ইন্টারভিয়ু আছে কিশোরদা।

: আরে সে-পর্ব শুরু হতে এখনও একঘণ্টা। উঠে আয় শিগ্‌গির!

অগত্যা উঠে বসি তার ঝকঝকে গাড়িতে, ড্রাইভারের সীটের পাশে। পকেট থেকে সুদৃশ্য একটি সিগারেট-কেস বার করে খুলে ধরল আমার সামনে, নিজেও ধরালো একটা। ওঃ! কতদিন পরে গোল্ড-ফ্লেক পেলাম! কী মোলায়েম আমেজ! এঁকে বেঁকে গাড়িটা এসে থামল একটা রেস্তোরাঁর সামনে। কিশোরদা আমাকে নিয়ে বসালো একটা কোনায়, খাবারের অর্ডার দিল; বললে, এখানে ইন্টারভিয়ু দিতে এসেছিস্ কেন মরতে? নেপাল যাবি?

: নেপাল নয়, নেপাল বর্ডার!

: ও একই কথা। তা সে যাই হোক এ চাকরি তোর হবে না।

: হবেনা কেমন ক'রে বুঝলে? হ'তেও তো পারে!

: যাক ও কথা। এখন ওসব কথা তোকে শোনাব না। এতদূর যখন এসেছিস ইন্টারভিয়ুটা দিয়ে মনের সাধ মেটা। তারপর ভিতরের গ্যাড়াকলের কথা বলব অখন। আমি ঐ সামনের অফিসটায় থাকব, ঐ পয়েন্টিং করা লাল বাড়িটায়। ফেরার পথে তোকে পৌঁছে দেব।

কিশোরদা ভাগ্যবান। তাকে চাকরি খুঁজতে হয়নি। চাকরিই বরং ওর জন্ম পাঁচবছর প্রতীক্ষা করে বসেছিল। ওর বাবার মস্ত ঠিকাদারী আছে। রেলওয়ে পি. ডাব্‌লুর্মডি এবং সি. পি. ডাব্‌লু ডির নামকরা কণ্ট্রাকটর।

তাই দেখা শোনা করছে। এখানে এসেছে একটা বিলের পেমেন্ট নিতে। বললে, মৃজন আর শচীনন্দন অব ভাউচার নিয়ে বিলেত চলে গেছে, শুনেছিস্?

: শুনেছি।

: সুরেন, রবি আর সুবিমল তিন হতভাগায় মিলে একটা ফার্ম খুলেছে, কাজ ধরতে পারেনি কোন। ক্রমাগত টেণ্ডার দিয়ে চলেছে।

: জানি!

: সবই জানিস্ দেখছি! এ জুতো জোড়ায় দাম কত জানিস?

জুতো সমেত ঠ্যাঙখানা সে বাড়িয়ে ধরে। এ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের কি জবাব দেব ভাবছি, কিশোরদা তার আগেই বলে: এ জুতো কেনার একটা ভারি মজার ইতিহাস আছে! ফাইনাল পরীক্ষায় আমার সীট পড়েছিল সতু লাহিড়ীর ঠিক পিছনেই। শালা একটুও হেল্প করেনি আমাকে। পরীক্ষার হলে যেন আমাকে চিনতেই পারছিল না! পিছন থেকে কলমের খোঁচা মারতে ক্ষেপে উঠে বললে, অমন করলে আমি কিন্তু গার্ডকে বলে দেব কিশোরদা! শালা, আমার উপর টেক্কা দেবে? পরীক্ষার পর বললাম, কিরে সতু হলের মধ্যে তুই আমাকে চিনতে পারছিলি না নাকি? তা বললে, পরীক্ষার হলে না চেনাই তো স্বাভাবিক!

আমি বাধা দিয়ে বলি, হঠাৎ এসব কথা কেন বলছ কিশোরদা?

: শোন তো শেষ পর্যন্ত! বুধবার দিন লিণ্ডসে স্ট্রিটের বাটার দোকানে জুতো কিনতে গিয়ে দেখি শ্রীমান সতু একটি যুবতী তন্বীর ঠ্যাঙখানা কোলে তুলে নিয়ে স্লিপার পরাচ্ছেন! ও শালা যে বাটার দোকানে সেলস্‌ম্যান হয়েছে তা আমি জানতুম না, বুঝেছিস। শালা আমায় দেখতে পায়নি। যেই আমার দিকে ফিরেছে ঠ্যাঙটা ওর কোলে তুলে দিয়ে বললুম: দেখুন তো এই মাপের এ্যাম্বাসাডার জুতো আছে কিনা! শালার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। মুখে কিছু বললে না। আমার ঠ্যাঙখানা নামিয়ে দিয়ে জুতো নিয়ে এল। আমি ছোড়নেওয়ালা নই। শোধ তুলে ছাড়ব। বললুম পরিয়ে দিন, ফিতে বেঁধে দিন! তুই শালা আমাকে পরীক্ষার হলে চিনতে পারিস না, আমিই বা কেন তোকে জুতোর দোকানে চিনতে যাব?

আমার কেমন যেন অত্যন্ত খারাপ লাগল। সতুটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীর ছিল। লাজুক মুখচোরা ভাল ছেলে। পড়াশুনা নিয়ে থাকত। সাত্ত্বিক প্রকৃতির, একটু পুজো পুজো বাতিক ছিল। হস্টেলের ঐ পরিবেশেও

সে সন্ধ্যা বেলা আহ্নিক করত। আমরা তাকে বিরক্ত করতাম, এবং সে চটত না বলে নিজেরাই বিরক্ত হতাম। একটু শুচিবায়ুও ছিল। দোকানে খেতে পারত না। অচেনা অজানা লোকের হাতের রান্না তার মুখে রুচত না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে আরকি! ভাগ্যের ফেরে সে আজ জাত বেজাতের লোকের পায়ে জুতো পরায়! প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলি, শিবুর খবর জান?

: কে শিবু পালোয়ান? শিবেটা কম্পাউণ্ডারি করছে। আর সবচেয়ে মজার খবর সুরেশ নাগিনের। তার লেটেস্ট খবর জানিস?

: জানি বইকি; সে কলতার ব্রিক-ফিল্ডে চাকরি করছে। দৈনিক আড়াই টাকা হারে। সেটা তোমার কাছে 'মজার খবর' মনে হল কেন কিশোরদা?

: তুই ছাই জানিস। নাগিন এখন হাজতে। কগনিজেবল অফেন্স। 'বেল' পায়নি, আর জামিন দাঁড়াবেই বা কে বল্?

: বল কি? সুরেশ নাগ বিচারাধীন আসামী? কি চার্জ তার বিরুদ্ধে?

: সে অনেক ব্যাপার! পরে বলব, ঐ শালা ম্যাক্‌ফারসনের গাড়ি ফিরে এল। আমি যাই, পেমেণ্টটা আজই নিতে হবে। কাল ফার্স্ট আওয়ারে ক্লিয়ারিং না পেলে মুশ্‌কিল হবে। চলি ভাই! ঐ যাঃ; খাবারের দামটা দেওয়া হয়নি—

কিশোরদা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, বেয়ারাটাকে এ দিকে ওদিকে খুঁজল, তারপর বললে,—টাকাটা তোকে দিয়ে যাব? কাইগুলি পেমেণ্ট করে দিবি?

কেমন যেন বিশ্রী লাগল আমার, বলে ফেললাম ঝোঁকের মাথায়—সে কি কথা কিশোরদা; তুমি তো কিছুই খাওনি, খেলাম তো আমিই। পেমেণ্ট আমিই করে দেব!

কিশোরদা মানিব্যাগটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, তার দৃষ্টি কিন্তু ঐ দূরের ম্যাকফারসন সাহেবের গাড়ির দিকে নিবদ্ধ। বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সে। হঠাৎ ব্যাগটা পকেটে ভরে বললে, তুই কিন্তু ইণ্টারভিয়ু দিয়ে চলে যাস্‌নে। আমাকে ঐ সামনের অফিসটায় পাবি, বিল সেকসানে।

ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল কিশোরদা।

এবং তখনই নিজের অবস্থাটা খেয়াল হল আমার। যা খেয়েছি, না হ'ক দেড়-দু'টাকার বিল হবে। ফেরার ভাড়া হাতে না রেখেও সে বিল মেটাবার মত পয়সা আমার হাতে নেই! কেন এ মাস্টামো করতে গেলাম? কি বলব এবার বেয়ারাটাকে? পকেটে হাত দিয়ে কি মানিব্যাগ চুরি

যাওয়ার অভিনয় করতে হবে? কি কুক্ষণে কিশোরদার পাল্লায় পড়েছিলাম! ঠিকই শাস্তি হয়েছে আমার! শিবু সমাদ্দার, সতু লাহিড়ী আর সুরেশ নাগ আমার স্ব-গোত্রের। বড় লোকের ছেলে কিশোর ডালমিয়া তাদের লাঞ্ছনায় ব্যস্ত করছিল এটা আমার সহ্য হয়নি। তাই রাগের মাথায় হাত পেতে ওর কাছ থেকে টাকাটা নিতে পারিনি! কেমন যেন প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল আমার। অভিমান কার উপর, কোন অধিকারে করেছি জানিনা, বোধহয় আমার ভাগ্য দেবতার উপর! ঐ কিশোরদা হস্টেলে থাকতে কতবার আমার স্বারস্থ হয়েছে। ডিসাইনের থিয়োরি না বুঝতে পেরে, অঙ্কের ফর্মুলা না ধরতে পেরে সিনেমা দেখিয়েছে, রেস্তোরাঁয় খাইয়েছে। পরিবর্তে তার সেসানাল প্লেট করে দিয়েছি, অঙ্ক কষে দিয়েছি, অথবা পড়া বুঝিয়ে দিয়েছি। তখন দাবী করেছি, এবার কোনদিন মোকাম্বোতে খাওয়াতে হবে কিন্তু কিশোরদা। তা সে খাইয়েছে—নিজের গাড়ি করে কলকাতা নিয়ে গিয়ে। কোন সঙ্কোচ বোধ করিনি। কারণ সেখানে দান প্রতিদান ছিল বলে নয়, সেখানে সত্যিকারের বন্ধুত্ব ছিল, সমানে সমানে বন্ধুত্ব। এক হস্টেলের দুটি ছেলের মধ্যে যে হৃদ্যতা থাকার কথা, তাই ছিল। কিন্তু আজ তো আর তা নয়। আজ আমি নিঃস্ব বেকার, আর সে বড়লোক কণ্ট্রাকটার! আজ আমরা জুতো পরাই, আর সে জুতো পরে। আমার যে সিগ্রেট কিনবার পয়সা ছিল না সে কথাও আমি জানিয়েছিলাম, হয়তো ও সেটা রসিকতা মনে করে থাকবে। দোষ অবশ্য কিশোরদাকেও দেওয়া যায় না। সে যে স্তরের মানুষ তাতে সত্যিই আশঙ্কা করেনি, দু-টাকা খাবার বিল মেটাবার সঙ্গতিও নেই আমার!

ভাবতে ভাবতেই বেয়ারাটা বিল নিয়ে এল। এক টাকা বারো আনা। টিপস্ নিয়ে দু-টাকাই আমার দেওয়া উচিত! মানিব্যাগ চুরি যাওয়ার মিথ্যা অভিনয়টা কিছুতেই করতে পারলাম না। পকেট হাতড়ে দেখলাম, এক টাকা সাড়ে তিন আনা পয়সা আছে। মরিয়া হয়ে ওর হাত থেকে বিলটা নিয়ে উঠে গেলাম কাউন্টারে। যে ভদ্রলোক ক্যাশ জমা নিচ্ছিলেন তাঁকে ইংরাজিতে বললাম, আমার কিছু ভুল হয়েছে। বিলে এত উঠবে ভাবিনি। আমার কাছে মাত্র একটাকা সাড়ে তিন আনা আছে!

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তারপর বললেন, আপনি মিষ্টার ডালমিয়ার সঙ্গে বসেছিলেন, নয়?

: হ্যাঁ, কিশোর ডালমিয়া আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড।

: ঠিক আছে। বাকি পয়সা পরে সুবিধামত দিয়ে যাবেন।

নিঃস্ব হাতে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে।

ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত পেলাম একটা। ধেড়ে ছেলে, কিন্তু চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল আমার। আজ যে চোরের দায়ে ধরা পড়লাম না, সুরেশ নাগের মত হাজত বাস করতে হলনা তার কারণ আমি কিশোর ডালমিয়ার সঙ্গে এ দোকানে ঢুকেছিলাম। কিশোরকে দোকানের ম্যানেজার চেনে তাই আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম। দোকানের সাইনবোর্ডটা দেখে নিলাম একবার। কলকাতায় গিয়ে ঐ বাকি সাড়ে আট আনা পয়সা মানি-অর্ডার করে পাঠাতে হবে আমাকে, না হলে এ লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না!

কিন্তু প্রতিশোধ কার বিরুদ্ধে? আমার বেকারত্বের? অভাবগ্রস্ততার? কার উপর অভিমান করে সাড়ে আট আনা পয়সা মানি-অর্ডার করব? তা জানিনা। তবে ওটুকু আমাকে করতেই হবে।

আড়াইটা নাগাদ ডাক পড়ল। আমার পরনে স্যুট নয়, ছিল বুশ শার্ট। টাই নেই গলায়, পায়ে স্যু নয়, কাবলি। তাই বোধকরি এ খানদানি কোম্পানির নির্বাচকদল একটু চমকে গেলেন। আমি ছাড়া আর সবাই এসেছিল স্যুট চড়িয়ে। অধিকাংশই ধার করা প্যান্ট কোর্ট এবং গলায় অপরের-হাতে-পরিয়ে-নেওয়া টাই বেঁধে এসেছে, সানফোরাইজ-না-করা কাপড়ের বিজ্ঞাপনে দেখা বিচিত্রবেশীর মত। আমার নাম ঘোষিত হতে ভিতরে ঢুকলাম। বোর্ডে পাঁচজন মেম্বার। আমাকে বসবার চেয়ার দেওয়া হল। আর কিছু না ঠ্যাঙ দু'টো বাঁচল।

গ্রে-রঙের স্যুট পরা মধ্যবয়স্ক একজন প্রথম প্রশ্ন করেন—বুশশার্ট এবং কাবলি চপ্পল একজন এঞ্জিনিয়ারের উপযুক্ত পোষাক বলে মনে করেন আপনি?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, করি! যতদিন সে আনএমপ্লয়েড এঞ্জিনিয়ার! এ প্রশ্নোত্তরের ঐখানেই ইতি।

দ্বিতীয়জন বলেন, পাশ করার পর এতদিন কি করছিলেন?

: একটা চাকরি খুঁজছিলাম।

: সে তো জানি। কোথাও কোন কাজ করেছিলেন কি, পাশ করার পরে?

: না! কোথাও মাথা গোঁজার আশ্রয় পাইনি। এমনকি বিনা মাইনেতে শুধু পকেট এ্যালাউন্স দিয়েও কেউ রাখতে রাজি হন নি।

: তাহলে তো আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই ?

: না, চাকরি জীবনের কোন অভিজ্ঞতা নেই আমার।

: কন্ট্রাক্টর হিসাবেও নেই বোধকরি ?

: আজ্ঞে না। কন্ট্রাক্টারি করতে হলে মূলধন লাগে। আমার তা নেই। ইণ্টারভিয়ু দিতে আসার উপযুক্ত একজোড়া জুতোই কিনতে পারিনি।

তৃতীয়জন বলেন, আপনি তো ফার্স্টক্লাস পেয়েছেন দেখছি ; এ চাকরিতে টিকে থাকবেন তো ?

বললাম, কিন্তু বিজ্ঞপ্তিতে তো আপনারাই লিখেছেন যে, পদগুলি অস্থায়ী। ছয়মাস হয়ে গেলেই তাদের বিদায় দেবেন !

: কিন্তু ছয়মাসও যে আপনি মন দিয়ে কাজ করবেন তার গ্যারাণ্টি কি ? আপনি তো ছয়মাস ধরে ক্রমাগত বেশি মাইনের চাকরির জন্য দরখাস্ত করে যেতে পারেন, এবং অনবরত ছুটির আর্জি পেশ করে ইণ্টারভিয়ু দিয়ে বেড়াতে পারেন ?

: কী বলতে চাইছেন ? আপনারা কি একতরফা বণ্ড লিখিয়ে নিতে চান যে এই ছয়মাসের মধ্যে অন্য কোথাও দরখাস্ত করবার অধিকার আমার থাকবে না ?

চতুর্থজন বিরক্ত হয়ে বলেন, না, তা চাই না। আমরা কারও মৌলিক অধিকারে হাত দিতে চাই না। আমরা চাই এমন লোক যে খুশি হয়ে মন দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করবে। ক্রমাগত বেশি মাইনের চাকরির জন্য দরখাস্ত করবেনা।

: মাপ করবেন, তাই যদি সত্যি সত্যি চান আপনারা, তবে তাকে খুশি হওয়ার সুযোগও আপনাদের দেওয়া উচিত ছিল। সে ক্ষেত্রে প্রার্থীকে নিম্নতম বেতনের কথা উল্লেখ করে দরখাস্ত করতে বলেছেন কেন ? ন্যূনতম বেতন নিয়ে একটা লোক যে খুশি থাকবেনা এতো জানা কথা। উপযুক্ত বেতনের অঙ্ক ঘোষণা করেই বিজ্ঞপ্তি দিতে পারতেন আপনারা ?

: ন্যূনতম বেতন মানে, বেতনের সেই ন্যূনতম অঙ্ক যাতে সে খুশি থাকবে, তাই নয়-কি ? অঙ্কটা প্রার্থীকেই জানাতে বলেছি আমরা, নিজে থেকে আরোপ করিনি।

: ঠিক কি তাই ? আমার কথাই ধরুন, আমি ন্যূনতম বেতন উল্লেখ করেছি দুশ' এগারো টাকা। সরকারি চাকরিতে এ্যাসিস্টেণ্ট এঞ্জিনিয়ারের

স্কেল শুরু হচ্ছে ৩২৫'০০ টাকায়। এতে তো বেশ বোঝা যায় যে আমি দুশ' এগারো টাকায় খুশি থাকতে পারিনা।

: তবে ও কথা লিখলেন কেন?

: যাতে পরবর্তী ইন্টারভিয়ু বোর্ডে বলতে পারি চাকরি করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাইয়ের অবধারিত নিয়মে আমাকে দর নামাতে হয়েছে। আপনারাও জানেন, আমিও জানি যে আমরা, কোয়ালিফায়েড এঞ্জিনিয়াররা আজ বাজারে সারপ্লাস!

প্রথমজন আবার আলোচনায় যোগ দেন, হেসে বলেন, তার উপর আপনি তো আবার শুধু কোয়ালিফায়েড নন, ওভার-কোয়ালিফায়েড; ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন আপনি।

হাসিতে হাসি আনে। আমিও হেসে বলি, আপনার এ আশঙ্কার কথা জানা থাকলে চেষ্টা করতাম যাতে ফার্স্ট ক্লাস না পাই। সেটা খুব কষ্টকর ছিলনা আমার তরফে!

ও পক্ষ কিন্তু এবার আর হাসলেন না রসিকতাটায়।

পঞ্চম সদস্য, যিনি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, তিনি এবার প্রশ্ন করেন: একটা কথা। নিম্নতম বেতন দুশ' এগারো টাকা বলেছেন কেন?

: দুশ' এগারো টাকা বেতন পেলেই আমি নেপাল বর্ডারে চাকরি করতে যেতে রাজি আছি বলে।

: আই মীন, দুশ' দশ নয় কেন? অথবা দুশ' কুড়ি নয়, কেন? হোয়াই দিস্ অড্ ফিগার, টু হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ইলেভেন?

বললাম, আজকের দিনে একজন ভালো রাজমিস্ত্রির দিন মজুরি দৈনিক সাতটাকা; অর্থাৎ মাসে দুশ দশটাকা। তার কম নিতে ভ্যানিটিতে বাধছিল বলে একটাকা বেশি চেয়েছি। নাহলে শুধু খোরাকি পেলেই বিনা মাইনেতে আমি জয়েন করতে রাজি আছি।

এতক্ষণে গ্রে স্যুট-পরা প্রথম জন বললেন, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে সহযোগীকে বললেন, শুনতে পেলাম, সীম্‌স্ টু বি ওভার কোয়ালি-ফায়েড!

সহযোগী বললেন, শুধু তাই নয়, কথায় ভঙ্গিমা দেখেছ? সব কথাতেই কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং জবাব! এরাই ঐসব ধর্মঘট আর ঘেরাও অর্গানাইজ করে!

ইচ্ছে হল ফিরে গিয়ে শুনিয়ে আসি তিনকড়ের সেই অনবদ্য উক্তিটি—'পেটে আগুন জ্বললে বাক্যিগুলো মুখ দিয়ে কিছু গরম গরমই বার হয়।' কিন্তু সে সুযোগ হয়নি, তার আগেই দ্বারপাল আমাকে পথ দেখিয়ে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে।

বেশ বুঝতে পারি এ চাকরি হবার নয়, কিশোরদা ঠিকই বলছিল। কিন্তু কিশোরদার কথার পিছনে কী যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। মরুক গে, এখন আর কিশোরদার খোঁজ করতে ইচ্ছা হল না। কিশোর ডালমিয়ার সঙ্গে এখন আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বীকার করিনা আমি। হ্যাভ আর হ্যাভনটের বিরাট ফারাক সৃষ্টি হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। কলেজে থাকতে কিশোরদা আমাকে মোকাম্বোতে খাইয়েছে, সিনেমা দেখিয়েছে, গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে গেছে। তার গাড়িতেই ড্রাইভিং শিখেছি আমি—হাতে ধরে সেই শিখিয়েছিল আমাকে। সে সব ঋণই স্বীকার করি আমি। কিন্তু পরিবর্তে তাকেও প্রভূতভাবে সাহায্য করেছি। আমার সাহায্য না পেলে সে এ বছরও পাশ করতে পারত না। ফলে দান প্রতিদান শোধবোধ হয়ে গেছে। এখন নূতন করে হিসেব লিখতে হবে। নূতন খাতায়। এ খাতায় আমি জমার অঙ্কে কিছুই দিতে পারব না। এ খেলাঘরে আমরা দুজনে সতীর্থ নই, দুজনে দু' দলে। আমি আছি ঐ শিবু সমাদ্দারের দলে—যে হতভাগ্য বি, ই পাশ করে এখন কম্পাউণ্ডিং শিখছে। আমি ঐ সতু লাহিড়ীর দলে যে হতভাগ্য আজ কিশোরদার পায়ে জুতো পরায়। আমি ঐ সুরেশ নাগের দলে, যে দুর্ভাগা দৈনিক-আড়াই টাকা মজুরিতে আজকের বাজারে— ; না! সুরেশ আজ দিনমজুর নয়। সে হাজতি আসামী। কী করে ছিল সুরেশ? সত্যই কিছু করেছিল, না মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়েছে? কিশোরদা বলেছিল সব কথা সে আমাকে বলবে। বলেছিল, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে তার গাড়িতে। কিন্তু না! তার খোঁজ আমি করব না। তার গাড়িতে চাপবার দীনতা আমি আর স্বীকার করতে চাই না। আমার কাছে সে যে ভাষায় শিবু, সতু, আর সুরেশের মর্মবিদারক অবমাননার কথাগুলো 'মজার খবর' হিসাবে দিয়েছে, এর পর কৌশিক মিত্রের মজার খবর হয়তো তেমনি ভাবে পেশ করবে আমাদের অন্য কোন বন্ধুর কাছে, বলবে—'লেটেস্ট মজার খবর হচ্ছে আমাদের কৌশিক মিত্রের। বেটা ইন্টারভিয়্যু দিতে গিয়ে দেখে বাড়ি ফেরার বাস ভাড়া নেই পকেটে! শেষে আমি একটা লিফ্‌ট দিয়ে দিলুম। হাজার হ'ক, একসময় আমার সঙ্গে পড়ত তো?'

শ্যামবাজারে আমাদের মেসটা ওখান থেকে মাইল বারো-তের। ঘণ্টা তিনেক হাঁটলেই পৌঁছে যাব। বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে আর গেলাম না। হাঁটা পথে রওনা দিলাম ক'লকাতার দিকে।

হেঁটে কিন্তু ফিরতে হয়নি আমাকে। মাইল তিনেক আসার পর হঠাৎ একটা এ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার পাশে। কিশোরদা মুখ বাড়িয়ে বললে: মানে? তুই হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিস?

কেমন যেন রোখ চেপে গেল। দারিদ্র্যের একটা অভিমান আছে, দারিদ্র্য গোপন করার মধ্যে আছে হীনমন্যতা। তাই সোজাসুজি জবাব দিলাম, ফেরার বাসভাড়া আমার কাছে নেই কিশোরদা। তোমাকে তখন বলেছিলাম, একটা কাঁচি সিগারেট কিনবার পয়সা আছে কিনা গুনে দেখছিলাম, সেটা ছিল সত্যি কথা, রসিকতা নয়।

কিশোরদা মিনিট খানেক জবাব দিলনা। তারপর অস্ফ স্বরে বলল, উঠে আয়!

: না, কিশোরদা। খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। তোমার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ।

গাড়ির ডালা খুলে নেমে এল কিশোরদা। আমার হাতখানা চেপে ধরে বললে, কৌশিক!

যে ভাবে প্রচণ্ড জোরে ও আমার হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে ধরেছে তাতেই বুঝতে পারি, এর পর প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে উচিত হবেনা। চুপ চাপ উঠে বসি ওর গাড়িতে। কিশোরদা একটা সিগারেট ধরায়। একটা আমার হাতে দিয়ে বলে, স্বীকার করছি কৌশিক, তখন আমি বুঝতে পারিনি, তোর এই হাল হয়েছে। বুঝতে পারলুম, সেই রেস্তোরাঁতে ফিরে গিয়ে। তোকে খুঁজতে খুঁজতে ওখানেও গিয়েছিলুম। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার আমাকে চেনে। তোর কথা তার কাছে শুনলাম। তোর বাকি পয়সা, সাড়ে আট আনা আমি দিয়েছি। তখনই বুঝলাম, তোর কাছে বাড়ি ফেরার বাস ভাড়া নেই। বিশ্বাস কর, একঘণ্টা ধরে তোকে ওখানে আতি পাতি করে গরু খোঁজা খুঁজেছি।

: ঠিক আছে, চল এখন।

: তুই চালা।

: আমার লাইসেন্স রিনিউ করা হয়নি এ বছর

: তা হোক। চালা তুই।

বাধ্য হয়ে স্টিয়ারিঙে বসলাম। কিশোরদা সিগ্রেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বললে, কৌশিক, তুই যেমন তোর বেকারত্বের জন্য দায়ী নস্—সেটা তোর কর্মফল, আমিও তেমন আমার বড়লোকত্বের জন্য দায়ী নই—সেটা আমার জন্মফল!

আমি জবাব দিইনা। গিয়ার বদলে গাড়ি চালাতে থাকি।

আবার খানিকক্ষণ ধোঁয়া টেনে কিশোরদা বলে, এ চাকরি তোর হবেনা। আমি ভিতরের খবর সব জানি। ওদের লোক সব সিলেক্ট হয়েই আছে, শুধু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে খুশী করতে এই লোক দেখানো ইন্টারভিয়ু করেছে।

বললাম, আমারও তাই মনে হল। বারবার আমাকে ওভার-কোয়ালিফায়েড বলল। বোধহয় যারা সিলেক্টেড হয়েছে তারা কেউ ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলে নয়, তাই নয়?

কিশোরদা সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, কৌশিক তুই আমাদের ফার্মে চাকুরি করবি? এঞ্জিনিয়ার অবশ্য আমাদের এখন দরকার নেই; কিন্তু ওভারসিয়ার স্কেলে দু-একটি লোক নিতে পারি আমরা। তুই তো দুশ' দশ টাকায় নেপাল পর্যন্ত যেতে রাজি ছিলি।

আমি হেসে বলি, দুশ দশ নয়, এগারো। আর নেপাল নয়, নেপাল-বর্ডার।

কিশোরদা কিন্তু সিরিয়াস, বললে, আমার কথার জবাব ওটা নয়। আমাকেও গম্ভীর হতে হল, বলি, না কিশোরদা। তোমার এ দানের কথা চিরদিন কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করব আমি; কিন্তু ও চাকরি আমি নেব না। না না, ওভারসিয়ারের স্কেল বলে নয়, তোমার অধীনে চাকরি করতে পারব না আমি। তুমি আমার বন্ধু, সেই সম্পর্কটাই থাক বরং।

কিশোরদা বললে, কেন, এতে আপত্তি কিসের? নিখিলদা আর সুজিতদা তো ক্লাসফ্রেণ্ড, একই ইয়ারের! অথচ নিখিলদা আজ এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, তার পোস্টিং সুজিতদার আণ্ডারে, সুজিতদা আজ এস, ই। এ তো আকছার হয়।

বললুম, তা জানি। তবু রাজি নই আমি। ও কথা থাক। সুরেশ নাগের ব্যাপারটা বল তো। কি হয়েছিল তার?

কিশোরদার কাছে শুনলাম ঘটনাটা।

কলতা ব্রিক ফ্যাক্টারিতে সুরেশ নাগের চাকরি হয়েছিল একটু বেআইনি ভাবে। খাতা পত্রে তাকে দেখানো হচ্ছিল দিনমজুর হিসাবে, আসলে তাকে

দিয়ে করানো হচ্ছিল কেরানীর কাজ। হঠাৎ একদিন কেরানী-পদের স্যাংসান এসে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল একজন কেরানী। সারপ্লাস স্টাফ হিসাবে যে অপেক্ষমান-তালিকায় বসেছিল এতদিন! তাকে নিতেই হল। ফলে, তারপর সুরেশ নাগকে রাখতে হলে তাকে দিয়ে সত্যিকারের মাটিকাটার কাজ করাতে হয়। সেটা সম্ভব নয়।

বেচারির সংসারে সত্যিই প্রচণ্ড অভাব। বাপ বৃদ্ধ, অবসর প্রাপ্ত; ওই বড় ছেলে। ছোট ভাই স্কুলে পড়ে, ছোট বোন কলেজে, তার বিয়ে দেওয়া বাকি। সুরেশ নাকি পাগলের মত দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। আরও দুটো প্রাইভেট টিউশানি নিয়েছে; কিন্তু এ বাজারে সাত আট জনের সংসার চারটে টিউশানিতে চালানো যায় না। সুরেশ মরিয়া হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে কাজ পেয়ে গেল একটা। কাজটা দিনের আলোয় করা চলে না। মা বুঝতে পারলেন সবার আগে, বারণ করলেন না, আঁচলে চোখ মুছে বললেন, আমার বড় ভয় করে রে। বুঝলেন বাবাও, এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। ছোট ভাই দুটি বয়সে কম হলে কি হবে, এ যুগের ছেলে, বুঝল কিছুটা তারাও। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। একমাত্র প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল ছোট বোন, বললে, এ তুমি কী করছ দাদা? না, এভাবে তোমাকে—

বাধা দিয়ে সুরেশ বলেছিল, তোর ভয় কি রে? শুনিস্ নি দস্যু রত্নাকরের উপাখ্যান? পাপ যা হচ্ছে তা একা আমার। তোদের গায়ে আঁচড়টা লাগবেনা! শাস্তি হলে আমার হবে—

বোন বলেছিল, তখন কোথায় দাঁড়াব আমরা?

: তা আমি তো আর দেখতে আসব না।

আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল ওর কলেজে পড়া ছোট বোন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সুরেশ বলেছিল, তোর ভয় নেই রে। ধরা আমি পড়ব না। তোদের এভাবে ডুবিয়ে দিয়ে যাব না।

সে প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি রাখতে পারেনি সুরেশ। ধরা সে পড়েছিল। একদিন ভোররাত্রে সমস্ত পাড়াটা ঘেরাও করে পুলিস ওকে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু সংসারটাকে সে ডুবিয়ে যায়নি। ওর বাপকে যদি পুলিসে বি. এল. কেসে ধরে না নিয়ে যায়, তবে সংসারটা দীর্ঘদিন চলবে এভাবে। দু ভাইয়ের স্কুলের মাইনে, বোনের কলেজ-ফি, বাবার আফিঙের দুধ, আর মায়ের—না

মায়ের কোন সখ আহ্লাদ আর নেই; শুধু ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে গেছে সে।

কিশোরদাকে থামিয়ে দিয়ে বলি: চার্জটা কি?

: ডাকাতি! ওর কাছ থেকে নগদ একটি টাকাও পাওয়া যায়নি; কিন্তু আনলাইসেন্স পিস্তল আর তাজা কার্তুজ পাওয়া গেছে। পার্কস্ট্রীট না সদর স্ট্রীটে মাস কতক আগে একটা ডাকাতি হয়েছিল কাগজে দেখে থাকবি, পুলিসের সন্দেহ সুরেশ তার সঙ্গে জড়িত।

আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, আমি বিশ্বাস করি না!

কিশোরদা হেসে বলেছিল, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি কৌশিক!

: সুরেশ ক্যাসভ্যান লুট করতে পারে? সুরেশ করেছে?

: করেছে কিনা জানিনা', করতে পারে! সুরেশ মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তাকে খোকা গুণ্ডার দলে স্বচক্ষে দেখেছি আমি!

: খোকা গুণ্ডা কে?

: তুই চিনবি না। তা সে যাইহোক, আমি আশ্চর্য হব না যদি ওর কঠোর সাজা হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে গেলে মানুষ সব করতে পারে। দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছে—

হঠাৎ কেন জানিনা বলে উঠি—কিশোরদা আমিও তো দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁচেছি। তোমার কাছে কি লুকাব, একবেলা খাইনা, একটা গেঞ্জি কেনার পয়সা নেই আমার। তুমি কি বিশ্বাস কর, আমি অমন ডাকাতের দলে নাম লেখাতে পারি?

: না পারিনা, কিন্তু তার কারণটা সম্পূর্ণ আলাদা। তুই অন্য জাতের মানুষ। তুই কবি, তুই সেন্টিমেন্টাল, ক্রিমিনাল-টাইপ নয়। তুই ডাকাতের দলে নাম লিখিয়ে ডাকাতি করতে পারবিনা, কিন্তু অভাবের তাড়নায়, অন্ দ স্পার অফ দ মোমেন্ট তুই মানুষ খুন করতে পারিস! দেখিস, সামলে চালা!

সত্যিই স্টিয়ারিংটা বেকায়দা হয়ে গিয়েছিল। আমি, অধ্যাপক জগদানন্দ মিত্রের সন্তান, মানুষ খুন করতে পারি এ খবরটায় রীতিমত চমকে উঠে ছিলাম!

কিশোরদা বলে, ভয় তোকে নয়রে কৌশিক, আমার ভয় হয় শিবু পালোয়ানকে নিয়ে। ও বেটা যে কি করবে তাই আমি ভাবি। সেও আজকাল একবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আমি বলি : কেন শিবু সমাদ্দারের আবার কি হল ? সে তো আমাদের মত বেকার নয় ?

: তা নয়, কিন্তু তার অবস্থা আরও কাহিল। তুই কতদূর জানিস আমি জানিনা, শীলা ভৌমিককে চিনিস্ ?

: শীলা ভৌমিক ? না, সে কে ?

: বাঁ দিকে রাখ, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্ বরং।

বুঝতে পারি কিশোরদা আজ রাত্রের খাবারের খরচটা আমায় বাঁচিয়ে দিতে চাইছে। আপত্তি করতে পারিনা, আর আপত্তি করেই বা কি লাভ ? কিশোরদার বন্ধুত্ব আমি নূতন করে স্বীকার করেই তো নিয়েছি।

ভরপেট খাইয়ে দিল কিশোরদা, নিজেও খেল আমার সঙ্গে। আর এই সুযোগে শিবু পালোয়ানের গল্পটাও করল সে।

শিবু সমাদ্দার ক্ষীণজীবী প্রাণী। রোগা এবং কমজোরি, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী ছেলে। সেও স্কলারসীপ পেয়েছিল হায়ার সেকেণ্ডারিতে, সেও ফার্স্টক্লাস পেয়েছে বি ই-ফাইনালে। লম্বা একহারা চেহারা, মাথার চুলগুলো পিছনে ফেরানো, চোখে বেমানান মোটা ফ্রেমের চশমা। অত্যন্ত ফর্সা গায়ের রঙ, চোখ দুটো নালচে, এমনকি চুলগুলোও লালচে। হঠাৎ দেখলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে ভুল হয়। ফার্স্ট-ইয়ারে স্মিথি-শপে হাপরের সামনে লোহা পিটতে পিটুতে হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে যায়। গরমেই বোধহয়। জ্ঞান ফিরে আসতে তার মিনিট পাঁচেক লেগেছিল। কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিটের দুর্ঘটনাটাই তাকে একেবারে দাগী করে দিয়েছে। ক্লাসশুদ্ধ ছেলে বরাবর তাকে ডেকেছে শিবু পালোয়ান বলে।

মুখচোরা লাজুক ছেলেটা যে লুকিয়ে প্রেম করতে পারে একথা আমি কল্পনাই করিনি। এ সব খবরও অবশ্য আমি রাখতাম না। কিশোরদা-সকলের সব হাঁড়ির খবর রাখে। তার কাছেই আজ প্রথম শুনলাম শিবু ও শীলার প্রণয়োপাখ্যান। শিবুর বাবা ডাক্তার, নিজেরই মস্ত ডিস্পেন্সারী। শীলার বাবার চিকিৎসা করতেন তিনি। একই পাড়ায় থাকে ওরা। শীলা ডিস্পেন্সারীতে আসত ঔষধ নিতে। শিবেন্দ্র তখন অবশ্য ডিস্পেন্সারীতে বসত না, তবু তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল শীলার। তারপর থেকে আর শীলাকে ঔষধ আনতে আসতে হত না। শিবেন্দ্রই পৌঁছে দিয়ে আসত ঔষধ ও বাড়ি গিয়ে। তারপর যেমন হয়ে থাকে। বাড়ির বাইরেই দেখা শোনা

হত, সপ্তাহান্তে শিবেন্দ্র শিবপুর হস্টেল থেকে শনিবার বাড়ি আসত। সোজা বাড়িতে কিন্তু আসত না। কখনও যেত আউটরাম ঘাটে, কখনও মেট্রোর সামনে, কখনও বা লেকের ধারে চিহ্নিত কৃষ্ণচূড়া গাছ তলায়। শীলার কলেজেও শনিবার ছুটি হয়ে যেত বেলা আড়াইটায়। মাকে সে বলেই যেত কলেজ থেকে সোজা তাকে যেতে হবে লাইব্রেরিতে। সুতরাং শনিবারের সন্ধ্যাটায় তাদের ছিল নিয়মিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা।

মুখচোরা হলে কি হয়, শিবু কিন্তু বান্ধবীর সঙ্গে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সম্পর্কটা নিবিড় করে নিয়েছিল। তার বক্তব্য সে মুখে বলত না, কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হতনা শীলার। যে-দিন শীলা জানালো তার পিতৃবন্ধুর একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠেছে বাড়িতে, এবং ছেলেটি ওদের বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছে, সেদিন ভ্রূক্ষেপ করেনি শিবেন্দ্র। লেকের ধারে বসে কথা হচ্ছিল দুজনের। শিবু বলেছিল, কি নাম ছোকরার ?

শীলা চোর কাঁটার একটা ডাঁটা চিবুতে চিবুতে বলেছিল, ছোকরা নয় শিবুদা। তোমাদেরই বয়সী। তোমার চেয়ে নামটা অন্তত তার অনেক ভাল। মানস রায়।

: কি করে সে ছোকরা ?

: ছোকরা ছোকরা করবেন না কিন্তু, ভাল হবেনা। হয়তো তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। ডাক্তারী পড়ে। আর. জি. কর-এ।

: দেখি তোমার হাতখানা ?—কোথাও কিছু নেই শীলার হাতখান টেনে নিয়ে শিবু পাংলোয়ান হাতের রেখা দেখতে থাকে। তারপর হেসে বলে : সে গুড়ে বালি ! ডাক্তারের বউ হওয়া ভাগ্যে নেই তোমার !

চোখ পাকিয়ে শীলা বলেছিল—তবে কার বউ হব আমি ? এঞ্জিনিয়ারের ?

: যদি কোন এঞ্জিনিয়ার তোমাকে বিয়ে করতে আদৌ রাজি হয় !

: ঈস্ ! ঠোঁট উল্‌টে শীলা বলেছিল, এঞ্জিনিয়ার বর্তে যাবে !

পরদিন কলেজ থেকে ফিরে শীলা মায়ের কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। মা বললেন, তুই কোন্ দোকানে তোর বাপের জন্যে আধ ডজন আপেল কিনে দোকানেই ফেলে রেখে এসেছিলি, দোকানি দিয়ে গেছে। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি শীলা। রহস্যটা ভেদ হয়েছিল সেদিনের ডাক-পিয়ন আসার পর। খামটা খুলে স্বাক্ষরবিহীন যে চিঠিখানা পেয়েছিল তাতে লেখা আছে,

: An apple a day keeps the doctor away !

কী দুঃসাহস শিবেনের, ভেবেছিল শীলা। ইংরাজি প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী সে যাতে সপ্তাহের বাকি ছয়দিন ডাক্তারকে দূরে রাখতে পারে তার তির্যক নির্দেশ পাঠিয়েছে দুঃসাহসী ছেলেটা। কিশোরদাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম —এত বিস্তারিত তুমি জানলে কেমন করে?

: পালোয়ানই গল্প করেছে!

: এখন ওদের কি অবস্থা?

: তাই তো বলছি। শিবু পালোয়ানের সঙ্গে শীলার বিয়ের সব ঠিক ঠাক্ হয়ে গিয়েছিল। গত বছরই। না লাভ ম্যারেজ নয়, রীতিমত বাপ মায়ে ঠিক করা বিয়ে। দুপক্ষই ছেলে দেখা মেয়ে দেখা করেছিলেন। দেনা পাওনা সবই ঠিক হল, কথা ছিল শীলার বি. এ. পরীক্ষা এবং শিবুর বি. ই. পরীক্ষার ফল বার হলেই দু-বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা হবে। যায় শিবু পর্যন্ত আমাকে সমেত কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে একদিন মেয়ে দেখে এল। দুজনেই পাশ করেছে, কিন্তু এখন শীলার বাবা বেঁকে বসেছেন। কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কেমন করে!

—হো হো করে হেসে উঠল কিশোরদা।

সে হাসিতে আমি যোগ দিতে পারিনি।

কিছুতেই কিশোরদার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছিলাম না। বললাম, চল ওঠা যাক্!

: বসনা একটু! শোন্,তুই তো আমার ফার্মে চাকরি করবি না। অথচ অবস্থা তো বলছিস অন্নভক্ষ্যধনুর্গুণঃ! কী করবি? ব্যবসা করতে রাজি আছিস্?

: ব্যবসা? ক্যাপিটাল কোথায়?

: ক্যাপিটাল লাগবেনা। তুই ওয়াকিং পার্টনার। একেবারে স্বাধীন ব্যবসা। বল্‌তো ব্যবস্থা করে দিই। যতদিন না চাকরি বাকরি পাচ্ছিস্, দিন পাঁচ-সাত মায় দশটাকা রোজগার করতে পারিস' যদি ভ্যানিটিতে না লাগে?

: কাজটা কি শুনি?

: আমার একজন আত্মীয় সম্প্রতি একটা ট্যাক্সির পারমিট পেয়েছে। গাড়িও কিনেছে. চালাবি? আই মীন, যদ্দিন না—

: ট্যাক্সি-ড্রাইভার?

: বললাম তো যতদিন না—

: ঠিক আছে। আমি রাজি।

: এই ছাখ! অথচ আমি দুঘণ্টা ধরে তাল করছি কথাটা তোকে বলব কি বলব না।

: কেন এত সঙ্কোচ কিসের?

: না, মানে…যাকগে ও কথা! কাল সকালে তা হলে চলে আয় আমার ওখানে।

পকেট থেকে আইভরি ফিনিস একটা কার্ড বের করতে যায় কিশোরদা। তাকে বাধা দিয়ে বলি. তোমার বাড়ি আমি চিনি কিশোরদা। কতবার তো গেছি!

: ও হ্যাঁ তাই তো! যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সত্যি কথা বলতে কি তোর একটা হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত…আমি মানে…আমি শালা ভাবতেই পারিনি যে তোর কাছে…যাকগে!

উঠে পড়ে কিশোরদা।

আমাকে মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে কিশোরদা বললে, হ্যাঁ রে কৌশিক, তুই এখনও কবিতা লিখিস্? না সে ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে?

হেসে বললাম, না কিশোরদা ভূত এখনও ঘাড়ে চড়েই আছে।

: আজও লিখবি?

: কি জানি? দেখব চেষ্টা করে।

চেষ্টা সে রাত্রে করেছিলাম। কবিতা লিখেছিলাম একটা। না, সুরেশ নাগের অবক্ষয় নয়, সত্যপ্রিয়ের জুতা পরানোর কথা নয়; শিবু পালোয়ানের ব্যর্থ প্রেম নয়, আমি কবিতা লিখেছিলাম ঐ ফ্যাকটারিটার উপর।

কলেজে থাকতে ছাত্রজীবনে একটা চিনির কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিনও সেই ফ্যাকটারি তার যন্ত্রসঙ্গীত শুনিয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমি তখন বধির ছিলাম। ওদের সঙ্গীত আমার কানে প্রবেশ করেনি। কলেজ-জীবনে যন্ত্রকে দৈত্য বলে মনে করতে শিখিনি। কলেজে শিখেছিলাম, যন্ত্র হচ্ছেন দেবতা। চক্রমুখরমন্দ্রিত এবং বজ্রবহ্নিবন্দিত যন্ত্র দেবতার প্রচণ্ড বিক্রমে তখন মুগ্ধ ছিলাম। তার কাছে শিখতে চেয়েছিলাম 'লৌহগলন, শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র।' রেনেসাঁসের যুগে, ইণ্ডাসট্রিয়াল রেভলিউশানের যুগে সমগ্র য়ুরোপখণ্ড যেমন শ্রদ্ধানম্রচিত্তে যন্ত্র দেবতার বন্দনা গান গাইতে শিখেছিল, আমরাও তেমনি বি. ই. কলেজে বলতাম, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।

তারপর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর যাবতীয় কল-কারখানায় নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ শুনে মনে হল দেবতা নয়, যন্ত্র আসলে দানব। আশীর্বাদ নয়, যন্ত্র এ সভ্যতার অভিশাপ। সে চক্রমুখর-মন্দ্রিত নয়, সে চক্রান্ত-ইতর-মন্দ্রিত! শুধু ক্ষিতিকেই বিদীর্ণ করেনা, শুধু পাথরকেই দলন করেনা—মেহনতি-মানুষের হৃদপিণ্ডকে সে বিদীর্ণ করে, তাদের দলিত পিষ্ট করে অস্তি-নাস্তি দলের মাঝখানে খাল কেটে চলে! যন্ত্র-দৈত্যকে অভিশাপ দিয়েছিলাম সেদিন।

কিন্তু আজ মনে হল সে ধারণাটাও ভুল। আজ এই স্টীল-ফ্যাব্রিকেসন ফ্যাকটারিতে মনে হল—যন্ত্র দেবতা নয়, দানবও নয়। সে আসলে এক বন্দিনী নারী। যন্ত্রী-দানবের ক্রীতদাসী সে হতভাগিনী! তোমার-আমার মতই সে স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্ন দেখে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মন্ত্র জপ করে চলে গোপনে। এই ফ্যাকটারীতে আমার ঠাঁই হল না, সে জন্য সে দায়ী নয়; কিন্তু ঐ ক্ষণিক সুযোগে সে তার গোপন কথা আমাকে শুনিয়ে দিয়েছে কানে কানে। যন্ত্রের যন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করে এলাম আমি:

রোজ যারা আসে যায় তেল দেয় চাকাতে
চোখ বুঁজে চলে তারা ভুলে যায় তাকাতে
কোনদিন শোনে নাই ফ্যাকটারি কাব্যের ছন্দ!
কী মেসিন্ লোক ভাই! প্রাণে নাই কাব্যের গন্ধ!
আসে ভোর সাতটায়, পাঁচটায় ঘর যায়,
হানা দেয় ফিরে ফের বস্তীর দরজায়
কেউ ফিরে দেখে নাক' কোনদিন হায় হায়,
ফুর্তিতে ফ্যাকটারি রোজ কি যে গান গায়।
খুঁৎখুতে ঐ এঞ্জিনিয়ার ফেরেন শুধু খুঁৎ খুঁজে,
কোন্ নাটটায় ঢিল ধরেছে বলেন তিনি চোখ বুঁজে।
ফোরম্যান সা'ব হ্যাটটি মাথে ফেরেন বিরাট স্প্যানার হাতে
কোথাও কাজের ছিদ্র পেলেই দেন মবিলের ক্যান গুঁজে।
মজুররা সব নীল পাজামায় দিন মজুরী কষ্টে কামায়
কার্নেসটা তাদের ঘামায় কাটছে জীবন ঘাম মুছে।
যে যার কাজে মত্ত সবাই, কেই বা হেথায় কান পাতে,
কেই বা শোনে গাইতে কী গান ফ্যাকটারিটার প্রাণ মাতে॥

বন্ বন্ বন্ নাচছে ঘুরে ফ্লাইহুইলের সুদর্শন।
দাঁড়িয়ে খাড়া দেখছে চেয়ে বয়লারটা কু-দর্শন,
কোন কাজের নয় ক' ওটা, যেমনি কালো তেমনি মোটা।
তবু ওরই বুকের তলায় অগ্নি নাচে কী নর্তন!
গিয়ারগুলো বাড়িয়ে হুলো এগিয়ে নিল অগ্রগতি
সমান তালে ক্যামগুলো সব সমের মুখে ফেল্ছে যতি।
আমার হ্যামার ঠক্ ঠকা ঠাঁই ঠিক সময়ে তাল দিয়ে যাই
আমরা ক্রাশার নামাই আষাঢ় সর্বরসের নিষ্কাশন
ধ্বক ধ্বক ধ্বক চিমনি আমি সবার উচ্চে মোর আসন।
ম্যাকোমিটার কাঁটায় আমি শুনিয়ে যাব দিবস যামী
প্রেসারগজের খবরটা ঠিক, ছিল কী চাপ মোর ঘাড়ে,
বিপদ-সূচক এ্যালার্ম আমি, সবার দৃষ্টি মোর দ্বারে,
আমরা আখের অশ্রু ঝরাই প্রবল চাপের পিষ্টনে
আমরা ঘোরাই বিশ্ব চাকা ছোট্ট আমার পিস্টন-এ।
বার্মিংহামে জন্ম কারও, জন্ম কারও বার্লিনে,
ফ্যাকটারির এ গানের মর্ম বুঝতে তোরা পারলি নে,
মুখ্যু মানুষ যন্ত্র যে, বুঝবে গানের মন্ত্র কে?
বুদ্ধিমোহে এঞ্জিনিয়ার করছ কেবল এয়াকি,
পোষমানা এ শান্তি রূপে করবেনা কেউ কেয়ার কি?

জান ওহে! যদি মোরা একদিন বদ্লাই ছন্দ
লাগে যদি সেই দিন মেশিনে ও মানবের দ্বন্দ্ব,
নটরাজ মূর্তিতে নাচি যদি স্ফূর্তিতে
এ্যালার্ম ও সিগন্যাল ক্ষণতরে করি যদি বন্ধ,
কয়লারা গানে গানে বয়লার-কানে-কানে
তাপ-জোয়ারের বানে বিদ্রোহ-বাণী আনে
প্রলয়ের নৃত্যে উদ্দাম চিত্তে যদি মোরা কাটি তাল,
চৈতালী ঘূর্ণিতে চরাচর চূর্ণিতে জেগে উঠি উত্তাল!
মূঢ় নয়! সেই দিন করজোড়ে এসে চাবি' সন্ধি;
যন্ত্রের হাতে হবি উদ্ধত যন্ত্রীরা বন্দী॥

॥ এগার ॥

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিতেই ওদিক থেকে ভেসে এল, সুজাতা, আমি মহাপাত্র বলছি। আগরওয়াল কি ক'লকাতা চলে গেছে?

—হ্যাঁ, উনি তো কালকেই চলে গেছেন।

—কবে ফিরবে যেন?

—বলে গেলেন তো বুধবারে।

—ও, তা তোমরা সব কেমন আছ?

—ভালই।

—শোন, একটা বড় অর্ডার আছে। নেবে তোমরা?

সুজাতা একটু ইতস্তত করে বলে, বুধবার মিস্টার আগরওয়াল ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে বরং কথা বলবেন।

চোখে দেখতে না পেলেও সুজাতা অনুভব করে ও-প্রান্তবাসীর মুখে এক চিলতে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বৈদ্যুতিক তার বেয়ে ভেসে এল, সব কথা যদি তার সঙ্গে আলোচনা করি, তবে তুমি ও অফিসের কী এ্যাডমিনিস্ট্রেসন দেখছ?

—না, মানে গতবার আপনি রেলওয়ের অর্ডারটাও অফার করেছিলেন, তা আমরা নিতে পারিনি, সে সব তো আপনি জানেনই, তাই—

বাধা দিয়ে জীমূতবাহন বলে ওঠেন, ভাল কথা, সে অর্ডারটা তোমরা নিলে না কেন, বলত?

—আমাদের প্রডাকসন অতবড় অর্ডার ধরার উপযুক্ত এখনও হয়নি। মিস্টার আগরওয়াল বলেন,—

আবার ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জীমূতবাহন বলেন, মিস্টার আগরওয়াল কি বলেন, তা তাঁর কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছি, মিস্ সুজাতা কি বলেন তাই শুনতে চাই আমি। প্রডাকসান বাড়াবার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় তা কি তোমরা করছ? না করতে বাধা কোথায়? ক্যাপিটাল? পেটেন্টটা বা নেওয়া হচ্ছে না কেন? না কি এগ্রিমেন্ট হয়ে গেলে তারপর কারখানাটা বাড়াতে চাও। সে ক্ষেত্রে এগ্রিমেন্টটাই বা হচ্ছে না কেন?

সুজাতা বলে, আপনি একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করছেন। জবাব দিতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। টেলিফোনে সে সব কথা বলাও ঠিক নয়।

—বেশ তো, বল তো সামনাসামনি গিয়েই কথা বলতে পারি—

—না, আপনি কেন কষ্ট করে আসবেন, আমিই বরং আপনার কাছে যাচ্ছি।

—বেশ তাই এস, গাড়ি পাঠিয়ে দেব?

—না গাড়ি আছে, বেশ এখনি আসছি।

টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়ে সুজাতা তৈরী হয়ে নেয়। প্রসাধন সে কোন কালেই করেনা। কাপড়টা পালটে নেয় শুধু। বনোয়ারিলালকে ডেকে গাড়িটা বার করতে বলতে যায়, তারপর কী ভেবে থেমে পড়ে। গ্যারেজ পর্যন্ত হেঁটেই যাবে। সেই গরুড়পক্ষী ড্রাইভারটা দোতলার ঘরখানা দখল করেছে কিনা জেনে নেওয়াও যাবে। হোক মাইনে করা চাকর, নিম্ন-শ্রেণীর কর্মী তবু তো লোকটা এ বাড়ির অতিথি। সুজাতা বরং চৌকাঠের বাইরে থেকে মামুলী প্রশ্ন করবে—ঘর পছন্দ হয়েছে তো তোমার? লোকটা কৃতার্থ হয়ে যাবে। আর কিছু নয়, কর্ত্রী তারমত সামান্য কর্মচারীর সুখ দুঃখের কথাটাও তাহলে ভাবেন।

সুজাতা কাঁদবার অবকাশ পায়নি। কেঁদেছিল, অঝোর ধারে কান্নার বন্যায় ভেসে গিয়েছিল, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তারপরে তাকে নিজে থেকেই সামলাতে হয়েছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারেনি মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে দেওয়া তার শেষ প্রতিশ্রুতি। সে কথা দিয়েছিল তাঁকে, কিছু ভেবনা তুমি, তোমার রিসার্চের কাগজগুলো বেহাত হতে দেবো না আমি। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, ততদিন ওগুলো আমি ঠিক মতই লুকিয়ে রাখব। সে প্রতিশ্রুতি সুজাতা ভোলেনি। ডাক্তার সান্যাল যখন শেষ জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন, তখন সেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সুজাতা কথা ঠিক রেখেছিল। তার মনে হয়েছিল, সদাশিবের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। হার্টফেল করে মারা যাওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, কিন্তু এমন বিচিত্র সময়ে সেটা ঘটল কেন? যতদিন রিসার্চের ব্যাপারটা লুকানো ছিল সদাশিবের মস্তিষ্কে ততদিন কিছু হল না তাঁর, আর যে রাত্রে তিনি সেগুলি কাগজে টাইপ করে ফেললেন তারপর দিনই এভাবে রোগাক্রান্ত কেন হলেন তিনি? কাগজগুলো পেটেন্ট-অফিসে দাখিল করার আগেই এ দুর্ঘটনা ঘটল কেন?

কেন? কেন? কেন? ঐ একই সুরে নিজেকেই সে প্রশ্ন করতে থাকে, বাপির মৃত্যুর পর অমন সুরক্ষিত কাঁটাতারের ঘেরা বাড়িতে চুরি হয়ে গেল কেন? আর সেটা ঘটল রাত্রে নয়, দিনের বেলা, সে যখন বেরিয়েছিল মাত্র ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য। চুরি গেল অফিসঘরের ঘড়ি, আর টেবিল ফ্যানটা বনোয়ারিলালের সাইকেল আর সুজাতার স্যুটকেশ। সুজাতা বেশ জানে চোর যে জিনিসের খোঁজে এসেছিল তা সে পায়নি। পুলিশে খবরে দিতে ইচ্ছা ছিল না সুজাতার; কিন্তু আগরওয়াল ওর আপত্তিতে কান দেননি! থানায় ডায়েরি করিয়েছিলেন। থানার বড় দারোগা রমেন গুহ নিজে এসে তদন্ত করেছিলেন। দিনের বেলা এমন দুঃসাহসিক চুরি আগরওয়াল বরদাস্ত করতে চাননি। চোর অবশ্য ধরা পড়েনি, কিন্তু চোরাই মাল প্রায় সব কিছুই উদ্ধার করা গিয়েছিল। বনোয়ারিলাল তার সাইকেল ফেরৎ পেল, সুজাতাও ফেরৎ পেল তার তালাভাঙ্গা স্যুটকেশ। নগদ গোটা পঁচিশ টাকা ছাড়া সব কিছুই ছিল তাতে। চোরাই মাল হজম করা শক্ত হবে মনে করে রেল লাইনের ধারে সেটা নাকি চোরে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়। এটাই পুলিশের থিয়োরি, পাওয়া গেলনা শুধু অফিসের ঘড়িটা আর বৈদ্যুতিক পাখাটা।

আর যারই থাক সুজাতার তরফে এ ব্যাপারে কোন 'কেন' নেই। সে জানে চোর আসলে যা চুরি করতে এসেছিল তা পায়নি, কিন্তু এটা যে নেহাৎ একটা সাধারণ চুরির কেস, সেটা প্রতিপন্ন করতেই বেচারিকে এতগুলি জিনিস সরাতে হয়েছে। বোধকরি ময়ূরকেতন আগরওয়ালেরও 'বিবেক' বলে একটি বস্তু আছে, তাই বনোয়ারিলাল তার সাইকেল আর সুজাতা তার সুটকেশ ফেরত পেয়েছিল।

সুজাতা নেমে আসে দ্বিতল বাড়িটা থেকে। বারান্দার সামনে খানিকটা জমি মেদিপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা' বারান্দা থেকে কাঠের ছোট্ট গেট পর্যন্ত লাল কাঁকরের রাস্তা। দু পাশে ফুলের বেড়া। যদিও ফুল নেই তাতে। বাগানের ও প্রান্তে একটি করবী ও একটি শিউলি গাছ। বাড়ির পিছন দিকে গ্যারেজ, তার উপর আধতলায় বিশু দাসের আস্তানা।

পায়ে পায়ে সুজাতা উঠে যায় আধতলা পর্যন্ত। দরজাটা হাট করে খোলা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুজাতা প্রশ্ন করে—আসব?

বিশু একেবারে চম্‌কে যায়। নিয়োগকর্ত্রী যে এভাবে বিনা এত্তেলায়

একেবারে দোর গোড়ায় এসে হানা দেবেন আন্দাজ করেনি বেচারি। খালি গায়ে পায়জামা পরে খাটিয়ায় বসে একটা সার্টে বোতমে লাগাচ্ছিল বিশু। দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আপনি? খাটিয়ার উপর পড়ে থাকা একটা গামছা নিয়ে গায়ে জড়ায়, চওড়া লোমশ বুকটা ঢাকে।

সুজাতা শুধু ঘরের ভিতর ঢুকেই পড়েনি, একটা টুল টেনে নিয়ে বসেও পড়েছে। বলে, দেখতে এলাম, ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।

ডান হাতে সার্টটা ধরাই আছে। অভ্যাসবশে বাঁ হাতে ঘাড়টা চুলকে নিয়ে বিশু বলে, এমন চমৎকার ঘর, পছন্দ হবেনা? কি যে বলেন?

সুজাতা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। খাটিয়ার উপর বিশুর সতরঞ্চি মোড়া বিছানাটা গোটানো। ও পাশে তার লাল গোলাপফুল আঁকা টিনের সুটকেশ, জানালার উপর একটা কাঠের হাত আয়না, চিরুনি। মটোর গাড়ির কতকগুলি যন্ত্রপাতি স্তূপাকার করে রাখা আছে এক কোণায়, একটা বাতিল টায়ারও। বাগানে জল দেবার ঝারি, একটা হোস পাইপ।

: একটু বের হতাম, বলে সুজাতা।

:চলুন, এখনই আসছি। সার্টটা বিনা গেঞ্জিতেই গায়ে চড়ায়।

সুজাতা বলে, দাড়ি কামাওনি কেন?

গালের উপর আল্‌তো করে হাত বুলিয়ে বিশু বলে, বল্‌ছেন?

: বল্‌ছেন মানে? তুমি রোজ দাড়ি কামাও না?

: আগে রোজ কামাতাম। সেফ্‌টি রেজারটা হারিয়ে যাবার পর থেকে এখন হপ্তায় একদিন কামাই, সেলুনে গিয়ে।

: আর একটা সেফ্‌টি রেজার কিনলেই পার?

বিশু হাসে। ঝক্‌ঝকে একসার দাঁত বেরিয়ে পড়ে। বলে, এবার কিনব, মাইনেটা পেলেই। চলুন।

সুজাতা উঠে পড়ে। চল্‌তে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। বিশুর দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে, ও কি বোতাম লাগানো হল? তিনটে সাদা বোতাম, আর একটি খাঁকি রঙের?

আবার হাতটা ঘাড়ের কাছে চলে যায়। লাজুক লাজুক মুখে বলে, সাদা বোতাম ছিলনা আর।

: তাহলে অন্য একটা সার্ট পরে নাও।

বিশু জবাব দেয় না। মিটিমিটি হাসে আর ঘাড় চুলকায়।

: শার্টও কি ঐ একটাই ? মাইনে পেলে বুঝি সাদা বোতাম কিনবে ?

: আজ্ঞে না, বোতাম আজই কিনব। বোতাম কেনার পয়সা আছে।

: আছে ? তবে তো তুমি বড়লোক। নাও, চল।

গাড়ি কিন্তু বিশু দাস ভালই চালায়। কোন তাড়াহুড়া নেই। ব্রেকে বারে বারে পা দেয় না। এ্যাকসিলেটারের উপর চাপ বাড়িয়ে কমিয়ে নিয়ে এল গাড়িটা জীমূতবাহনের বাড়ির সামনে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সসম্ভ্রমে সুজাতার পিছনের আসনের নিষ্ক্রমণদ্বার খুলে দিয়ে বলে, আমি ঐ ছায়ায় গাড়িটা রাখছি।

বাইরের ঘরে জীমূতবাহন নেই। ঘরটা ফাঁকা। বাইরের ঘরে বসে আছে অরূপরতন। জীমূতবাহন মহাপাত্রের বড় ছেলে। বেতের চেয়ারে বসে কি একটা সাপ্তাহিক দেখছিল। সুজাতাকে দেখতে পেয়ে বইখানা রেখে এগিয়ে আসে। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে, সুপ্রভাত। এত দেরী হল যে আপনার।

সুজাতা একটু হেসে বলে, আপনি যে আমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন তা তো জানতাম না।

অরূপও হেসে বলে, সেইটাই তো ট্র্যাজেডি সুজাতাদেবী। যে প্রহর গণে সে খেয়াল করে না অপরপক্ষকে রীতিমত উকিলের নোটিশ না-দেওয়া থাকলে তার ধারণা হয় না যে তার জন্য কেউ পথ চেয়ে বসে আছে।

—বাজে কথা রেখে বলুন, আপনার বাবা কোথায় ? তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে।

—জানি। কাজের কথা ছাড়া আপনি তো কিছুই ভাবতে পারেন না। তা সেই কাজের কথা যিনি বলবেন, তিনি আমাকে জানিয়ে গেলেন যে আপনি আসছেন। আমার উপর আদেশ হয়েছে আপনাকে আপ্যায়ন করে বসাতে। সুতরাং আপনি দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

আর একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে সুজাতা বলে, এটা তো হল নিছক আদেশ তামিল করা, কিন্তু পিতৃদেব কি এ আদেশ দিয়ে যান নি যে তাঁর অনুপস্থিতিকালে দু'টো হাল্কা কথা বলে আমার সঙ্গে সময় কাটাতে ?

অরূপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, না সে জাতীয় কোন নির্দেশ আমায়

উপর দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমি ঠিক ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত অক্ষরে অক্ষরে পিতার নির্দেশ নাও মেনে চলতে পারি। যদি অনুমতি করেন, দু-পেয়ালা কফির ফরমায়েস করি এবং আলাপচারিতে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করি।

—আমি খুশীই হব তাতে, বললে সুজাতা।

অরূপ এক পট কফির আয়োজন করতে বলল একজন ভৃত্যকে।

সুজাতা বলে, আপনার নতুন প্র্যাকটিশ কেমন চলছে বলুন?

হাতদুটি জোড় করে অরূপরতন বলে, আপনিও ঐ প্রশ্নটা করে বসলেন? ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া আর যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই যে আমি তৈরী হয়ে বসেছিলাম—

ওর ভঙ্গি দেখে সুজাতা হেসে ফেলে, বলে, কেন? এ প্রশ্নটাতেই বা অত বিব্রত হবার কি আছে?

—তা আছে। প্রথমতঃ সত্যভাষণ করতে হলে সেটা আমার পক্ষে খুব কিছু গৌরবের হয় না, দ্বিতীয়তঃ আপনার কাছে অনৃতভাষণে সঙ্কোচ হচ্ছে, তৃতীয়তঃ যে কটা কেস পেয়েছি তা স্বনামধন্য পিতার পুত্র হিসাবেই পেয়েছি, উদীয়মান আইনজীবী হিসাবে নয়। এসব কথা বাইরের লোকের কাছে স্বীকার করিনা, কিন্তু—

সুজাতা বলে, কিন্তু আমিও তো বাইরের লোক। না হয় আমার কাছেও ওসব কথা গোপন রাখতেন?

অরূপ একটু ভেবে নিয়ে বলে, সেটা আবার আমার দ্বিতীয় নম্বর ট্র্যাজেডি।

—বুঝলাম না।

—প্রথমতঃ আপনি বাইরের লোক এটা মনে করে নিতে কষ্ট হয়, দ্বিতীয়তঃ আপনার কাছে কোন্ কথাটা গোপন করব, আর কোন্টা করব না, অর্থাৎ কোনটা আপনার কাছে আমার গোপন কথা—

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, আপনার তো জবর প্র্যাকটিশ জমে যাওয়া উচিত। সব বক্তব্যের পিছনেই দেখছি আপনার একাধিক যুক্তি থাকে। সব কথাতেই আপনি প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, করে যেভাবে যুক্তি খাড়া করছেন—

অরূপও হেসে ফেলে, বলে, এবার তাহলে নেহাৎ অযৌক্তিক একটা কথার অবতারণা করি, অনুমতি করুন।

—বলুন।

—আপনি আমাকে একটা বিষয়ে সাহায্য করবেন ?

—কি বিষয়ে ?

—একটু ভূমিকা করি। আপনি জানেন এ বৎসর উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যায় প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ জাতীয় প্লাবনে সর্বস্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এটুকুই আমরা জানি। কিন্তু প্লাবনের একটা আশীর্বাদও আছে। শুধু পলিমাটিই নয়, এ বন্যা নিয়ে আসে আমাদের মত দূর মফঃস্বলের মানুষদের জন্য কিছু সেবা করবার দুর্লভ সুযোগ। বন্যার্তদের জন্য প্রচুর অশ্রুপাত এবং প্রচুরতর বক্তৃতার আয়োজন না করে আমরা কিছু অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা করছি কিন্তু শুধু চাঁদার খাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ধর্ণা দিলে এ যুগে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করা যায় না তাই আমরা একটা নাটক মঞ্চস্থ করব বলে স্থির করেছি। দুর্জনে বলছে বটে যে জীমূতবাহন মহাপাত্র মশাই খবরের কাগজে নিজের নামটা ফলাও করে ছাপাতে এবং এ্যাসেম্ব্লিতে আসনটা পাকা করবার শুভবুদ্ধিতে একাজে নেমেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের আসল উদ্দেশ্য তা নয়। আমরা ওঁকে কমিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার একমাত্র কারণ ওঁর মাধ্যমে ব্যবসায়ী মহলে সামনের দুটি রো-র সমস্ত আসন একশ টাকার টিকিট বেচতে পারব বলে। এ কাজ আসলে তাঁর নয়, আমাদের ; আমার এবং আপনার।

সুজাতা বলে, ভূমিকা তো হ'ল, এবার আসল কথাটা। আমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে হবে, টিকিট কিনতে হবে, না বেচতে ?

—না, না, না! কেনাবেচার হাটে বাজারে আসতে হবেনা আপনাকে। ও কাজ আপনার নয়। আপনার সাহায্য আমরা সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে চাইছি। এ মফঃস্বল শহরে, বুঝতেই পারছেন, মহিলা শিল্পী আমরা সুবিধামত পাচ্ছি না। নাটকে চারটি স্ত্রীচরিত্র। তার একটি আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

—ওরে বাবা! প্রায় লাফিয়ে ওঠে সুজাতা, বলে—অভিনয় আমি জীবনে করিনি ; ও আমার দ্বারা হবে না!

—আর যাকে হ'ক, আমাকে ও কথা বিশ্বাস করতে বলবেন না। মঞ্চে অভিনয় হয়তো আপনি করেন নি কিন্তু ও কাজ আপনার দ্বারা হবেনা, এটা অবিশ্বাস্য! আপনাকে আমি যতটুকু জেনেছি—

—কতটুকু জেনেছেন আমাকে ?

অরূপ গম্ভীর হয়ে বলে, দেখুন সুজাতা দেবী মানুষকে জানার তো কোন মাপকাঠি নেই। তার কোন য়ুনিট নেই। পঞ্চাশ বছর ঘর করার পরেও যদি কোন মহিলা তাঁর বৃদ্ধ স্বামীকে ঐ মোক্ষম প্রশ্নটি করেন তাহলে তাঁকেও স্বীকার করতে হবে যে 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্' সুদুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঘেরা। কিন্তু কথা তো তা নয়, অন্ন পরিপক্ক হয়েছে কিনা জানবার জন্য অন্নপাত্রের তলদেশ পর্যন্ত কি দেখার কোন প্রয়োজন আছে ?

—আমার যে গলাই উঠ্‌বেনা।

—ক্ষতি নেই তাতে। জিরাফের মত গলা না হলেও চলবে আমাদের। আমরা মাইক্রোফোনের আয়োজন করেছি। মাইক-প্লে ছাড়া আমাদের কারও গলা অতটা উঠ্‌বে না। হাজারের উপর লোক হবে অডিটোরিয়ামে।

—অত লোকের সামনে আমি যদি ঘাবড়ে যাই ?

—আপনি না করতে চান, বলুন 'করবনা', 'পারবনা' বলবেন না। ইচ্ছে করলে দু-চার হাজার লোকের সামনে আপনি এক্সটেম্পোর বক্তৃতাও যে দিতে পারেন এটুকু আমি নিশ্চিত জানি।

—আমার সম্বন্ধে এমন সব আজগুবি ধারণা আপনার হল কেমন করে বলুন তো ?

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে অরূপ। তারপর সিগারেটের দগ্ধপ্রায় অংশটার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, আমি জানি ! এ বিংশ-শতাব্দীতে জোয়ান-অফ-আর্ক, বা ঝাঁসির রাণীর সম্ভাবনা অল্প; কিন্তু সুযোগ পেলে আপনি ঐ রকমই কিছু হয়ে উঠতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস।

সুজাতা একটু লাল হয়ে ওঠে, তাই লজ্জাটা গোপন করবার জন্যে অকারণে হো হো করে হেসে ওঠে।

অরূপরতন কিন্তু হাসে না। একই সুরে বলে, এ রণাঙ্গনে আমার ভূমিকা দর্শক মাত্র; কিন্তু দুই প্রচণ্ড শক্তিধর যোদ্ধাকে যে ভাবে আপনি ভূতলশায়ী করছেন, তাতে আমি আর নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারছি না, আমি আপনার অন্ধ-ভক্ত হয়ে পড়েছি।

জোড়া ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হয়ে যায় সুজাতার, বলে—আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। রণাঙ্গনই বা কোনটা, যুগল যোদ্ধাই বা কে ?

—বোঝাবার চেষ্টা আমি করব না, কারণ বুঝতে আপনি ঠিকই

পেয়েছেন। এই সঙ্গে শুধু নিবেদন করে রাখতে চাই, যদি কখনও কোন সাহায্যের জন্ম আমাকে প্রয়োজন হয়, অসঙ্কোচে আমাকে স্মরণ করবেন। আপাতদৃষ্টিতে আপনার হয়তো মনে হতে পারে আমি নির্দলীয় নই; সেটা আংশিক সত্য মাত্র। আমি নির্দলীয় নই এই অর্থে যে আমি আপনার দলে।

—এতক্ষণে আপনি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন!

—উপায় নেই সুজাতা দেবী, আপনি স্বীকার না করলে আমাকে বাধ্য হয়েই ভাববাচ্যে কথা বলতে হবে। যদি কোনদিন খোলা খুলি আলোচনা করতে চান, আমাকে তলব করবেন। কিন্তু না, এ প্রসঙ্গে আপনি বিব্রত বোধ করছেন, সুতরাং একথা থাক। আমার প্রস্তাবটার কথাই হ'ক, বলুন একটা চরিত্র অভিনয় করতে রাজি আছেন?

—বেশ, যদি আমার দ্বারা সম্ভবপর হয়, ছোটখাটো পার্ট দেবেন একটা, চেষ্টা করে দেখব।

—ছোটখাটো পার্ট তো নেই, স্ত্রীচরিত্র চারটি। মায়ের চরিত্র ঠিক হয়ে গেছে, পুত্রবধূ-প্রমীলা এবং বসন্তের স্ত্রী রেখার চরিত্রেও দু'জনকে নির্বাচন করেছি আমরা। আসলে নায়িকার চরিত্রেই উপযুক্ত লোক পাচ্ছি না আমরা।

—বইটা কী?

—অনভিনীত নাটক একটা। নাম 'অকাল বসন্ত'। পাণ্ডুলিপি থেকে অভিনয় হবে। ছাপা বই নেই।

—কার লেখা?

বিচিত্র হেসে অরূপরতন বলে, নবীন নাট্যকার একজন, এটাই তাঁর লেখা প্রথম নাটক।

সুজাতা হেসে বলে, আপনি উকিল হয়েও জেরার জবাব দিতে শেখেন নি। প্রশ্ন ছিল নাটকটা কার লেখা, আর জবাবে বলছেন, নাট্যকার নবীন, এটাই তাঁর প্রথম নাটক।

—নাট্যকারের নাম অরূপরতন মহাপাত্র!

—আচ্ছা! তাই এত কুণ্ঠা! আপনি নাটক লেখেন? খুব ইন্টারেস্টিং খবর তো! মোটামুটি বিষয়বস্তুটা কি? স্যোসাল ড্রামা?

—হ্যাঁ, সামাজিক নাটক। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের। পরিবারের একমাত্র

উপার্জনক্ষম মানুষটির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নাটকের পটোত্তলন হচ্ছে। সত্তোবিধবার তিনটি সন্তান। বড় মেয়ে কলেজে পড়ে, সেই নায়িকা। ছোট দুটি ভাই বোনকে মানুষ করতে সে কলেজ ছেড়ে উপার্জনের আসরে নামল। কাদায় বসে যাওয়া সংসারের চাকাটা আবার চলতে শুরু করে। ভাইবোন আর বিধবা মায়ের কাছে সেই বড় মেয়েই হল আশীর্বাদ। নায়ক বসন্তও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তার সঙ্গে নায়িকার পূর্বরাগের পালাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছিল, কিন্তু বসন্তকে এই নতুন পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হল নায়িকা। এ অবস্থায় মেয়েটি বিয়ে করতে পারল না। নায়কও দুরন্ত অভিমানে সরে গেল দূরে। মা বুঝলেন, ছোট বোনও বুঝল, কিন্তু উপায় নেই। আত্মত্যাগের মহিমায় সে সংসারে মেয়েটি দেবীর পর্যায়ে উন্নীত হল প্রায়। সবাই তার অন্ধ ভক্ত। তিল তিল করে দীপের মত নিজেকে জ্বালিয়ে, ধূপের মত নিজেকে পুড়িয়ে সে খাড়া করে তুলল সংসারটাকে। মা গত হলেন। ভাইবোনরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠল, তারা দুজনেই ক্রমে বিয়ে করল। ততদিনে নায়িকার যৌবন গত হয়েছে। বিয়ের প্রশ্ন আর ওঠেনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার দৃষ্টিশক্তিও গেছে। চল্লিশ বছর বয়সেই সে প্রায়-অন্ধ। তখনকার সে-সংসারের সে একটা বোঝা মাত্র। এতদিন যে ছিল সংসারের মূলকাণ্ড আজ সে পরগাছা; জগদ্দল বোঝা ছাড়া কিছু নয়। ইতিমধ্যে বসন্তও প্রৌঢ় হয়েছে, বিয়ে-থা করে সংসারে বসে গেছে। ছেলে মেয়েরাও বড় হয়েছে তার। ঘটনাচক্রে প্রথম যৌবনের বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্রৌঢ় বসন্তের। অন্ধ মেয়েটির প্রতি স্বতঃই করুণা হল তার। স্ত্রী রেখার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা না করেও সে সহানুভূতির সুরে নায়িকার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল আবার। সমাজ সেটা বরদাস্ত করেনা। ভাই বোনের মনে হয় বড়দির বুড়োবয়সে ঘোড়া রোগ হয়েছে। বসন্তের স্ত্রী অপর্ণাকে তারা সমর্থন করে, এবং সেই সমর্থনের জোরে বসন্তের স্ত্রী অপর্ণা একদিন মেয়েটিকে অপমানের চূড়ান্ত করে গেল। সকলের কাছ থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে নায়িকা বুঝতে পারে এ দুনিয়ায় তার ভূমিকা শেষ হয়েছে। এখন বেঁচে থাকার অর্থ প্রাণ ধারণের গ্লানি। একদিন বসন্ত তার জীবনে এসেছিল, সেদিন সে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি, আর যখন সে প্রস্তুত হল তখন বসন্ত তার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। এটাই নাটকের ট্র্যাজেডি—যদিও দৃশ্যত নাটকের যবনিকা পড়ছে নায়িকার আত্মহত্যায়।

তার মৃত্যুর জন্ম কেউ দায়ী নয়, এই স্বীকারোক্তি লিখে মেয়েটি সংসারের বোঝা হাল্কা করে দিয়ে যায়।

—বুঝলাম। নায়িকার নামটা কিন্তু আপনি বলেন নি।

অরূপরতন আবার লাজুক লাজুক মুখে বলে, নাট্যকারের নামটা জানাতে যতটা কুণ্ঠা হয়েছিল এবার কিন্তু তার চেয়েও বেশী লজ্জা পাচ্ছি আমি।

—এ আবার কি রহস্য?

—আমার নায়িকার নাম,...মানে আমার নাটকের নায়িকার নাম, সুজাতা।

লজ্জা সুজাতা পেতনা, যদি না এভাবে অরূপ মাঝপথে নিজেকে সংশোধন করে নিত। তবু সে সঙ্কোচ এড়িয়ে বলে—এতে এত কুণ্ঠার কি আছে? এ তো কাকতালীয় ঘটনামাত্র। হয় তো আমার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই এ নাটক লিখেছিলেন আপনি।

—কুণ্ঠা তো সেখানেই। সেটা সত্যি কথা নয়। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পরেই নাটকটা লেখা হয়েছে।

হো হো করে হেসে ওঠা ছাড়া আর কোন কথা খুঁজে পায়না সুজাতা।

ভৃত্য কফির সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জীমূতবাহন এসে উপস্থিত হন। সুজাতা যে কফির কাপটা এই মাত্র ভর্তি করেছে সেটা বাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে অরূপ উঠে দাঁড়ায়।

—কি হল, উঠছিস কেন? বস্‌না। জীমূতবাহন ঘরোয়া হতে চান।

—না, আমাকে এখনি একবার বের হতে হবে। জরুরী কাজ আছে। সুজাতার দিকে ফিরে বলে, আপনাকে ফোন করে জানাব কখন আমাদের রিহার্সাল। আচ্ছা চলি—

অরূপরতন চলে যাবার পর জীমূতবাহন কফির কাপটায় চুমুক দিয়ে বলেন, তুমিও কি ঐ থিয়েটারে মেতেছ নাকি?

—কাজটা তো ভাল। আর আপনিই তো এর প্রধান উদ্যোক্তা।

—হ্যাঁ, শিখণ্ডী যেমন ছিল দ্রোণবধের প্রধান উদ্যোক্তা।

—আপনি কাজের কথা তখন ফোনে কি যেন বলছিলেন?

—হ্যাঁ, কাজের কথা। আমি জানতে চাইছিলাম, তোমরা কারখানাটা বড় করছ না কেন? প্রডাকসান বাড়াবার চেষ্টা করছ না কেন?

সুজাতা যেন তৈরী জবাব মুখস্ত বলে যায়, দশজনের বেশী কর্মী সংখ্যা

দেখালেই আমাদের 'ফ্যাক্টারি ল'-য়ের আওতায় আসতে হবে। ছয়দিন কাজ করিয়ে সাতদিনের মাইনে দিতে হবে সবাইকে। ওয়ার্কার্স ইন্সুরেন্স পলিসি খুলতে হবে সবার নামে। আরও কত কি খাতা পত্র রাখতে হবে। পুরোপুরি কোম্পানি খোলার আগে কি আমার একার পক্ষে এতসব হিসাবের ঝামেলায় মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে?

জীমূতবাহন পাইপে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বলেন, দেখ সুজাতা, হাত লুকিয়ে খেলতে হয় বলে তাশ আমি খেলিনা। সারা জীবন খোলা মনে খোলা কথা বলে এসেছি। সেজন্য আমাকে কারাবাসও ভোগ করতে হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমি খোলাখুলি কথা বলতে চাই। তুমি যদি এবিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে না চাও আমি আপত্তি করব না, দুঃখিতও হব না। কিন্তু যদি এটা আমরা আদৌ আলোচনা করি, তাহলে তুমি আমি দুজনেই খোলাখুলি আলোচনা করব। রেখে ঢেকে কথা বললে চলবে না। এখন তুমি বল, তুমি কি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আদৌ আলোচনা করতে চাও?

—তাই করতেই তো এসেছি। রেখে ঢেকে কোন কথা তো আমি বলছি না।

—বলছ! কেন পেটেন্ট নেওয়া হচ্ছেনা, কেন প্রডাকসান্ বাড়ানো হচ্ছে না, কেন কোম্পানি ফ্লোট করতে তোমাদের দেরী হচ্ছে—এর একটা কথাও তুমি আমাকে বলনি, বলছ না। যদি এটা মামুলি কোন ব্যাপার হত, আমি নাক গলাতে যেতাম না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তোমার বাবা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে গেছেন। তাঁর সে আবিষ্কারের সুফল যদি দেশ বা জাতি না পায় তার চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হতে পারেনা। দেশের সেবা আমি আজীবন করে এসেছি, আমি সব জেনে শুনে তা হতে দিতে পারি না। একথাও যেমন সত্য, তেমনি তোমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করলে আমি নীরব দর্শকের ভূমিকায় তা সহ্য করতে পারিনা। আমার স্বার্থ শুধু এটুকুই।

—সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি।

—তুমি কি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পার?

—আমার বাবা আমাকে যতটা বিশ্বাস করতেন তার কম নয়।

—বেশ, তাহলে বল ডাঃ চ্যাটার্জির কাগজগুলো কি আগরওয়াল পেয়েছে?

—না!

—সেগুলো তোমার কাছেই আছে?

—হ্যাঁ।

—সেগুলো কি বেহাত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে?

—বলা শক্ত। আমি যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছি।

—কাগজগুলো কি ঐ বাড়িতেই আছে?

সুজাতা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—আপনি সত্যিই কি এ প্রশ্নের জবাব জানতে চান?

একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জীমূতবাহন বলেন, চাই বইকি সুজাতা! তুমি তো সব কথাই খোলাখুলি আলোচনা করবে বলেছ।

—এবং এর পরেও যদি আপনি প্রশ্ন করেন, 'কাগজগুলি এখন কোথায় আছে' তাও বোধকরি সর্ত অনুযায়ী আমার বলে দেওয়া উচিত হবে?

জীমূতবাহন একটু থতমত খেয়ে যান। সামলে নিয়ে বলেন, কিন্তু তুমিই তো তখন বললে যে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর—

—তা বলিনি স্যার, আমি বলেছি, আমি আপনাকে ততখানিই বিশ্বাস করি, যতখানি আমার বাপি আমাকে করতেন। একটা ঘটনা বলি, বাপিকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, সিগার-ব্লককে জোড় লাগাবার জন্য যে ক্যাটালিটিক এজেন্টটা ব্যবহার করছেন সেটা আসলে কী! উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কৌতূহল জিনিসটা ভাল, অহেতুক কৌতূহলটা নয়!

হঠাৎ কেমন যেন অপমানিত বোধ করেন জীমূতবাহন। বেশ একটু রাগত ভাবেই বলেন, অর্থাৎ রিপোর্টটা ও বাড়িতে আছে কিনা জানতে চাওয়া আমার পক্ষে অহেতুক কৌতূহল!

সুজাতা হেসে বলে, অহেতুক কৌতূহল নিশ্চয়ই। কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিশ্চয় আপনি ওটা জানতে চাইছেন না।

—সে কথা মনে করছ কেন? উদ্দেশ্য নিশ্চয় কিছু আছে!

—কী সেই উদ্দেশ্য?

—তুমি কি আমার কৈফিয়ৎ চাইছ?

সুজাতা দিব্যি হেসে হেসে বলে, কী আশ্চর্য! সর্ত হয়েছে আমরা দুজনেই খোলাখুলি কথা বলব। আলোচনা মানে এ নয় যে, আপনিই এক তরফা সওয়াল করে যাবেন এবং আমি জবাব দিয়ে যাব!

জীমূতবাহনের মনে হল মেয়েটি ওকালতি পড়লে অরূপরতনের চেয়ে তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিশ জমাতে পারত। গলাটা সাফা করে নিয়ে বলেন, আমার উদ্দেশ্য জেনে নেওয়া যে কাগজগুলো বেহাত হয়ে যাবার কোন আশঙ্কা আছে কিনা।

সুজাতা বলে, কাগজগুলো অত্যন্ত গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। না হলে ইতিপূর্বেই তা চোরের হাতে চলে যেত। জানেন নিশ্চয়, ও বাড়িতে ইতিমধ্যেই একদিন দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গেছে।

—জানি। তাই তো জানতে চাইছি, কাগজগুলো আগরওয়ালের হাতে পড়েছে কিনা।

—না পড়েনি।

জীমূতবাহন বার কয়েক চুরুটে টান দিয়ে বলেন, বেশ ধরে নিলাম তোমার কথাই সত্যি। সেগুলো সংরক্ষিত আছে। এখন তুমি কি করতে চাও? ও কাগজগুলো চিরকাল লুকিয়ে রেখে তোমার কিছু লাভ হবে না, নিজেও তুমি পেটেণ্ট নিতে পারবে না। কোন বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিকের সাহায্য তোমাকে নিতেই হবে। সে বিষয়ে তুমি কি করছ?

সুজাতা বুঝতে পারে, জীমূতবাহন বুঝতে পেরেছেন—কাগজপত্রগুলি কোথায় আছে তা সুজাতা জানাতে চায়না। লেবু বেশী কচকালে তেতো হয়ে যায় এ সত্য তাঁর জানা আছে। তাই ও প্রশ্ন আর করলেন না। সুজাতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন?

—আমি তো তোমাকে কোন পরামর্শ দেব না সুজাতা। তোমার সামনে দুজন ব্যক্তি আছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। শুধু তোমাকেই। অজানা অচেনা তৃতীয় পক্ষের দ্বারস্থ হওয়া এ অবস্থায় তোমার পক্ষে উচিত হবে না। ফলে যে-দুজন সম্ভাব্য ক্যাণ্ডিডেট আছেন তাঁদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। তাদের অতীত ইতিহাসকে জেনে নিয়ে তোমাকেই মনস্থির করতে হবে। কাকে বিশ্বাস করবে সে তোমার বিবেচ্য।

—আমি কিন্তু তার তৃতীয় পক্ষেরই দ্বারস্থ হব বলেই স্থির করেছি।

চমকে ওঠেন জীমূতবাহন—বলেন, এখন তৃতীয় পক্ষ? মানে? সে আবার কে?

—কে তা জানি না। তবে আপনি বা আগরওয়ালা নয়!

জীমূতবাহন যেন ভাষা খুঁজে পাননা প্রথমটায়। তারপর ঢোঁক গিলে বলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!

—বলছি। আপনি খুব খোলাখুলি বলতে বলেছেন, তাই খোলাখুলিই বলছি আমি! আগরওয়ালের চেয়ে আপনাকে অনেক অনেক বেশী বিশ্বাস-যোগ্য মনে করি আমি। আপনি শুধু অতীত ইতিহাসটা যাচাই করে দেখতে বলেছেন—তাই যদি দেখতাম, তাহলে মনস্থির করতে আমার সময় লাগত না, কিন্তু মাপ করবেন স্যার, অতীত ছাড়া বর্তমানটাকেও যে আমি ওজন করে দেখছি! আজ আপনার পরিচয় শুধু দেশসেবক নয়, আপনি দেশনেতা —প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী! আমি স্থির করেছি একজন খুব বিশ্বস্ত এ-ক্লাস সলিসিটার্স ফার্মকে আমার সমস্যাটা জানাব। তাঁরা যে ভাবে পরামর্শ দেন সেই ভাবে অগ্রসর হব আমি—

জীমূতবাহন রাজনীতিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কথা বেচে খাচ্ছেন আজকাল। মুহূর্তমধ্যে তিনি ভোল পালটে পেলেন। সুজাতার স্থূল ইঙ্গিতের সূক্ষ্ম খোঁচাটা তাঁর অন্তরে বিঁধেছিল ঠিকই, তাই যেন তা বুঝতেই পারেন নি এ ভাব বজায় রেখে হঠাৎ একেবারে খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। সর্বান্তঃকরণে তাকে সমর্থন করে বলে ওঠেন, খুব ভাল কথা! আমি খুব ভাল একজন সলিসিটারকে খবর দিচ্ছি। মিস্টার দত্ত বার এ্যাট-ল মানে যাঁর জুনিয়ার হিসাবে অরূপ কাজ শিখেছে, আমি লিখলেই—

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, না না, তাঁকে আর কষ্ট দিতে হবে না। আমি নিজেই আমার সলিসিটার খুঁজে নেব—

ঐ একফোঁটা মেয়েটার কাছে প্রতি চালেই বাধা পেয়ে ধৈর্য রাখতে পারেন না ধুরন্ধর ব্যবসায়ী জীমূতবাহন মহাপাত্র, বলেন—তুমি যখন আমাকে বিশ্বাসই করনা, তখন আমার কাছে এলে কেন?

সুজাতা বলে, আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই এসেছি। এসেছি কেন? এসেছি আপনার কাছ থেকে একটি পরিচয় পত্র লিখিয়ে নেব বলে।

—পরিচয় পত্র? কার নামে? কি উদ্দেশ্যে?

—'টু হুম ইট মে কন্সার্ন' বলে লিখে দিন। আমি কালপর্শুর মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কোন নামকরা সলিসিটার্স-ফার্ম আমাকে পাত্তাই দেবেনা। আমার বিষয় আশয়, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কিছুই

নেই। বাপির আবিষ্কারের কথাটা তারা হয়তো আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে। আপনার ইন্ট্রোডাকসন থাকলে আমি অন্ততঃ আমার বক্তব্যটা পেশ করার একটা সুযোগ পাব।

জীমূতবাহন গূঢ় হাসি হেসে বলেন, কিন্তু আমি কোন স্বার্থে তোমাকে এই পরিচয় পত্র লিখে দেব, তাতো বললে না সুজাতা?

—আপনার তো একটিই স্বার্থ আছে। এখনই আপনি বলেছেন তা। বাপির আবিষ্কারটা যাতে চিরকাল বাক্স বন্দী হয়ে না থাকে, আর আমাকে কেউ যেন না ঠকিয়ে নিতে পারে। এ ছাড়া তো আপনার আর কোন স্বার্থ নেই? তাই বললেন না তখন? না কি ভুল বুঝেছি আমি?

জীমূতবাহন বিনা বাক্যব্যয়ে লেটার-হেড প্যাডখানা টেনে নেন।

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে সুজাতা দেখে বারান্দার প্রান্তে সেই বেতের চেয়ারখানায় বসে অরূপরতন আগের মতই সিনেমা সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাচ্ছে। সুজাতাকে দেখতে পেয়ে বই রেখে এগিয়ে আসে। সুজাতা হেসে বলে, আপনার ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে সেই একই কথা বলবেন আবার?

—একই কথা মানে?

—'এত দেরী হল যে আপনার? সেই কখন থেকে বসে আছি!'

দুজনেই হেসে ওঠে।

অরূপরতন বলে, আপনি তো বেশ থট-রিডিং জানেন!

—তা তো জানি, কিন্তু আপনি যে তখন আপনার বাবার কাছে বললেন, আপনার কি জরুরী কাজ আছে?

—জনান্তিকে আপনার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য বসে থাকাটা কি জরুরী কাজ নয়?

পায়ে পায়ে ওরা বারান্দা অতিক্রম করে নেমে পড়ে বাগানে। লাল কাঁকরে পথটা পার হয়ে এগিয়ে আসে গাড়ির দিকে। ড্রাইভার বিশু দাস দরজা খুলে দেয়। সুজাতা উঠে বসে, পিছনের সীটে। মুখ বাড়িয়ে কি একটা কথা বলতে যায়, তারপর থেমে গিয়ে লক্ষ্য করে অরূপরতন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিশু দাসের দিকে। অরূপই প্রথম কথা বলে, বিশু দাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

বিশু চমকে পিছন ফিরে তাকায়। কথা বলে না।

সুজাতাই জবাবে বলে—ও আমাদের ড্রাইভার, বিশু। বিশ্বনাথ দাস।

অরূপ বিশুকেই প্রশ্ন করে, আপনি ক্রিকেট খেলতেন?

বিশু বোকার হাসি হাসে বলে, আমাকে আবার 'আপনি' কেন স্যার? আপনি আর কারও সঙ্গে আমাকে ভুল করেছেন। ডাংগুলি আর চোর চোর ছাড়া আর কোন খেলা জানি না আমি।

—আপনার নাম বিশ্বনাথ দাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অভ্যাসে ওর হাতটা ষ্টিয়ারিং ছেড়ে ঘাড়ের কাছে চলে যায়।

—আপনি আর কারও সঙ্গে ভুল করছেন—বলে সুজাতাও।

অরূপরতন তবু হাল ছাড়ে না। বলে, আচ্ছা আপনার কোন ভাই কি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেন? কী নাম মিত্র?

ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বিশু বলে, আজ্ঞে না। আমরা কায়েৎ নই। মিত্তিরদের সঙ্গে আমাদের বে-থাই হয় না।

সুজাতা এ পরিচ্ছেদের যবনিকা টানতেই বোধকরি বলে ওঠে—কখন আপনাদের রিহার্সাল হবে আমাকে টেলিফোনে জানাবেন—

অরূপরতন জবাব দেয় না। সে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

জীমূতবাহনের কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে বিশু দাস বলে—সোজা বাড়িই যাবেন তো?

—না পোষ্ট অফিসে চল একটু।

পোষ্ট অফিসে গাড়ি থেকে নেমে রেজিস্ট্রেসন অফিসের দিকে যেতেই একটি সুদর্শন ছেলে হাত তুলে তাকে নমস্কার করে বলে, শুধু শুধু আপনি খোঁজ নিতে আসেন। আপনার টেলিফোন নাম্বার আমার লেখা আছে। রেজিস্ট্রেসনটা এলেই আপনাকে ফোন করব আমি।

—পিয়নের হাতে পাঠাবেন না যেন।

পাঁচশ' টাকার ইনসিওর্ড প্যাকেট পিওন ডেলিভারি দেয় না।

—সে তো সেদিনই বললেন। নোটিশও দেবেন না, শুধু ফোনে আমাকে জানাবেন।

—ঠিক আছে।

পোষ্ট অফিস থেকে বেরিয়ে আবার গাড়িতে উঠে বলে, বাজারে যাব একটু। ভ্যারাইটি স্টোরসের সামনে একটু রেখ।

বড় মণিহারী দোকানটার সামনে গাড়ি রেখে বিশু দরজা খুলে দেয়। সুজাতা বলে, গাড়ি লক করে তুমিও এস।

—আমি ? আমি আপনার সঙ্গে দোকানে আসব ?

—আসবেনা ? আমি কি জানি কোন সেফ্‌টি-রেজার-সেট ভাল ? কত ইঞ্চি কলারের সার্ট তোমার গায়ে লাগবে ?

একগাল হাসলে বিশু দাস।

॥ বার ॥

পাঁচটার মধ্যেই সুজাতা তৈরী হয়ে নিচে নেমে আসে। রিহার্সাল শুরু হবে সাড়ে ছয়টায়। সেটা হবে জেলা-সমাহর্তা ঘোষ সাহেবের বাড়িতে। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব নিজে নাট্যামোদী মানুষ, যদিও নিজে কোন চরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন না। কিন্তু তাঁর মেয়ে প্রণতি ঘোষ করছে সুজাতার ছোট বোন সুলতার চরিত্র। তাই মহড়ার আয়োজন হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের বাঙলোতে। কথা ছিল, সুজাতা যাওয়ার পথে অরূপরতনকে তুলে নিয়ে যাবে। সে জন্য একটু সকাল করেই নেমে আসে সুজাতা।

গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করা আছে; কিন্তু বনেটটা বিরাট মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশু হুমড়ি খেয়ে পড়ে যন্ত্রপাতি দেখছে।

—কী হল ? গাড়ি গড়বড় করছে নাকি ?

—না স্যার, নতুন গাড়ি, গড়বড় করবে কেন ? রেডিয়েটারে একটু জল দিতে হবে। নেংটি জল আনতে গেছে। বসুন না।

সুজাতা লক্ষ্য করে দেখে বিশু দাস আজকে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়েছে। গায়েও চড়িয়েছে পাট ভাঙা নতুন সার্ট। পিছনের দরজার পাল্লাটা খুলে দেয় বিশু দাস। সুজাতা কিন্তু ওঠে না। মাডগার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট আয়নায় মুখটা দেখতে থাকে, খোঁপাটি ঠিক করে।

পিছন থেকে বিশু বলে, একটা কথা; আপনাকে কি বলে ডাকব ?

আয়নার ভিতরে তাকিয়ে মুখ না ঘুরিয়েই সুজাতা বলে, আর পাঁচজনে যে নামে ডাকে সেই নামেই ডাকবে। আমাকে ডাকবার জন্য তোমার আবার নতুন নাম চাই নাকি ?

বিশু যেন মরমে মরে যায়। অভ্যাস বশে হাতটা চলে যায় ঘাড়ের কাছে। বলে, আজ্ঞে না, তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মানে, আর পাঁচজনে তো

আপনাকে ডাকে সুজাতাদেবী বলে। কেউ কেউ বলে মিস্ চ্যাটার্জি। তা আমি হলাম গিয়ে আপনাদের মাইনে করা ড্রাইভার। আমি তো আর তা ডাকতে পারি না। তাই বলছিলাম—

সুজাতা ভ্যানিটি ব্যাগ বন্ধ করে সমস্যাটা ভেবে দেখতে থাকে।

কিন্তু ড্রাইভার আবার নিজে থেকেই বলে, বছর কয়েক আগে এক মাদ্রাজি সাহেবের কাছে কাজ করতাম, বুঝেছেন, তাঁর গিন্নি ছিলেন একেবারে মিশ্ কালো রঙের। মানে এত কালো যে 'লিপ্স্টিক'-কাজল গুর যে কোন একটা পেলেই তাঁর দুটোর কাজ হয়ে যেত ঠোঁটে কাজল, বা চোখে লিপস্টিক লাগালেও কিচ্ছুটি মালুম পাওয়া যেত না! তাঁকে 'মা'-ডাকতে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন আমার উপর। শুনলাম অমন মা রক্ষাকালীকে নাকি 'মেম-সাহেব' বলে ডাকার রেওয়াজ ছিল সে বাড়িতে।

সুজাতা হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বলে, তা আমার গায়ের রঙও তো মেমেদের মত ফর্সা নয়—

—না, মানে সে কথা নয়। তা বেশ, আপনাকেও না হয় 'মেম সাহেব' বলে ডাকব।

—না না, মেম সাহেব আবার কি? ও আমার একটুও পছন্দ নয়।

—তবে কি 'মা'-ডাকব।

—ওরে বাবা! তোমার মত ছেলের মা হতে হলে আমাকে অনেক বুড়ি হতে হবে বাপু!

—এ্যাই দেখুন, এই সমিস্যের মধ্যেই আমি তখন থেকে হাবুডুবু খাচ্ছি। কি বলে ডাকব আপনাকে? মানে, নামটা শুনতে বেশ মিষ্টি হবে;—না মানে খুব বেশী মিষ্টি হবেনা—

—এই টক-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি লজেন্সের মত? সুজাতা গম্ভীর হয়ে বলে।

—এ্যাই দেখুন! আপনি তখন থেকে শুধু রহস্যই করছেন।

—তা আমাকে অত ডাকাডাকি করার দরকারই বা কি?

—বাঃ! প্রয়োজন হবে না, বলছেন? ধরুন গিয়ে আমি আপনার পিছন বাগে আছি, আপনি ওদিকে ফিরে আছেন; এখন আমি না ডেকে তো আপনার মুখ ফিরাতে পারছিনা। তখন আমি, কি বলে ডাল—

—তখন তুমি, কি বলে ডাল, আমার সামনের 'বাগে' চলে আসবে! তাহলেই আমি তোমাকে দেখতে পাব। আর ডাকবার প্রয়োজন হবে না তোমার!

বিশু একগাল হেসে বলে, এ যে সেই ভিলাই-সায়েবের মত কথা বললেন আপনি!

—ভিলাই-সাহেব কে?

—আমি ভিলাইয়ে এক সায়েবের কাছে ড্রাইভারি করতাম। তাঁর কি জান ভাল, প্রকাণ্ড একটা নাম ছিল। তা আমার উরুশ্চারণই হয় না। তা তিনি না পারেন বাঙলা-হিন্দি বলতে, না ইংরিজি। প্রথমটা আমার বিশ্বাসই হয়নি, লাল-মুখো খাস-সাহেব ইংরিজি বলতে পারেনা, সে আবার কিরে বাবা? কিন্তু শেষে শুনলাম, ও একজাতের সাহেব আছে যারা ইংরিজিও জানে না। অনেক চেষ্টা করে সে অল্প অল্প হিন্দি শিখেছিল। মাসখানেক কাজ করার পর একদিন সাহেবের খাশ বাবুর্চি আমাকে খবর পাঠালো সাহেব মাইনে নিতে ডেকেছেন। মাইনে নিতে তাঁর ঘরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে নিয়ম মাফিক আমি দরজায় ঠক্ ঠক্ করলাম। সাহেব টেবিলে বসে কি যেন লিখছিলেন, মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, ইধার আও। আমি নমস্কার করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সায়েব আমার হাতে একটি বন্ধ খাম দিলেন। হাতে হাতে তিনি মাইনে দিতেন না। খামে বন্ধ করে দিতেন। টাকাটা নিয়ে আমি ফের নমস্কার করলাম। সায়েব ইতস্তত করলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। আমি তখনও বুঝতে পারিনি সায়েবের সমিস্যের কথাটা। আসলে সাহেব বলতে চাইছেন, 'এবার তুমি যাও।' কিন্তু তার হিন্দিটা তাঁর মনে আসছে না। হাত নেড়ে তিনি আমাকে চলে যেতে বলতে পারতেন; কিন্তু তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন সেটা খুব অভদ্রতা হবে। চাকর-বাকরদের সঙ্গেও তিনি খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন। শেষ বেশ কলম বন্ধ করে সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। গট গট করে ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। এবার সেখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ইধার আও'!

সুজাতা হো হো করে হেসে ওঠে। একসঙ্গে অতগুলো কথা বলে বিশু দাস খুব লজ্জা পায়। ঘাড়টা আবার চুলকাতে থাকে।

—আপনি যদি রাগ না করেন, আমি আপনাকে 'ম্যাডাম' ডাকতে পারি। এক মেমসাহেবকে তাই ডাকতাম আমি।

—ম্যাডাম! তা মন্দ নয়। 'মাদমোয়াজেল'ও ডাকতে পার।

—ওটা মস্ত বড় নাম। সেই ভিলাই-সায়েবের নামের মত। আমার অতবড় নাম উরুশ্চারণই হবে না।

—তবে ঐ ব্যাভাষই ভাল।

ইতিমধ্যে ক্লিনার নেংটি এসে এক বালতি জল রেডিয়েটারে ঢেলে দিয়েছে। বিশু আবার পিছনের দরজাটা খুলে ধরে। সুজাতা কিন্তু পিছনের সীটে যায়না আজ। ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসে। গাড়ি বেরিয়ে যায় গেট দিয়ে।

কারখানাটা শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে। পথটা মসৃন পিচের এবং লোকজনের যাতায়াত এদিকটায় সচরাচর কম। বিশু এ্যাকসিলারেটারে পা দেয়। সুজাতা হাত ঘড়িটা দেখে বলে, অনেক আগে করে বেরিয়েছি, চল নদীর ধারে এক চক্কর ঘুরে তারপর যাওয়া যাবে।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে বিশু। গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ পাশে এনে বলে, কিন্তু নকুলবাবুকে কি কৈফিয়ৎ দেব ?

হঠাৎ রুখে ওঠে সুজাতা। বলে, নকুলবাবুকে কোন কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে না। গাড়ির মালিক নকুল ছুই নয়, সে ম্যানেজার মাত্র। লগবুকে যা লিখবার তা আমিই লিখব। কত কিলোমিটার নদীর ধারে ঘুরেছি তা লিখে দেবার দায় আমার।

বিশু বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

সুজাতার মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠেছিল নকুল ছুইয়ের উল্লেখে। আগরওয়ালের সব ব্যবস্থাপনার ভিতরেই ডবল-চেকিংএর আয়োজন। সুজাতা গাড়িটা ব্যবহার করবে, সুজাতার হুকুম ছাড়া গাড়ি গ্যারেজ থেকে বার হবে না, অথচ পেট্রোলের খরচ ঠিকমত হচ্ছে কিনা সে হিসাব দেখে নেবে নকুল ছুই, লগবুক আর পেট্রোল-স্লিপ মিলিয়ে দেখে। অদ্ভুত ব্যবস্থা। আগরওয়াল বোধকরি তার নিজের ডান হাতখানাকেও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেনা, বাঁ হাতখানাকে সতর্ক করে রাখে ডান হাতের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে। সুজাতা পেট্রোল চুরি করবে এ আশঙ্কা নিশ্চয়ই তার নেই, তবু প্রথামাফিক সে সাবধানতা অবলম্বন করে চলে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ট্রেনে দেখনি, জজ-সাহেব, কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চিনতে পারলে টিকিট চেকার সেলাম দেয়, হাতখানাও বাড়িয়ে দেয় টিকিটখানা পাঞ্চ করে দিতে। ওতে মনে করার কিছু নেই। ওই হচ্ছে নিয়ম।

গাড়িটা এতক্ষণে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁধের সড়কে নেমেছে।

নদীর কিনার বরাবর লম্বা বন্যারোধি মাটির চওড়া বাঁধ। তার উপর

লাল কাঁকরে সড়ক, ইরিগেশন বিভাগের রাস্তা। এ রাস্তায় গরুর গাড়ি যেতে দেওয়া হয় না, ভারি ট্রাকও নয়। পদাতিক অথবা সাইকেল আরোহী অবশ্য চলেছে কিছু কিছু। দুধারে খেজুর, বাবলা, রাধাচূড়া আর রেইনট্রি গাছ। খেজুর গাছে কলসি বাঁধা, রাধাচূড়ায় আর কৃষ্ণচূড়ায় অজস্র ফুল ফুটেছে। খোলা হাওয়ায় সুজাতার চুলগুলো অবাধ্যতা শুরু করেছে। হাত দিয়ে বারবার ঠিক করে নিতে হচ্ছিল।

মুক্ত প্রকৃতির একটা অদ্ভুত মোহ বিস্তারের ক্ষমতা আছে। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার মধ্যে আমরা ভদ্রতার অভিনয় করে চলি, হঠাৎ খোলা আকাশের তলায় এসে তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মানুষের মনের মুখোস সরে যায়, অন্তরাত্মা যেন আদম ঈভের মত বাধাবন্ধনহীন নিরাবরণরূপে বেরিয়ে আসতে চায়। সুজাতা এই দিগন্ত অনুসারী ফাঁকা মাঠ, আর সমুদ্র-অভিসারী নদীর মাঝখানে সীমন্তিনী নারীর রক্তিম সিঁথির মত সরু লাল পথ বেয়ে দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল তার যাবতীয় সমস্যা, তার বাপির রিসার্চের কাগজগুলোর কথা, তার জীবনের জটিলতা, আগরওয়ালের কূট-কৌশল আর মহাপাত্রের লুব্ধ দৃষ্টি। কৈশোরে পদার্পণ করে বেণী দোলানো যে বালিকাকে চিরতরে বিদায় দিয়েছিল একদিন, সেই বালিকা-সুজাতা তাহলে হারিয়ে যায়নি। সুজাতার পরিণত বক্ষের অন্তরালে সে তাহলে লুকিয়ে বসে ছিল এতদিন। দ্রুতধাবমান গাড়ির গতির বেগে সেই ছোট মেয়েটি আজ হঠাৎ বেরিয়ে আসতে চাইল।

বাঁধের ধারে একটা গ্রাম। খড়ের চালায় হলুদ রঙের ঝিঙে-ফুল, ঘুঁটের ছোপ ধরা বুটিদার মেঠো-দেওয়াল, বাবলা গাছে খুঁটিতে বাঁধা রোমন্থনরত এলায়িত দেহ গরু, ড্যাংগুলি-ব্যস্ত কতকগুলো উলঙ্গ গ্রাম্য শিশু। অস্তমান সূর্যের দিকে মুখ করে একটি পল্লীবধূ শাঁখে ফুঁ দিল।

সুজাতার মনে হয়, আচ্ছা সন্ধ্যাবেলা আমরা শাখে ফুঁ দিই কেন? লক্ষ্মীকে আবাহন করতে। কিন্তু শাঁখ কেন? বাঁশী নয়, কাঁসি নয়, তানপুরা নয়, অমন লক্ষ্মীমেয়েটিকে ডাকতে এমন কর্কশ-নিনাদী শঙ্খ কেন বাজাই আমরা? ভৈরবের আছে বিষাণ, আর ডমরু; সেটার মানে বুঝি—তাণ্ডবনৃত্যের সঙ্গে সেগুলো তাল রেখে চলে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী আর সরস্বতীর বীণার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা বেশ খাপ খায়। অনেক ইতিকথা আছে তাদের পিছনে। কালিপূজার রাত্রে ঐ সব পটকার প্রচণ্ড নিনাদ, আর কিছু নয় কালীমূর্তির পরিকল্পনার সঙ্গেও

খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা মানুষ লক্ষ্মীর সঙ্গে ঐ কর্কর-ধ্বনি শঙ্খের সম্বন্ধ কি? আছে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ। শঙ্খ হচ্ছে সমুদ্রের সম্পদ। লক্ষ্মীর জন্ম হয়েছিল সমুদ্রে। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে ঐ শাঁখের পড়ায়। তাই শঙ্খধ্বনিতে লক্ষ্মীর মনে পড়ে যায় বালিকা বয়সের স্মৃতি। পরিণত বয়স্কা নারায়ণীর মনের মধ্যে থেকে উঁকি মারে ছোট্ট লক্ষ্মীমেয়ে একটি।

আজ সুজাতার যা হচ্ছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে সুজাতা, আচ্ছা বিশু, 'পরশপাথর' কাকে বলে জান?

বিশু একটু অবাক হয়, এবার আড়চোখে দেখে নেয় সুজাতার দিকে, জবাব দেয় না। সুজাতা দ্বিতীয়বার বলে, কই বল্‌লে না? পরশপাথর কাকে বলে জান?

এবার বিশু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশপাথর চিনি বইকি। মার্বেলের মত দেখতে ; গোল, এই এ্যাত্তটুকুন।

ষ্টিয়ারিঙ থেকে হাতটা তুলে মাপটা সে দেখায়।

সুজাতা হাসি গোপন করে বলে, আরে বাসরে! তুমি যে পরশ পাথরের মাপ পর্যন্ত জান! অতটা আবার জানতুম না আমি।

বিশু বেশ সহজসুরেই বলে যায়, জানিনা ওর চেয়ে বড় সাইজের পরশপাথর পাওয়া যায় কিনা। আমি যেটা দেখেছিলাম সেটা ঐ সাইজের।

সুজাতা যেন আরও ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে। কী সরল ঐ গ্রাম্য অশিক্ষিত ছেলেটা। চোখ পাকিয়ে বলে, আচ্ছা! পরশপাথর তুমি তাহলে দেখেছ! আমি শুধু নামটাই শুনেছি, স্বচক্ষে দেখিনি কখনও। আছে নাকি তোমার কাছে দু-একটা?

—আজ্ঞে না। আমি তো কোন পরশপাথর কুড়িয়ে পাইনি। পরেশবাবু একটা পেয়েছিলেন।

—কি হয় পাথরটায়?

—যাতে ছোঁয়ানো যায় তাই সোনা হয়ে যায়, আবার কি?

—তাই বুঝি? তা তোমার পরেশবাবুর কাছ থেকে পাথরটা একবার চেয়ে নিয়ে আসতে পার না? এই গাড়িটাকে ছুঁইয়ে দিতাম, এটা সোনার গাড়ি হয়ে যেত।

বিজ্ঞের হাসি হেসে বিশু বলে, তাতে লাভ হত না কিছু। গাড়িটা অচল হয়ে যেত শুধুমুধু। পরেশবাবুরও তাই হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ভদ্রলোক রেগে মেগে ঐ সর্বনেশে পাথরটা ফেলেই দিয়েছিলেন।

—পরেশবাবু কে বলত ?

—তা আমি কি জানি ? একটা বাইস্‌কোপে দেখেছিলাম।

—এতক্ষণে হালে পানি পায় সুজাতা। 'পরশপাথর' সিনেমা দেখে বিশু দাস জানতে পেরেছে পরশপাথরের মাপ মার্বেলের মত, এই এ্যাত্তটুকুন !

সুজাতা বলে, জান বিশু, আমি ঐ রকম একটা পরশপাথর হঠাৎ পেয়ে গেছি। সেটা নিয়ে কি করি বলত ?

অম্লানবদনে বিশু বলে, টান মেরে ফেলে দিন নদীর জলে। শেষবেশ ফেলেই তো দিতে হবে পরেশবাবুর মত। শুধুমুধু খানিক নাচানাচি করে কি লাভ বলুন ?

কথাটা ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে। প্রায় দার্শনিকের মত নিরুত্তাপ উদাসীনতায় বিশু ড্রাইভার যে অন্তিম নিদান হেঁকেছে তার যাথার্থ্য অনুধাবন করবার মত। তবু একটু ভেবে নিয়ে সুজাতা বলে, কিন্তু ওটা দিয়ে তো অনেকের অনেক উপকার করা যেতে পারে। কত গরীব দুঃখীর বরাত ফিরিয়ে দেওয়া যায় ওটা দিয়ে ; না কি বল ?

বিশুও একটু ভেবে নিয়ে বলে, আজ্ঞে তা তো বায়ই।

—কিন্তু আপাতত ওটা আমি নিজের কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছি না। আমি যে পরশপাথরটা লুকিয়ে রেখেছি, একটা চোর সে কথা জানতে পেরেছে। দেখলে না, আমার ঘরে সেদিন চুরি হয়ে গেল ? চোর অবশ্য সেটা খুঁজে পায়নি। ওটা যদি তোমার কাছে রাখতে দিই, তুমি কিছুদিন সেটাকে লুকিয়ে রেখে দিতে পার ?

—আমি ? আজ্ঞে না। আমার তো থাকার মধ্যে ঐ এক ভাঙা সুটকেশ।

—ঐটাই তো সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। চোরে তো আর ভাঙাটিনের সুটকেসে পরশপাথর খুঁজতে আসবে না।

—না না। তাহলে রাতে আমার ঘুমই আসবে না।

—আচ্ছা, তোমাকে যদি দিন-দুয়েকের ছুটি দিই ? তুমি ওটা তোমার দেশের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে দিয়ে আসতে পার না ?

—আজ্ঞে না। দেশের বাড়িতে বাবা একা থাকে। সে বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখে না। পরশপাথর লুকিয়ে রাখা তার কম্মো নয়।

—তাহলে ?

—এক কাজ করবেন ম্যাডাম? এই যে পথে আমরা যাচ্ছি, সেখানেই একটা বাড়ি আছে মালিকের। বাগানবাড়ি। একজন মুসলমান দারোয়ান থাকে সেখানে। আর কেউ থাকে না। সেখানে লুকিয়ে রেখে যান না। দেখবেন বাড়িটা?

—কতদূর?

—আর মাইল দেড়েক।

—আচ্ছা চল, দেখেই আসা যাক্।

বিশু দাসের উৎসাহে ভাঙা বাগানবাড়িটা দেখে এল সুজাতা। নদীর ধারে এমন একান্তে আগরওয়ালের যে একটা বাগানবাড়ি আছে সে খবর সুজাতা জানত না। বুড়ো মুসলমান দারোয়ান বিশুকে চিনত। ঘরদোর খুলে দিল সে। এক ঝাঁক চামচিকে না বাদুড় পাখা সাপটিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল আলোর ধাক্কায়। সুজাতা চমকে যায়। ছোট্ট ডাক বাঙলো ধরনের রানিগঞ্জ টালির ছাউনি একটা। খান দুই শয়নকক্ষ, মাঝে একটা হল। সামনে টানা বারান্দা। ইলেকট্রিক নেই। জানালায় পাল্লা দু-একটা খুলে গেছে। গরাদও নেই জানালায়। ঘরে আসবাব পত্র আছে কিন্তু। এমন কি বিছানা, বালিশ পর্যন্ত। একটু দূরে দারোয়ানের খাপরা-টালির ঘর, তার পাশে রান্নাঘর। ফুলের বাগান নেই! এককালে বাগান ছিল, বেশ বোঝা যায়। করবী, শিউলি, কামিনী, ফুরুস গাছ কিছু কিছু টিকে আছে, বাকি আগাছায় আকীর্ণ। দারোয়ান লোকটা বৃদ্ধ, কিন্তু তাকে দেখে সুজাতার কেমন যেন মনে হল লোকটা সুবিধার নয়। কোন কারণ নেই। তবু ওর বলিরেখাঙ্কিত ভাবলেশহীন মুখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত কাঠিন্য, একটা কর্কশতা—মৃত্যুর মত শীতল! এই বিজন বনে একা একা লোকটা থাকে কি করে? আর এমন একটা জায়গায় এ বাগানবাড়ি রাখার মানেটাই বা কি?

দারোয়ান ওকে আপ্যায়ন করে বসাতে চাইল, বললে সরঞ্জাম সব আছে, চা কফি সব খাওয়াতে পারে। কিন্তু সুজাতা রাজি হল না। তার কেমন যেন একটুও ভাল লাগছিল না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে।

ফেরার পথে সুজাতা বলে, লোকটা ওখানে একেবারে একা থাকে কেমন করে?

বিশু অম্লানবদনে বলল, ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। একেবারে একা ঘরে ওর জীবনই কেটেছে যে?

—কেন? একেবারে একা একা জীবন কেটেছে কেন?

—ও কিছু না, মানুষ খুন করে দ্বীপান্তরে গিয়েছিল।

সুজাতার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমশীতল প্রবাহ নেমে যায়। মুসলমান লোকটার চেহারা মনে পড়ে যায়। এক মুখ দাড়ি, মাথায় একটা ছোট সাদা টুপি, চোখ দুটো কোটরাগত। একেবারে ভাবলেশহীন মুখ। লোকটা মানুষ খুন করেছিল? কাকে? কেন?

অনেকক্ষণ পর সুজাতা আবার বলে, এখানে যে একটা বাগানবাড়ি আছে তুমি তা কেমন করে জানলে?

—নকুলবাবুকে নিয়ে একবার এসেছিলাম যে।

—আচ্ছা এখানে এমন একটা বাড়ি রাখার মানে?

—সে আপনি শুনতে চাইবেন না ম্যাডাম!

সুজাতা গম্ভীর হয়ে যায়। আগরওয়াল যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নয়, তা সে জানত। কিন্তু—

বাঁধের রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পৌছালো যখন তখনও ছটা বাজেনি। সুজাতা বলে, এবার সোজা মহাপাত্র সাহেবের বাড়ির দিকে চল—

—তার আগে পেট্রল নিতে হবে। পথেই পড়বে পাম্পিং স্টেশন।

অল্প পরে পেট্রল স্টেশনে এসে দাঁড়ালো গাড়িখানা। বিশু হর্ণ বাজালো। লোকজনের সাড়া নেই। বিশু দরজা খুলে দেখতে গেল। এই অবকাশে সুজাতা ড্যাসবোর্ডের সামনে ছোট যে ডালাটা থাকে সেটা খুলে ফেলে। ভেবেছিল ওতেই আছে পেট্রলের রসিদ-বই। পেট্রল স্লিপে সুজাতাই সই দিয়ে পেট্রল নেয় গাড়ীতে। মাসান্তে সেই রসিদ বইয়ের কাউণ্টার-ফয়েল দেখে হিসাব করে বিল মেটায় নকুল দুই। ডালাটা খুলেই একটু অবাক হয়ে যায় সুজাতা। স্ক্রু-ড্রাইভার, রেঞ্চ, প্লাস, ময়লা ন্যাকড়া, জুট ছাড়াও রয়েছে পেঙ্গুইন সিরিজের একখানা ইংরাজি পকেট বই। এ বই কার? এল কোথা থেকে। কৌতূহলী হয়ে বইটা খুলে দেখে সেখানা ডস্টয়েভ্স্কির 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট।' দুরন্ত কৌতূহলে প্রথম পাতাটা খুলে ফেলে সুজাতা। বইয়ের মালিকের নামটা লেখা আছে প্রথম পাতায়—কৌশিক মিত্র! একটা তারিখও আছে, বছর দুয়েক আগেকার।

যেন চুরি করে কারও ডায়েরী পড়ছিল, ক্ষিপ্র হাতে সুজাতা বইটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দেয়। ঠিক তখনই বিশু দাস ফিরে আসে পেট্রল-

পাম্পের সার্ভিসম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। পেট্রলের ডালাটা খুলে দেয় চাবি দিয়ে প্যান্টের হিপ পকেট থেকে টেনে বার করে আনে পেট্রলের রসিদ বইটা। মেলে ধরে সুজাতার সামনে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কলম বার করে সুজাতা সই করে দেয়।

পেট্রল নিয়ে গাড়িটা এসে থামল জীমূতবাহনের বাড়ির গাড়ি বারান্দায়। অরূপরতন বাগানেই বসেছিল তৈরি হয়ে। গাড়ি ঢুকলেই এগিয়ে আসে; কিন্তু তার চেয়েও দ্রুততর গতিতে সুজাতা এগিয়ে যায় তার দিকে। একবার পিছন ফিরে দেখে বিশু দাস কতদূরে আছে। তারপর অরূপ কোন সম্ভাষণ করার আগেই বলে ওঠে, একটা কথা, সেদিন আপনার মনে হয়েছিল আমার ড্রাইভার আপনার পরিচিত, নয়?

—হ্যাঁ, ভুল হয়েছিল নিশ্চয়। হঠাৎ সেদিন মনে হল—

—কি মনে হয়েছিল বলুন তো?

—ও কিছু নয়।

—বলুন না শুনি।

—আচ্ছা বেশ বল্‌ছি। আমি ক্রিকেট খেলি। বছর তিন চার আগে ইন্টার কলেজ টুর্ণামেণ্টে আমি খেলতাম ল-কলেজের হয়ে। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজের একটি প্লেয়ারের সঙ্গে আপনার ড্রাইভারের অদ্ভুত সাদৃশ্য। কাকতালীয় ঘটনা নিশ্চয়। মানে আমি ছিলাম আমাদের টিমের উইকেট কীপার। সে ছেলেটি অনেকক্ষণ উইকেটে ছিল—তাকে অনেকক্ষণ খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম আমি

—তার নামটা আপনার মনে নেই?

—কি হবে তার নামে? সে তো এ নয়। এর মত দেখতে শুধু।

—কিন্তু সেদিন আপনি যেন বলেছিলেন কী 'সাম' মিত্র, তাই নয়?

—হাঁ মিত্র। মিত্রই তার উপাধি। নামটা ঠিক মনে আসছে না—

—'কৌশিক মিত্র' কি?

—একজ্যাক্টলি! আপনি কেমন করে জানলেন?

উত্তেজনায় সুজাতা খপ্ করে অরূপের হাতখানা চেপে ধরে, বলে—আপনি সেদিন বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে আমাকে সাহায্য করবেন, মনে আছে?

অরূপরতন বিহ্বল হয়ে প্রত্যুত্তর করে, মনে আছে। কেন বলুন তো?

—আপনার কাছে একটি ভিক্ষা আছে!

—অমন করে বলছেন কেন? আদেশ করুন না।

—এক্ষনি আপনার সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হল সেটা আপনাকে ভুলে যেতে হবে—

—আপনি আমার হাতখানা ধরেছিলেন, সে কথাও?

সুজাতা অরূপের হাতখানা ছেড়ে দেয়। বলে, বেশ, ভুলতে আপনাকে কিছুই হবে না; কিন্তু কথা দিন একথা কখনও কাউকে বলবেন না।

—কথা দিলাম। কিন্তু কেন বলুন তো?

—সে কথাও জানতে চাইবেন না কোনদিন।

—বেশ, চাইব না।

—তবে চলুন!

॥ তেরো ॥

নিঃসন্দেহে এঞ্জিনিয়ার-কবি কৌশিক মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি তিল তিল করে বদলে যাচ্ছে। বাপের মনি-অর্ডার-নির্ভর কলেজের পড়ুয়া ছেলে সে নয় আর। দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরা বেকার একজন এঞ্জিনিয়ার। দেহে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে কায়িক পরিশ্রমে অন্নসংস্থান করতে পারে না, সামাজিক বাধায়, লোকলজ্জার প্রতিবন্ধকতায়। ভদ্রলোকের ছেলে বলে, শিক্ষিত বলে অন্তত এক টাকার তফাত যে রাখতে চায় তার উপার্জনে, রাজমিস্ত্রির উপার্জনের তুলনায়। তাই তার কবিতার সুরও পালটাচ্ছে। চিনিকলের কুলি বস্তিতে যে কবি বলেছিল তবু দেখি বাঁচিবারে চায় ওরা, হাসে মিষ্ট অতি', সেই ফলতা ইটের কারখানায় গিয়ে শুনেছে থাক-দেওয়া ইটের বিদ্রোহের বাণী। পথের সন্ধান তখনও সে পায়নি, তখনও সে ছিল দৈব নির্ভর। নিজেদের সংহতির মধ্যে, আভ্যন্তরীণ শক্তির মধ্যে সে তখনও মুক্তি মন্ত্রের সন্ধান করেনি,—তাকিয়ে ছিল বাইরের থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায়। সেই কবিকেই তারপর দেখলাম 'ফ্যাকটারি ছন্দ' কবিতায় সুর বদলাতে। এখানে সে যন্ত্রের মন্ত্রণা শুনেছে—যন্ত্রীদলকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য তারা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে; কবির আশীর্বাদ আছে তাদের উপর।

এবার পড়লাম আর একটি কবিতা। 'টানেল'। আর ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়, যদিও অন্ত্যমিলকে তবুও সে ত্যাগ করতে পারেনি। না পারুক, তবুও কবিতায় কবির বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে বলতে পারি।

কিন্তু সরাসরি কবিতাটায় উপনীত হতে চাই না। তার ডায়েরী ধরেই বরং অগ্রসর হওয়া যাক :

রবিবারের সকাল। আর পাঁচজনের আজ ছুটির দিন। তাই আমার আজ দ্বিগুণ কাজ। সপ্তাহের আর ছটা দিনের তুলনায় আজ মিটারে অনেক বেশী উঠ্‌বে। পর পর পাঁচটা সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে সেটা বুঝতে পেরেছি আমি। এ বেশ ভাল কাজ পেয়েছি। স্বাধীন ব্যবসা। গাড়িটা আমার নয়। পেট্রোল মবিল খরচ আমার নয়, মায় ছোট খাট রিপেয়ারের খরচও আমাকে দিতে হয় না। মিটারে যা ওঠে তার একটা শতকরা অংশ আমার প্রাপ্য। গাড়ির মালিক অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। কিশোরদার আত্মীয়। আমার মত শিক্ষিত ভদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভার পেয়ে তিনি খুশীই হয়েছেন। মিটার ডাউন না করে খেপ মারব না। টাকা মেরে দিয়ে পালাব না। এ কি কম নিশ্চিন্ত হওয়া? ভাব্‌ছি, চাকরি-বাকরির চেষ্টা আর করবই না। এই তো বেশ। দুনিয়াকে বেশ চিনতে পারছি। ইচ্ছে আছে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব। ট্যাক্সি ড্রাইভারের অভিজ্ঞতা। কতই তো দেখলাম। দিনের কলকাতা, রাতের কলকাতা। প্রত্যুষের শহর, স্তব্ধ মধ্যাহ্নের শহর, সন্ধ্যার কলমুখরিত কলকাতা শহর। কত জাতের যাত্রী, কত উদ্দেশ্য তাদের, কত বিচিত্র ব্যবহার। কেউ 'আপ' বলে, কেউ তুই-তোকারি করলেও গায়ে মাখি না। ভাগ্যক্রমে চেনা লোক একজনও ওঠেনি গাড়িতে এই পাঁচ সপ্তাহে। সে সৌভাগ্য হবে নিশ্চয় একদিন। প্রথম চেনা লোক কাকে পাব? কলেজের অধ্যাপক? সহপাঠি? সহপাঠি সুরেনের বিয়েতে গিয়ে তার সেই যে শালীটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেই মেয়েটি? কি নাম যেন তার? যাঃ নামটাই ভুলে গেছি! যাই হোক, চেনা হলেও আমি চিনতে পারব না। আমার কাছে সে হবে একজন যাত্রী। সে যদি চেনে তখন হেসে বলব, হ্যাঁ কি করব বলুন? ট্যাক্সিই চালাই আজকাল। হাজার হোক স্বাধীন ব্যবসা।

উনি হয় তো বলবেন : কিন্তু আপনি না পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার?

বলব, তাতে কি? চাকরি করলে 'বস'কে খুশী রাখতে হবে, ঠিকাদারী করলেও পাঁচজনকে তেল দিতে হবে। তার চেয়ে এই ভাল। তেল যদি ঢালতেই হয় গাড়িতেই ঢালি। আপনারা পাঁচজনে মিটার দেখে আমার মজুরি মিটিয়ে দেবেন। এ আর বেশি কথা কি?

সকাল বেলাতেই গাড়িটা ধোয়া মোছা করছিলাম। একটা ক্লিনার

নিয়েছি। তার মাইনে অবশ্য আমাকে দিতে হয় না। তবু রাতের কলকাতায় একজন সহকারী নিয়ে বের হতে হয়। না, গাড়ি আমার একেবারে নূতন। কোন ট্রাবল নেই ; কিন্তু রাতের ক'লকাতায় মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। আজকাল আকছার ট্যাক্সি ড্রাইভার খুন হচ্ছে। পাশে আর একজন লোক থাকা ভাল।

গাড়িটা সাফা করছি, হঠাৎ কিশোরদা এসে হাজির।

—কৌশিক উঠে আয়। আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায় ? আমি ট্যাক্সি নিয়ে বের হব এখন।

—ট্যাক্সি বেরুবেনা আজ। তুই চলে আয়। জরুরী কাজ আছে।

আমি কান দিই না। বলি, রাখ তোমার জরুরী কাজ! আজ রবিবার!

কিশোরদা এসে আমার কাঁধে হাত দেয়। বলে, পালোয়ান একটা কেলেঙ্কারি করেছে। এখন যেতে হবে। শিগ্‌গির উঠে আয়। শিবুর বাবা আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি যাওয়ার পথে তোকে উঠিয়ে নিতে এসেছি—

অবাক হয়ে বলি, শিবু কি করেছে ?

—হতভাগা আর্সেনিক খেয়েছে। উঠে আয়, এক মিনিটও দেরী করতে পারব না।

—আর্সেনিক ? কেন ?

যেমন ছিলাম উঠে বসি ওর গাড়িতে।

কিশোরদাই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসে। বালিগঞ্জের দিকে শিবুদের বাড়ি। আমি আগেও গিয়েছি। শিবুর বাবা নামকরা ডাক্তার। গিয়ার বদলাতে বদলাতে কিশোরদা বলে, শিবুটা একটা ক্যাডাভ্যারাস।

—হঠাৎ আর্সেনিক খেল কেন ?

—না হলে নাটক হবে কেমন করে ? ড্রামাটিক একটা কিছু করতে হবে তো!

—আরে ব্যাপারটা কি হয়েছে আমাকে বলবে তো ?

—আমার বাঁ পকেটে সিগারেট কেসটা আছে, বার কর।

কিশোরদার বাঁ পকেট থেকে সিগ্রেট-কেসটা বার করে তার মুখে একটা বসিয়ে দিই, নিজেও একটা নিলাম। আগুন জেলে ধরাই, ওরটাও ধরিয়ে দিই। সমান বেগে গাড়ি চালাতে চালাতে কিশোরদা একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

যেতে যেতেই গল্পটা বলল :

শীলার বাবা শিবুকে পাত্তা দেন নি। শিবুর বাবা বড়লোক, শিবু লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে ; কিন্তু তার চেয়ে মানসকে পাত্র হিসাবে বেশী লোভনীয় মনে হয়েছিল তাঁর। ইতিমধ্যে মানস পাশ করে কোথায় যেন হাউস-সার্জেন হয়েছিল। সম্প্রতি বিলাতে না আমেরিকায় একটা কাজ যোগাড় করেছে। চাকরি করবে এবং পরীক্ষাও দেবে। মানসের বাবা ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগে তার বিয়ে দিতে চান। দুজনকেই বিলাত পাঠাবেন। শীলার বাবার কাছে তিনি শেষ কথা চাইলেন। শীলার বাবা মনস্থির করতে দেরী করেন না। শিবুকে বাতিল করে মানসের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে পাকা করে ফেললেন।

—শীলার মত ছিল ? প্রশ্ন করলাম আমি।

—না ! মেয়ের অমতেই অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁরা। হ্যাটস্ অফ্ টু শীলা ! মেয়েটা বিলেত যেতে চাইল না। কম্পাউণ্ডারের বউ হতে চাইল। শীলার মা, দিদি শেষে বাবাও ওকে অনেক করে বোঝালেন, মেয়েটা কিছুতেই রাজি নয়। শেষে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ওঁরা অগ্রসর হতে থাকেন। নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হল, পাকা দেখার খাওয়া দাওয়া হল। ওঁরা আশা করেছিলেন, কোন রকমে একবার বিয়েটা মিটিয়ে বিলেত পাঠাতে পারলেই শীলার মন ঘুরে যাবে ! ওঁরা নিজের মেয়েকে চিনতেন না।

—তারপর ?

—তারপর একদিন পায়োয়ান শীলাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। হতভাগা যদি আমাকে একবারও জানাতো, দেখতাম কোন শালা ধরে ওদের !

—ধরা পড়ে গেল ?

—গেল ! শীলার বাপ খুব কড়া আদমি। মেয়েকে বাড়ি এনে বন্দী করলেন। শিবু পালোয়ানকে অপমানের চূড়ান্ত করে ছেড়ে দিলেন। সবাই ভেবেছিল, এত কাণ্ডের পর মানস অথবা তার বাবা বেঁকে দাঁড়াবেন। কিন্তু তাঁরা তা দাঁড়ালেন না। ওঁরা বললেন, ও কিছু নয়, মানস বউ নিয়ে একবার বিলেতে পাড়ি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শিবু পালোয়ানকে তার বাড়ির সবাই এবং পাড়ার ছেলেরা বিদ্রূপের চূড়ান্ত করল। শীলা নাবালিকা নয়, সে ইচ্ছে করলে অস্বীকার করতে পারত। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তার বিয়ে দিতে পারেন না ওঁরা ; কিন্তু ঐ পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যাবার

পরই সে যেন কেমন নিথর হয়ে গেল। পালোয়ান তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি। আজ রবিবারে তার বিয়ে; আর পালোয়ান আজ সকালে আর্সেনিক খেয়ে বসে আছে।

শিবুদের বাড়ির সামনে বেশ একটা জটলা। চেনা মুখও দেখলাম কিছু। আমাদের বন্ধু বান্ধব। সুরেন, রবি, সুবিমল, জগা। সুরেন এগিয়ে এসে বললে,—বাঁচবে বলে মনে হয় না কিশোরদা।

—হাসপাতাল নেবে না?

—না। ওর বাবাই সব করছে। আরও দু একজন ডাক্তার এসেছেন।

—কী কেলেঙ্কারী বল দিকি?

নজরে পড়ল শিবুদের তিনখানা বাড়ির পরেই একটা বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। রসুন-চৌকি বসেছে; কিন্তু সানাই বাজছে না। যেন মৃত্যুর নীরবতা নেমে এসেছে সে বাড়িতেও। কোন সাড়াশব্দ নেই সেখানে। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সমাদ্দার। শিবুর বাবা। প্রৌঢ় রাশভারি মোটা মানুষ। ভীড়ের মধ্যে কিশোরকে দেখতে পেয়ে বললেন, এই যে এসে পড়েছ তুমি!

কিশোর ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে, কতক্ষণ খেয়েছে?

—ঘণ্টা তিন চার মনে হয়।

—এখন কেমন বুঝছেন?

প্রৌঢ় মানুষটি কথা বললেন না। মাথাটা নাড়লেন শুধু। কে একজন বলেন, ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বললে হত না ছোট কাকা?

ভদ্রলোক নীরবে ঢুকে গেলেন আবার। কিশোরদা আর আমিও গেলাম ভিতরে। ঘরে অতটা ভীড় নেই। বৃদ্ধ বসলেন একটা শোফায়। কিশোরদা তাঁর পাশে বসে প্রায় চুপি চুপি বললে—ওকে কোন নার্সিং হোমে রিমুভ করলে ভাল হ'তনা?

ঘরের ভিতর থেকে একটা চাপা কান্না ভেসে আসছে। না, মড়া কান্না নয়। হৃদয় নিংড়ানো আর্ত ক্রন্দন। গুমরে গুমরে কেউ যেন কাঁদছে। শিবুর মা অথবা বোনেরা কেউ হবে বোধহয়। বৃদ্ধ আবার মাথা নেড়ে বললেন, দরকার হবে না।

—হ্যাঁ, দরকার হয়তো হবে না। আপনার কাছে সবরকম ব্যবস্থাই আছে। আপনার ফোন পেলে যে কোন ডাক্তার ছুটে আসবেন; কিন্তু—

তাকে থামিয়ে দিয়ে শিবুর বাবা ঘড়িটা দেখে বলেন, আর ঘণ্টাখানেক লাগবে বোধহয়! এদের কান্নাকাটির পালা মিটতে আরও একঘণ্টা। ধর, বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে পারবে তোমরা!

আমার পায়ের নিচে মাটিটা দুলে উঠ্‌ল! কী অদ্ভুত মানুষ এ ডাক্তার সমাদ্দার! তাঁর চব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলেটা একঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে, সে কথা কী অদ্ভুতভাবে ঘোষণা করলেন উনি!

আমাদের কারও মুখে কথা ফুটল না।

ডাক্তার সমাদ্দার চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলেন। বাঁ হাতে কিশোরদার হাতখানা টেনে নিয়ে তাতে একটু চাপ দিয়ে বলেন, আমার একটি অনুরোধ আছে বাবা

—বলুন, কাকাবাবু—

—এ গলিটার মধ্যে তোমরা 'হরিবোল' দিও না! পাশেই বিয়ে বাড়ি!

বলেই উঠে পড়েন! দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে থপ্‌ থপ্‌ করতে করতে ভিতরে চলে যান!

আমরা কজন নিস্পন্দ বসে থাকি!

একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়ালো। নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ এলেন বোধহয়। একজন ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে গাড়ি থেকে নেমে বৈঠকখানা পর্যন্ত আসতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সমাদ্দার! তাঁকে দেখে ভদ্রমহিলা আরও উচ্চগ্রামে কেঁদে উঠবার উপক্রম করতেই একটা প্রচণ্ড ধমক দিলেন সমাদ্দার: সুরো! কাঁদতে ইচ্ছে থাকে বাড়ি গিয়ে কাঁদ্‌গে যা! এখানে ওসব চলবে না!

লক্ষ্য করে দেখি ভিতর বাড়ির কান্নারও কণ্ঠরোধ করে এসেছেন উনি। চাপা কান্নাটা আর শোনা যাচ্ছে না!

কিন্তু আমার যে তখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে!

সুরো নামে যাকে ডাকলেন সে ভদ্রমহিলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ততক্ষণে ভিতরে চলে গেছেন।

বৃদ্ধ তখন কিশোরের দিকে ফিরে বলেন, কী অবিবেচক বল! আজ বিয়েটা মিটে গেলে, কাল তুই এ কাণ্ড করলেই পারতিস!

কী বলব? আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। প্রহর গনি।

বিচক্ষণ চিকিৎসকের ভুল হয়নি! প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রাশভারি মানুষটির সমস্ত নির্দেশ অগ্রাহ্য করে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ল বাড়িটা। কে একজন ছুটে এসে বলল, আপনি একবার ভিতরে আসুন জেঠামশাই! শিগ্গীর আসুন!

বৃদ্ধ হাতটা নেড়ে শুধু জানালেন—না!

চশমাটা খুলে দু হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকেন নিথর হয়ে।

খাটিয়া এল, ফুল এল। শিবু পালোয়ানকে ধরাধরি করে বার করে আনলাম আমরা। আর্ত ক্রন্দনের পিচ্ছিল সে পথ। আর কোন বাধা দিচ্ছেন না ডাক্তার সমাদ্দার। ফটো তুলতে দিলেন না তিনি। বাহকের অভাব ছিল না। যেন চোরাই মাল পাচার করছি। আমরা সবাই কাঁধে করে তুলে নিলাম শিবুকে। তার পিঙ্গল চুলগুলো অবিন্যস্ত, তার নীল চোখ জোড়া অর্ধমুদিত। শিবু ফার্স্টক্লাস থার্ড হয়েছিল; থার্ড না সেকেণ্ড? হরিধ্বনি দেবার প্রথা আছে একটা। আমরা অস্ফুট উচ্চারণ করলাম—বলহরি! হরিবোল!

গলির মধ্যে আর আমরা হরিধ্বনি দেবনা!

বাহকের দল রওনা হয়ে যাবার পর ডাক্তার সমাদ্দার বললেন, নসু তুই একবার ভৌমিক মশায়ের বাড়ি যা, বলে আয় এরা রওনা হয়ে গেছে।

নসু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, বলে আমার কি আছে? ওঁরা কি এদিকে নজর রাখেন নি ভাবছ? সবই দেখছেন ওঁরা।

বৃদ্ধ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল তাঁর। তারপর বলে ওঠেন, অনেক খরচ করে ভৌমিক মশাই রসুন চৌকি বসিয়েছেন রে। বাজনদারেরা থেমে আছে। বলে আয়, এবার বাজাতে পারেন! আমরা কিছু মনে করব না!

পাথরে খোদাই কঠিন গালের উপর দিয়ে অশ্রুর দুটি ধারা নেমে এল তাঁর!

শ্মশান থেকে যখন ফিরে এলাম তখনও সন্ধ্যা হয়নি। সমস্ত দেহমন ভেঙে পড়তে চাইছে; কিন্তু তখনও নিস্তার নেই। কিশোরদা বলে, একটা মুশকিল হল রে কৌশিক! আজ আমার হাজারিবাগ যাওয়ার কথা ছিল।

—কাল যেও।

—কাল গেলে হবে না। আজ রাত্রেই রওনা হতে হবে। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

রেলওয়ের কি একটা বড় কাজ হচ্ছে ওদের। কাল সন্ধ্যার আগেই তাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে। কিশোরদার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়ানো গেলনা। এতটা পথ ও বেচারি একা ড্রাইভ করে যাবেই বা কেমন করে। সঙ্গে টাকাও আছে ওর। পেমেণ্ট করতে যাচ্ছে। অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম। কিশোরদা বললে, চল কিছু খেয়ে নিই আগে।

—খাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।

—ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে। শুধু খাদ্য নয় পানীয়। দু এক পেগ পেটে না পড়লে এই ওভার ট্রেন সহ্য হবেনা!

সেই রাত্রেই আসানসোল পর্যন্ত চলে গেলাম আমরা। পরদিন ভোরে রওনা হয়ে বিকাল নাগাদ পৌঁছলাম ওদের সাইটে। রেল লাইনের এক্সপ্যানসান হচ্ছে। একটা নূতন টানেল কাটছে ওর কুলিরা। অনেক টাকার টেণ্ডার। কিশোরদা কাজটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। রেল লাইন দু প্রান্ত থেকে এগিয়ে এসে থেমেছে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের সামনে। ওরা নিরলস পরিশ্রমে পাথর কেটে চলেছে। বাধা যতই হক ওদের গাঁইতার সামনে শেষ পর্যন্ত তা চূর্ণ হবেই। গুম্ গুম্ করে মাঝে মাঝে ডিনামাইট ফাট্‌ছে। সাইটে খানকয় তাঁবু খাটানো। তাতেই রাত্রিবাস করতে হবে। কিশোরদা ওখানকার ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। ওরা হিসাব নিয়ে বসল। আমিও বসলাম ডায়েরি লিখতে। আজ একটা কবিতা লিখব। কিন্তু শিবু পালোয়ানের এপিটাফ নয়, আমি শিবুর বাবার ওপর কবিতা লিখব। শিবুর বাবার প্রতীক যেন এই দুর্মদ শিলাস্তূপ। এতটুকু বেলা থেকে শিবুকে উনি মানুষ করেছেন। স্কলারশীপ পাওয়া মেধাবী ছাত্র ওঁর সন্তান। অনেক স্বপ্ন দেখতেন তিনি। চেয়েছিলেন, ছেলে বাপের লাইনেই আসুক। ডাক্তার হ'ক। নিজের প্রকাণ্ড প্র্যাকটিশটা ছেলেকে দিয়ে যেতে চাইলেন; কিন্তু শিবুর বরাবর ঝোঁক কল-কারখানার ওপর। সে এঞ্জিনিয়ার হতে চাইল। রোজ কাগজে পড়েন, রেডিওতে শোনেন দেশের প্রয়োজন এখন শুধু এঞ্জিনিয়ারের। ছেলের বাসনায় তিনি বাধা দেন নি। শিবুও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কলেজ থেকে। তারপর শুনলেন, পরিকল্পনাকারীদের কোথায় বুঝি কি ভুল হয়েছে। দেশে এখন এঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই তারা এখন সারপ্লাস। দ্বারে দ্বারে বৃথাই ঘুরে মরেছে তাঁর ছেলে। কোথাও

মাথা গোঁজার আশ্রয় পায়নি। না পায়, নাই পেয়েছে। ডাক্তার সমাদ্দার বললেন, তুমি আমার ডিস্পেন্সারিটা দেখ আপাতত, তারপর আমি তোমাকে ছোট খাট একটা কারখানা বানিয়ে দেব।

শিবু বলেছিল, কারখানা বানিয়ে কি হবে? দেশে যেখানে যত ছোট কারখানা ছিল এখন একে একে তা লালবাতি জ্বালছে।

—তবে ব্যবসাই কর। ওষুধের ব্যবসা।

তাই করতে চেয়েছিল শিবু পালোয়ান; কিন্তু কোথায় কি যেন ভুল হয়ে গেল। শিবু পালোয়ান হঠাৎ হার স্বীকার করে বসল! হয়তো পাশের বাড়ির রসুন চৌকিতে ভৈরবীর প্রথম মূর্ছনায় কী একটা ধাক্কা লাগল ওর মনে। ভৈরবীর সুরে ও শুনতে পেল পুরবীর তান। বাড়ির লোকজন তখনও ওঠেনি। শিবু পালোয়ানের কাছে বাবার ওষুধের আলমারির চাবি ছিল। নিঃশব্দ পায়ে সে নেমে গিয়েছিল এক তলায়। ভোরের প্রথম আলো লাগা পাশের বাড়ির মঙ্গলঘটটা কি সে দেখতে পেয়েছিল জানালা দিয়ে? কী জানি, সে কথা সে বলে যায়নি। ওষুধের আলমারিটা খুলতে ওর কি হাত কেঁপেছিল? জানিনা, শুধু যে চিঠিখানা সে লিখে রেখে গেছে তার অক্ষরগুলো প্রমাণ দেয়, না তার হাতও কাঁপেনি, হৃদয়ও নয়। সে শীলার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি তার চিঠিতে। সে শুধু লিখে গিয়েছিল,—কি জানি। তাও আমি জানিনা। শিবুর বাবা চিঠিখানা দেখতে দেননি আমাদের। কিন্তু না, আজ শিবু বা তার বাবা নয়, আজ আমার কবিতার বিষয়বস্তু ঐ নিঃস্ব কুলিদলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। অতবড় পাহাড়টাকে অস্বীকার করে যারা দুপাশ থেকে আক্রমণ করেছে ঐ অচলায়তনকে! টানেল খুঁড়ছে ওরা! পাহাড়ের বাধা ওরা মানবেনা:

অগ্রগতি হঠাৎ রোধ করে দাঁড়াল অচলায়তন বিরাট পর্বত!
তিল তিল করে এগিয়েছি আমরা। আমাদের পথ
　　প্রতি পদক্ষেপে পেয়েছে বাধা; কখনও খাড়া চড়াই
　　কাটতে হয়েছে, কখনও ভরাট করেছি খাড়া উৎরাই।
মাঝে মাঝে পথ আগলেছে স্ফীতোদর নদী
　　অতিক্রম করেছি তাও: মেনেছি অসীম ক্ষতি।

শহীদের মৃতদেহ পুঁতে সে নদীর মাঝখানে তুলেছি পায়ার
ক্রাঙ্ক পাইলের চেয়েও দৃঢ়তর ভিত্তি। আর
তার উপর পেতেছি আমার লৌহ কঠিন রেলপথ!
আজ আবার পথরোধ করেছে এই দুর্বার পর্বত!
আমাদের অগ্রগতি রুখবে কে?
ওরে নিঃস্ব কুলির দল! বলিষ্ঠ হাতে তুলে নে
তোদের গাঁইতা আর খাঁচি; তোদের হাতিয়ার।
পথ করে নে এগিয়ে চলার
উড়িয়ে দে ঐ অচল পাহাড়॥

যুগ যুগ মানুষের স্বেদ ও শোণিতের ঐ ঘনীভূতরূপ
পুঁজিবাদীর স্বার্থকঠিন ঐ দুর্মদ শিলাস্তূপ
বিনাবাধায় ছেড়ে দেবেনা আমাদের একতিল পথ,
রাষ্ট্রলালিত মিলওনার আর মিলিওনেয়ারের অচল পর্বত॥

হা-হা করে হেসে ওঠে নিঃস্ব কুলির দল,
গাঁইতা ওঠে আর পড়ে! সৈনিকের সবল
বাহুর মাংসপেশী চিক্ চিক্ করে সূর্যের আলোয়,
বুক চিরে ছুটব আমরা পথ না দিলে ভালয় ভালয়॥

টানেল খুঁড়ছি আমরা! ছিদ্রপথে ডিনামাইট ফাটে
থর থর করে কাঁপে পাহাড়। ওরা পরামর্শ আঁটে
কী করে সশব্দে ভেঙে পড়ে দেবে আমাদের জীবন্তে গোর।
আমি বাস্তুকার! ক্যাম্পে বসে অঙ্ক করি রাত্রি ভোর!
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে আমার সর্বহারা কুলিদল,
গাঁইতা ওঠে, গাঁইতা নামে—ভাঙ্গে আগল।
ওরা নির্বোধ! জানে না লাইনে স্লিপার পাতা
একচুল বিচ্যুতি নেই কোথাও! প্রতি পদক্ষেপে গাঁথা
আমাদের একতার মহামন্ত্র!

পাহাড়ের বুকে বসিয়েছি আমার থিয়োডোলাইট যন্ত্র—
তারই নির্দেশে গাঁইতা ওঠে, গাঁইতা নামে,
স্থির সম্মুখে চলেছি আমরা চাইনা ডাইনে বামে ॥

আর ভয় নেই ! পাহাড়ের বুক ভেদ করে এসেছে আওয়াজ
ওপারেও কারা যেন গাঁইতা চালাচ্ছে আজ !
দুর্ভেদ্য পাহাড়ের ওপারেও আছে নিঃস্ব কুলির বসতি
তারাও চায় হাত মেলাতে, চাইছে অগ্রগতি।
আমার অজেয় সেনার কানে বাজছে শহীদের শেষ আহ্বান,
ব্রীজের ভিত্তিমূলে যারা গেয়ে গেল মহাজীবনের গান।
যারা মাথায় করে তুলেছে এই লোহাবাঁধা পথ
আমরা ভুলিনি সেই মৃত্যুপথ যাত্রীদের শেষের শপথ !
নির্বোধ জড় শিলাস্তূপ ! দিন শেষ হয়েছে তোমার !
দুপারের কুলি গ্যাঙ হাত মেলাবে এইবার !
আর দুদিনেই, এই চাষী আর ঐ মিল কুলি
পাহাড়ের বুক চিরে গিয়ে করবে কোলাকুলি।
আর দুটি দিন ! তোমার হৃদপিণ্ড নিষ্পেষিত করে ছোটাব বাষ্পরথ !
টানেলের ক্ষতচিহ্ন বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে পুঁজিবাদী পয়মন্ত পর্বত ॥

॥ চৌদ্দ ॥

ডি. এম.-এর বাড়িতে এতগুলি গণ্যমান্য লোক যে তার জন্য এ ভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, সুজাতা তা স্বপ্নেও ভাবেনি। ঘরে ঢুকে তার এই প্রথম মনে হল এ সভার উপযুক্ত বেশবাস সে করে আসেনি। প্রকাণ্ড বড় হল-কামরাটাতে জনা বারো পুরুষ এবং জনা আষ্টেক মহিলা আগেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রত্যেকেই সাজ-পোষাকে একেবারে টিপটাপ। পুরুষরা স্যুটেড-বুটেড, একমাত্র ব্যতিক্রম নাট্যকার অরূপরতন স্বয়ং। সে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। মহিলাদের পরিধানে জর্জেট, বাঙ্গালোর সিল্ক, মুর্শিদাবাদী তো বটেই, একজন বেনারসী পর্যন্ত পরে এসেছেন। সুজাতার লালপাড় ধনেখালি শাড়িটা যেন এ সভায় বেমানান। রুজ পাউডার-লিপস্টিকে সুসজ্জিত

মহিলাবৃন্দের মাঝখানে সে রীতিমত একঘরে। তা হ'ক, সপ্রতিভতা হারাল না সুজাতা।

অরূপ প্রথামত তার পরিচয় করিয়ে দিল, এঁর কথাই বলছিলাম আপনাদের। সুজাতা চট্টোপাধ্যায়।

তারপর সুজাতার দিকে ফিরে বলে, আর এঁদের পরিচয় একে একে দিই। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবকে তো নিশ্চয়ই চেনেন। মনিবৌদি, মানে মিসেস্ ঘোষ। ডক্টর সান্যাল। ইনি রমেন গুহ, আমাদের সদর থানার ও. সি. এবং আমাদের নাটকের পরিচালক—নাট্যামোদী ব্যক্তি। মিস্টার সুব্রত রায়-চৌধুরী ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার, মিসেস রায় চৌধুরী। আমাদের মুন্সেফবাবু। ইনি এস. ডি. ও-নর্থ মিঃ রুদ্র। অধ্যাপক সুধীর নিয়োগী। ডিয়ার মি, আপনার নামটা—।

ভদ্রমহিলা হাত দুটি জোড় করে বলেন, রানী সেন, আমি এখানকার—

—হ্যাঁ জানি, এখানকার কলেজের অধ্যাপিকা। ফিলসফি পড়ান।

সুজাতা কিছু শ্রুতিধর নয়, যে এক নিঃশ্বাসে সবাইকে চিনে ফেলবে। সবার নামধাম পরিচয় মুখস্থ করে ফেলবে। এঁদের একজনকেও সে চেনেনা। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবকেও সে ইতিপূর্বে দেখেনি, চিনত না। তবে নামটা জানত, বিপুলানন্দ ঘোষ। আর চেনা লোকের মধ্যে পিছনের সারিতে বসে আছেন একজন—যার পরিচয় অরূপ দেয়নি। তার দুটো কারণ হতে পারে। অরূপের ভাষায়, প্রথমতঃ এক নিশ্বাসে যেসব নাম বলে গেছে তাঁদের সঙ্গে ওর নাম বলা যায় না; কিন্তু একটি মাত্র লোকের পরিচয় না দিয়ে এভাবে শেষ করাতেও কোন অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি। কারণ, দ্বিতীয়তঃ ধরে নেওয়া যায়, সুজাতা তাকে চেনে। তা চেনে; ম্যানেজার নকুল হুইকে যে এ পরিবেশে দেখবে স্বপ্নেও ভাবেনি। হংস মধ্যে, না বক নয়, হাড়গিলের মত এক কোনায় বসে আছে সে, তার গলাবন্ধ কোট গায়ে। বিচিত্র মাফলার গলায়।

অরূপ তার পরিচয় পর্ব শেষ করার পর সর্বপ্রথম যিনি কথা বললেন, তাঁকে এতক্ষণ লক্ষ্য হয়নি সুজাতার। অরূপও তাকে দেখেনি। তিনি বস্তুত কক্ষমধ্যে ছিলেন না। ভিতরের দরজায় নীরবে এসে দাঁড়িয়েছেন এইমাত্র। সেখান থেকেই বলে ওঠেন, আর নাট্যকার যার পরিচয় দিতে ভুলেছে সে হতভাগ্য বৃদ্ধটির নাম প্রসন্ন কুমার বাগ্‌চি।

অরূপ আসন গ্রহণ করেছিল। আবার উঠে দাঁড়ায়। বলে, আরে

আপনি কখন এসে চুপ্টি করে ওখানে দাঁড়িয়েছেন? সুজাতা দেবী, উনিই বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। যদিচ উনি একা আমাদের মনি-বৌদির দাদু কিন্তু সেই সুবাদে আমরা সবাই ওঁকে সার্বজনীন দাদুত্বে বরণ করেছি।

বাসুসাহেব রাণী সেনের পাশে বসতে বসতে বলেন, তা করেছ। এমন কি ছোট্ খুকি পর্যন্ত আজকাল আমাকে দাদু বলে ডাকছে। সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, ছোট খুকিকে চিনলে তো? ঐ যে তোমাদের সুলতার পার্ট করছে, মিস্ প্রণতি ঘোষ, মনির মেয়ে,—কই তাকে যে দেখি না বড়?

মিসেস্ ঘোষ, অর্থাৎ মনিবৌদি বলেন, ছোটখুকি এখনও আসেনি, ওর আজ প্র্যাকটিকাল ক্লাস ছিল। বাথরুমে আছে এখনই আসবে।

সুজাতা অবাক হয়ে দেখছিল ভদ্রলোককে। কত বয়স হবে? সত্তর পঁচাত্তর, না আশির কাছাকাছি? চুলগুলো ধবধবে সাদা, পিছনে ফিরানো। টাক পড়েনি কিন্তু। চোখে এক জোড়া রিমলেস পুরু লেন্সের চশমা। গোঁফ দাড়ি কামানো। কাল্‌চে নস্যিরঙের একটা স্যুট পরেছেন; তিন পীস্ স্যুটে। আজকাল যা নাকি বড় একটা কেউ পরেনা। টাই নয়, একটা বো বেঁধেছেন গলায়। কিন্তু সাজ পোষাক নয়, দর্শনীয় যা আছে তাঁর চেহারায়, সেটা ব্যক্তিত্ব। টুকটুকে পাকা বাদশাখাশ্ আম যেন একটি। এতলোকের মধ্যেও তিনি জনতার একাংশ নন, তিনি বিশেষ একজন।

ডি. এম. ঘোষ সাহেব বলেন, আপনার কথা মিস্টার মহাপাত্র অনেক আগেই বলেছিলেন, ঠিকমত যোগাযোগ হয়ে উঠছিল না। বস্তুত সুজাতা-চরিত্র করবার উপযুক্ত অভিনেত্রীর সন্ধান আমরা এতদিন কিছুতেই করতে পারিনি। কেউ কেউ কলকাতা থেকে প্রফেশনাল আর্টিস্ট আনাবার প্রস্তাবও করেছেন, কিন্তু আমার ঠিক তা পছন্দ হয়নি। আমাদের মধ্যে প্রফেশনাল আর্টিস্ট, মানে···মাঝপথেই থেমে যান উনি।

সুযোগ পেয়ে সুজাতা বল্‌তে যায়, আমি কিন্তু মানে, এতবড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট—

আবার নূতন উদ্যমে শুরু করেন ঘোষ সাহেব, বিলক্ষণ। আপনার সঙ্কোচ করার কিছু নেই! আপনি অনেক অভিনয় করেছেন, অনেক হাততালি কুড়িয়েছেন—সবই বলেছেন মিঃ মহাপাত্র।

সুজাতা অবাক হয়ে অরূপরতনের দিকে তাকায়।

অরূপ হেসে হেসে বলে, 'মাটির ঘরে' তন্দ্রা তো আমি নিজে চোখেই দেখেছি, 'দত্তায়' বিজয়ার পার্ট অবশ্য আমি নিজে দেখিনি, শুনেছি অনবদ্য অভিনয় হয়েছিল। কী? অমনভাবে চোখ পাকাচ্ছেন কেন? আপনার সামনে তো আর আপনার প্রশংসা করিনি।

এমন জলজ্যান্ত মিথ্যার সামনে দাঁড়িয়ে কি বলবে ভেবে পায়না সুজাতা।

পরিচালক রমেন গুহ বলেন, নাটকটা আপনার পড়া আছে তো?

অরূপ বলে, না, শুধু গল্পটা মোটামুটি ওঁকে বলেছি।

—যাইহোক আমরা বরং শুরু করি এবার।

নির্জীবের মত বসে থাকে সুজাতা! রাগে তার কপালের শিরাদুটো দপ্ দপ্ করতে থাকে। অরূপরতন এ কী বিপদে ফেলল তাকে!

রিহার্সাল শুরু হয়ে যায়। প্রথম দৃশ্যে সুজাতার প্রবেশ একেবারে শেষদিকে। মহড়া সুরু হতেই সবার দৃষ্টি সেদিকে চলে যায়, কলগুঞ্জন শব্দটা কমে আসে। তকমা আঁটা ধরাচূড়া পরা কয়েকজন চা-বিস্কুট-কফি-স্যানড্‌উইচ পরিবেশন করতে থাকে। কে জানে এ বন্যাত্রাণের খরচে, না নাট্যামোদী ঘোষসাহেবের আতিথেয়তা। সুজাতা আচ্ছন্নের মত বসেই থাকে। হঠাৎ কানে যায় চাপা কণ্ঠস্বর, আপনি আমাকে একটু দেখিয়ে টেকিয়ে দেবেন ভাই, আমি কিন্তু এর আগে কখনও অভিনয় করিনি।

সুজাতা লক্ষ্য করে দেখে তার পাশের চেয়ারে রাণীদি এসে বসেছেন। সুজাতা প্রশ্ন করে, আপনি কি পার্ট করছেন?

—আপনার সতীন, অপর্ণা।

—সতীন? আমি তো শুনেছি আমাকে অবিবাহিতা অবস্থাতেই মরতে হবে আত্মহত্যা করে?

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হেসে ওঠেন রাণীদি। বলেন, অপর্ণা হচ্ছে বসন্তের স্ত্রী। বসন্তকে চেনেন তো? যার সঙ্গে আপনার 'ইয়ে' হয়েছিল।

সুজাতাও চাপা কণ্ঠে বলে, বসন্ত চরিত্রটিকে চিনি; কিন্তু কে সেই পার্টটা করছেন? মানে, কার সঙ্গে আমাকে ইয়ে করতে হবে?

রাণীদির হাসি আর রুমালে চাপা থাকেনা। আঁচলটাকে টেনে নিতে হয় ভদ্রমহিলাকে।

পরিচালক রমেনবাবু সুজাতাকে ডাকেন, এবার আপনার প্রবেশ। ওপাশে গিয়ে দাঁড়ান। ওইটে ভিতর দিক। আপনি ভিতর থেকে আসছেন এখন।

নির্দেশমত সুজাতা ওপাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে নকুল হুই দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। পাণ্ডুলিপি হাতে। সুজাতাকে দেখে এক গাল হাসে। এ নাট্যোত্তমে নকুল হুইয়ের কঠিন দায়িত্ব। সে এ অভিনয়ের স্মারক। সে নাকি নামকরা প্রম্পটার।

নিজের উপর সুজাতার প্রগাঢ় বিশ্বাস। মন করলে অসম্ভবকে সে সম্ভব করতে পারে। অরূপরতন তাকে যে বিপদের ভিতর ঠেলে দিয়েছে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার দুটি রাস্তা। হয় তাকে প্রথমেই অকুণ্ঠস্বরে স্বীকার করতে হয়, অভিনয় সে কখনও করেনি, অরূপ মিছে কথা বলেছে এবং অভিনয় সে করবে না। অথবা অরূপের মিথ্যের পশরা মাথায় তুলে নিয়ে তাকে দেখিয়ে দিতে হয় সে অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রাখে। মুহূর্তমধ্যে মনস্থির করে ফেলে সুজাতা। সে দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করবে।

মহড়ার মাঝখানে একসময় এসে উপস্থিত হল প্রণতি, মনিবৌদির মেয়ে। বছর আঠারো বয়স। সুজাতার সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। যেহেতু সুজাতার পার্ট জানা নেই, তার পরিচালক তার অংশটা মূলতঃ বাদ দিয়েই মহড়া দিলেন। দুচারবার শুধু ঠেকা দেবার জন্য সুজাতার ডাক পড়ল। যেখানে বসন্তের সঙ্গে অভিনয় সেখানে তার একটু আড়ষ্টতা এল যেন। নাট্যকার স্বয়ং যে বসন্তের চরিত্র করছে এটা জানা ছিল না তার।

মহড়া শেষে রমেনবাবু বলেন, নাটকের দ্বিতীয় কপি কতদূর হয়েছে ?

রাণীদি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলেন, প্রথম অঙ্কটা শেষ হয়েছে। আমার আবার পরীক্ষার খাতা এসে গেছে কিনা, তাই বেশী এগোয়নি।

ঘোষসাহেব বলেন, আপনার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এদেরই ভুল হয়েছিল আপনাকে গছানো। ওটা আমাকে দিন, কোন কেরানিকে দিয়ে রাতারাতি কপি করিয়ে দেব।

এস. ডি. ও রুদ্রের দিকে ফিরে বলেন, তোমার অফিসে বাঙলা হাতের লেখা ভাল কার ?

রুদ্র তৎক্ষণাৎ বলে, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। আমি কপি করিয়ে দেব। একেবারে কার্বন ফেলে একসঙ্গে তিন কপি। হাত বাড়িয়ে নকুল হুইয়ের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটা গ্রহণ করেন তিনি।

রমেনবাবু বলেন, কিন্তু স্যার, আজতো ওটা দিতে পারব না। আজ নাটকটা সুজাতা দেবী নিয়ে যাবেন। সবার আগে তাঁর পড়া দরকার।

সুজাতা হাত বাড়িয়ে নাটকটা নিয়ে বলে, পড়ে নিতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। ঠিক আছে আমিই না হয় এক কপি করে দেব। আমি তো বেকার মানুষ। সারাদিনই আমার সময় আছে।

বাসুসাহেব বলেন, এই জন্যেই বলে নারী হচ্ছে শক্তি-স্বরূপা!

ঘোষসাহেব তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন, এটা কেমন কথা হল দাদু? আমরা এতগুলি প্রাণী যে প্রাণপাত করে—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, কী আশ্চর্য! সেই কথাই তো বলছি আমি! তোমরা পুরুষ মানুষের দল বড় জোর প্রাণ পাত করতে পার, প্রাণ দান করতে পারনা! তোমরা এতগুলি পুরুষ দ্বিতীয় কপিটা করতে কেউই সাহস পেলে না। সেটা করলেন অর্ধেক রাণীদেবী অর্ধেক সুজাতা। তোমাকে নাম ধরে ডাকছি বলে কিছু মনে করছ না তো?

সুজাতা জবাব দেবার আগেই রাণীদি বলে ওঠেন, উনি কিছু মনে করছেন না, কিন্তু আমি করছি দাদু। আপনি আমাকেও নাম ধরে ডাকছেন না বলে।

—বেশ বেশ, এবার থেকে তাই ডাকব।

ঘোষসাহেব বলেন, আমি কিন্তু আপনার মূল বক্তব্যটা মেনে নিতে পারিনি, দাদু। রাণীদেবী এবং সুজাতা দেবী অনুলিপিই করছেন, কিন্তু নাটকটা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি মহিলা নন, পুরুষ—

—তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। নাট্যকারকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। তিনি নিশ্চয় ঐ নাটক লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন কোন একটি মহিলার কাছ থেকেই। নাটকের নায়িকা সুজাতাকে তিনি বাস্তব জীবনে দেখেছেন নিশ্চয়, অন্য কোনও নামে, অথবা অন্য কোন পরিবেশে। নাটকসৃষ্টির মূল প্রেরণা তো জুগিয়েছেন সেই মহিমময়ী নারীই। নাট্যকার তো উপলক্ষ্য মাত্র।

সকলের দৃষ্টি পড়ে নাট্যকারের দিকে। অরূপরতন লজ্জা পায়, কারণ পূর্ব মুহূর্তেই সে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে ছিল সুজাতার দিকে। সুজাতাও তাকিয়ে ছিল নাট্যকারের দিকে।

আগামীকাল ঠিক ছয়টার সময় পুনরায় সমবেত হবার নির্দেশ সমেত সভা ভঙ্গ করা হল। ফেরার পথে অরূপ বলে, আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি। কি ভাবে ক্ষমা চাইব বুঝে উঠতে পারছি না।

সুজাতার রাগ পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে ভাব গোপন করে বলে, আপনি আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেবার জন্য রীতিমত 'আনফেয়ার মীনস্' নিয়েছেন।

অরূপ আর সুজাতা বসে ছিল পিছনের সীটে। গাড়ি চালাচ্ছে বিশু। অরূপ যথেষ্ট ব্যবধান রেখে বসেছে। সেখান থেকেই একটু ঝুঁকে পড়ে বলে, আমি ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, কিন্তু ডিফেন্সেই আমি সাধারণতঃ কাজ করি। ফলে কারও গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া আমার ধর্ম নয়। দ্বিতীয়তঃ, ফাঁস অনেক জাতের হয়, ফুলের মালাও একজাতের ফাঁস। তৃতীয়তঃ জীবনের দুটি ক্ষেত্রে 'আনফেয়ার' বলে কোন কিছু নেই।

সুজাতা চোখ পাকিয়ে বলে, জানি। ঐ ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটির শেষ কথা হচ্ছে 'ওয়ার', যুদ্ধ! সুতরাং আপনি আমার শত্রুপক্ষ। এ ক্ষেত্রে আপনার তরফে ক্ষমা চাইবার তো অবকাশ নেই। আমিও তক্কে তক্কে থাকব, সুযোগ পেলেই এক লেংগীতে আপনাকে ধরাশায়ী করব!

দুজনেই হো-হো করে হেসে ওঠে।

অরূপই হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে, কিন্তু শুরুতেই প্রবাদ বাক্যটির একেবারে শেষ কথা বলেছি, তাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন? আপনি এটা 'ওয়ার' বলে ধরে নিয়েছেন এবং তাই 'রাগ' করছেন; কিন্তু 'ওয়ারের' পূর্বে তো আরও কিছু থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে 'রাগের' আগেও 'পূর্ব' যুক্ত হওয়া উচিত। তখন এটাকে আমার তরফে ক্রাইম বলে মনে হবে না নিশ্চয়ই, ফলে পানিস্‌মেন্টটাও অন্য ধরণের হবে!

হঠাৎ চমকে ওঠে সুজাতা।

ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেন্ট!

দৃষ্টি চলে যায় সামনের সীটে, স্টিয়ারিঙে বসে থাকা নির্বাক বোকা সোকা মানুষটার দিকে। লোকটা কে? আজ আর একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই—দিব্যি মোলায়েম করে কামানো। গায়ে পাটভাঙা নতুন সার্ট। আজ ওকে দেখে মনে হচ্ছে না যে ও একেবারে নিরক্ষর শ্রমজীবী। লোকটা কে? বংশবদ ড্রাইভার বিশু দাস, না ছদ্মবেশী এঞ্জিনিয়ার কৌশিক মিত্র? লোকটার সামনেই এতক্ষণ অরূপের সঙ্গে চাপা রসিকতা করে চলেছিল অসঙ্কোচে, কারণ ধরে নিয়েছিল—ও হচ্ছে বিশু দাস। হঠাৎ ঐ 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেন্ট' কথাগুলোর মনে হল লোকটা কি এতক্ষণ ওদের

কথোপকথনের অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিত সমস্তই অনুধাবন করছিল, আর মনে মনে হাসছিল।

—কই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না?

—আপনার বাড়ি এসে গেছে।

পরদিন সকালে ম্যানেজার নকুল হুইকে সুজাতা ডেকে পাঠালো। বেঁটে খাটো মানুষটি তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গলাবন্ধ কোট ও মাফলার এবং স্বকৃত সম্পত্তি ঝোলা গোঁফজোড়া নিয়ে এসে হাজির হল হাসি হাসি মুখে। সুজাতা বিনা ভূমিকায় সরাসরি বলে, বিশু দাস লোকটাকে কে এ্যাপয়েন্ট করেছে, আপনি?

—আজ্ঞে না, আমি কেন করব? খোদ মালিকই ওকে চাকরিতে বহাল করেছেন।

—ওর কোন সুপারিশ-পত্র ছিল?

—তা তো জানি না।

—আপনি ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ; পাঁচ বছরের নিদাগ লাইসেন্স।

—আপনি এক কাজ করুন তো। বিশুর কাছ থেকে তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা চেয়ে নিয়ে এসে আমার হাতে দিন।

—এখনই দিচ্ছি!

—আর শুনুন; আমি দেখতে চেয়েছি একথা ওকে বলবেন না। যদি প্রশ্ন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে কি হবে, তাহলে বলবেন—ওর চাকরী বর্তমানে অস্থায়ী, কিন্তু পার্মানেন্ট চাকরিতে ওর নাম সুপারিশ করার আগে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা কলকাতার হেড অফিসে দেখাতে হবে। বলবেন, আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসের হেড অফিসের এস্ট্যাবলিসমেন্ট সেকশন অরিজিনাল লাইসেন্সটা দেখতে চেয়েছে, এ্যাটেস্‌টেড কপিতে হবে না।

—ও যদি বলে, লাইসেন্স ছাড়া ও গাড়ি চালাবে না?

—তাহলে বলবেন, দুদিনের মধ্যেই ওটা আপনি কলকাতা অফিসকে দেখিয়ে এনে ফেরত দেবেন। এ দুদিন গাড়ি গ্যারেজ থেকে বার হবে না। তাহলে আপত্তির কিছু থাকবে না। বুঝেছেন? আমি যে দেখতে চেয়েছি, সে-কথা বলবেন না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি বইকি।

নকুল হুই লোকটাকে দেখতে কেমন যেন। কিন্তু লোকটার একটা গুণ আছে অহেতুক কৌতূহল নেই। চাউনিটা একটু অদ্ভুত রকমের। যেন চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায়। তবে সে জন্য বোধ করি ওর দোষ নেই; সেটা ওর সৃষ্টিকর্তার হাতের খুঁত।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লাইসেন্সটা এনে দিল নকুল হুই। সুজাতা সকাল থেকে নাটকটা পড়বার জন্য বার বার সেটা খুলে বসেছে; কিন্তু একটা পাতাও তার পড়া হয়নি। তার মনে 'অকাল বসন্ত' নেই; সে শুধু ভাবছে—লোকটা কে? বিশু দাস, না কৌশিক মিত্র? যদি ও নির্বোধ নিরক্ষর বিশু দাসই হয় তবে তার গাড়ির ড্যাসবোর্ডে কৌশিক মিত্রের নামাঙ্কিত 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেণ্ট' বইটা আসে কেমন করে? আর অরূপরতনই বা তাকে কৌশিক মিত্র বলে ভুল করবে কেন? দ্বিতীয়তঃ ও যদি কৌশিক মিত্রই হবে তাহলে এমন ছদ্মবেশে সে এসে পঞ্চাশ টাকার ড্রাইভারের চাকরিই বা করবে কেন? রাশিয়ান এঞ্জিনিয়ারের নামটা পর্যন্ত সে 'উরুশ্চারণ' করতে পারে না! কৌশিক মিত্র এঞ্জিনিয়ার! সেও কি এসেছে ঐ রিসার্চের কাগজগুলোর সন্ধানে? নিজে থেকে আসেনি নিশ্চয়। তাকে কেউ এ কাজে নিয়োগ করেছে। কে সে? কে আবার? নিঃসন্দেহে আগরওয়াল! নিজে দূরে সরে আছে, আর একজন দক্ষ এঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েছে নিরক্ষর মূর্খ একজন ড্রাইভারের ভেক ধরে। আর সবচেয়ে মজার কথা সুজাতা দিব্যি এ ফাঁদে পা দিয়ে বসেছিল। সে অতি নিশ্চিন্তমনে ঐ বিশু দাসের কাছেই তার 'পরশমণি' গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিল। আচ্ছা, লোকটা রাজী হল না কেন? বোধ হয় লোকটা অতিশয় ধূর্ত। সুজাতা যতটা ভাবছে তার চেয়েও বেশী। লোকটা আশঙ্কা করেছিল, সুজাতা তাকে সন্দেহ করেছে, আর তাই পরখ করে দেখতে চাইছে প্রথম সুযোগেই সেই গোপন রিপোর্টগুলো হাতাবার জন্য বিশু দাস অতি আগ্রহ প্রকাশ করে কিনা। আসলে সুজাতা কিন্তু তা ভাবেনি; সে সরল মনেই বিশুর কাছে কাগজগুলি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল; ভেবেছিল ওর কাছ থেকে সেগুলো খোয়া যাবার ভয় কম। কিন্তু বিশু দাস নিশ্চয় ভেবেছিল এভাবে ফাঁদ পেতে সুজাতা তাকে পরখ করতে চাইছে। তাই প্রথম প্রস্তাবে সে রাজি হয়নি। অথচ একেবারে প্রত্যাখ্যানও করেনি। সেও একটা টোপ ফেলে দেখতে চেয়েছিল সুজাতা সে-টোপ খায় কিনা। তাই শহর-প্রান্তের গোপন বাগানবাড়িটা

তখনই দেখিয়ে নিয়ে এল। যদি বাগানবাড়িটার গোপনীয়তায় প্রলুব্ধ হয়ে সুজাতা সেখানেই রিপোর্টটা লুকিয়ে আসতে চায়, তাহলে ঐ দ্বীপান্তর ফেরত মুসলমান দারোয়ানের মারফৎ সে খবর পাবেই, এবং তখনই কৌশিকের তৎপরতা শুরু হবে।

অবশ্য এ সব কথা ধরে নিতে হবে যদি বিশু দাস আসলে কৌশিক মিত্র হয়। সুজাতা মনস্থির করে। বিশু দাসকে যে সে সন্দেহ করেছে এটা তাকে জানতে দেওয়া হবে না। সবার আগে তার পরিচয়টা নিশ্চিত ভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে সে সোজা চলে এল থানায়। গাড়িতে নয়, একখানা সাইকেল রিক্সা করে। সদর থানার বড় দারোগা রমেন গুহ ওকে দেখে অবাক হন। এখানে তিনি 'অকাল বসন্ত' নাটকের পরিচালক নন, ধড়া-চূড়া-আঁটা জাঁদরেল পুলিস অফিসার। বলেন, কী ব্যাপার? একেবারে থানায় এসে হাজির?

ঘরে আর কেউ ছিল না। সুজাতা তবু চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, এসেছি একটা অত্যন্ত গোপন এবং জরুরী কাজে। আপনার বেশী সময় নেব না; কিন্তু আমার একটা উপকার করতে হবে—

—বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?

ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে সুজাতা বার করে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। বলে, এই ড্রাইভিং লাইসেন্সটা হচ্ছে আমাদের ড্রাইভারের। মাত্র দিন কতক হল তাকে আমরা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। জানেন নিশ্চয়, আমি মিস্টার এম. কে. আগরওয়ালের সঙ্গে একটা ব্যবসাসূত্রে—

—শুনেছি। আপনার বাবা কি একটা আবিষ্কার করেছেন। আগরওয়াল সেই নিয়ে আপনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায়।

—হ্যাঁ; এই ড্রাইভারটিকে মিঃ আগরওয়ালই চাকরি দিয়েছেন। বিশেষ একটি কারণে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এ ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আসলে বিশু দাসের নয়—

রমেনবাবু একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সে আবার কি কথা? কই দেখি লাইসেন্সটা?

সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে রমেন বাবু বলেন, এমন অদ্ভুত ধারণা কেন হল আপনার?

—সে অনেক কথা। আপনি একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কি যে এই ফটোটা বিশু দাসের কিনা, এবং এই লাইসেন্সটা বিশু দাসের কিনা।

রমেন বাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে তার কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। এই ফটোটা বিশু দাসের কিনা, এবং লাইসেন্সটা বিশু দাসের কিনা এসম্বন্ধে খোঁজ নেবার কিছু নেই। আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন আপনার ড্রাইভার বিশু দাস কিনা তাই খোঁজ নিতে, নয়?

—হ্যাঁ তাই।

—তা আমি আপনার ড্রাইভারকে তো দেখিনি; আপনি দেখেছেন। আপনি বলতে পারেন না এটা তার ফটো কিনা?

—হ্যাঁ, তারই ফটো।

—তবে আর আপনার প্রশ্নটা থাকছে কি?

সুজাতা একটু ঘেমে ওঠে; কি বলবে ভেবে পায় না।

চশমাটা আবার নাকের উপর বসিয়ে রমেন দারোগা বলেন দেখুন সুজাতা দেবী, কোন লোকের আইডেন্টিটি এস্ট্যাবলিস্ করতে হলে আমরা তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের শরণ নিই! আপনি কি আদালতে হলফ করে বলতে পারবেন যে এই ড্রাইভিং লাইসেন্সে আটকানো ফটোটা যাঁর তিনি আর আপনার ড্রাইভার অভিন্ন ব্যক্তি?

—হ্যাঁ, বলতে পারব!

—তাহলে আর খোঁজ খবর করার কোন মানে হয় না। আপনার স্বীকৃতির অনুসিদ্ধান্ত—আপনার ড্রাইভারের নাম বিশু দাস, এবং এটা তারই ড্রাইভিং লাইসেন্স, এ সই তারই। ড্রাইভিং লাইসেন্স একটা লোকের আইডেন্টিটি সম্বন্ধে শেষ কথা!

সুজাতা বলে, মিস্টার গুহ, কারেন্সি নোটই একটা মানুষের আর্থিক সঙ্গতির শেষকথা, কিন্তু জাল নোট কি বাজারে পাওয়া যায় না?

—জাল? আপনার সন্দেহ এ ড্রাইভিং লাইসেন্সটা জাল?

—আমি জানি না! হলেও অবাক হব না।

—ওটা আর একবার দেখি?

আলোর সামনে অনেকক্ষণ ধরে সেটা পরীক্ষা করে আবার সেটা ফিরিয়ে দেন অভিজ্ঞ দারোগা, বলেন, আমার ষোলো বছরের পুলিসের চাকরি আর

আট বছরের দারোগাগিরি যদি বৃথা না হয়, তবে আমি বল্‌ব এ ড্রাইভিং লাইসেন্সের এক তিলও জাল নয়।

সুজাতা বলে, এরপর আমার কিছু বলা বোধহয় শোভন হচ্ছে না। তবু আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?

—বলুন না। আমি তো আপনাকে সাহায্য করতেই প্রস্তুত।

—আমার সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এ ফটোটা যাঁর, তাঁর নাম শ্রীকৌশিক মিত্র। তিনি দু-বছর আগে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজ থেকে বি. ই পাশ করেন। তিনি ভাল ক্রিকেট খেল্‌তে পারেন। আপনি কি এ বিষয়ে একটু খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে পারেন না?

রমেনবাবু চুপ করে একটু ভেবে নেন, তারপর বলেন, বেশ, তাহলে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা জমা রেখে যান।

—কতদিন রাখবেন এটা?

—কালই ফেরত পাবেন। আমি এটার একটা ফটো-স্ট্যাট কপি করিয়ে কালকেই ফেরত দিতে পারব। শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজে ছবিখানা নিয়ে গেলেই বোঝা যাবে। দু-বছরের ব্যাপার, অনেকেই কৌশিককে চিনবে। দিন সাতেক পরেই পাকা খবর দেব।

—এই ফটো তোলাতে বা অন্যান্য কারণে আপনার নিশ্চয়ই অনেক খরচ হবে। আপনার কাছে কিছু টাকা রেখে যাই। কত দেব?

সুজাতা ব্যাগটা খোলে—

—না না। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। এ সব কাজ করাতে যা খরচ লাগে, তা আমি সরকারী তহবিল থেকে পাই।

—কিন্তু এটা তো সরকারী কাজ নয়।

—আপনাকে অতটা ক্রিটিকাল হতে হবে না। সে আমি বুঝব।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সুজাতা উঠে পড়ে।

—নাটকটা পড়েছেন?

—না। এখনও পড়া হয়নি, এইবার পড়ব।

—বুঝেছি! বাঙলা নাটক পড়া আপনার ধাতে সয়না, না? বড় জ'লো জ'লো লাগে। তারচেয়ে ইংরাজি ডিটেকটিভ নভেল অনেক বেশী ইন্টারেস্টিং।

সুজাতা হেসে বলে, একথা কেন বলছেন?

—আপনার অদ্ভুত ব্রেণওয়েভ দেখে।

সুজাতা আবার হাসে, জবাব দেয় না। নমস্কার করে বেরিয়ে আসে।

॥ পনের ॥

দিন সাতেক পরের কথা।

এ কয়দিনে সুজাতার মনের মেঘ একেবারে কেটে গেছে। কৌশিক মিত্র আর বিশুদাসের দ্বৈতসত্তা নিয়ে কদিন বেচারি ভাল করে ঘুমাতে পর্যন্ত পারেনি। বিশু দাসকে সে রীতিমত এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল। বিশুও তার লাইসেন্স জমা দেওয়ার পর কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিল। সেও এ কদিন যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আজ রমেন গুহর সঙ্গে খোলা কথা বলে সুজাতার মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল।

রমেনবাবু ছঁদে দারোগা। আঁটঘাট বেঁধেই কাজ করেছেন তিনি। সমস্যাটাকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করেছেন এবং সব কাগজ পত্র নিয়ে নিজেই চলে এসেছিলেন সুজাতার কাছে। বলেছিলেন, আশ্চর্য ব্যাপার। আমিও তাজ্জব বনে গেছি। আপনি কৌশিক মিত্রের খবর কোথা থেকে পেলেন জানিনা, কিন্তু আপনার ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল। কৌশিকের কথা আপনি কার কাছে শুনলেন বলুন তো?

সুজাতা প্রতি প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি জানতে পেরেছেন, তাই বলুন আগে। সে কথা শুনে—

—না না, শোনা কথা নয়, আমি সব কাগজ পত্র নিয়ে এসেছি; নিজেই দেখে নিন আপনি—

হ্যাঁ, সুজাতার খবর ঠিকই! দুবছর আগে শিবপুরের বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজ থেকে কৌশিক মিত্র নামে একটি ছেলে পাশ করে বেরিয়েছে। ছাত্র ভালো। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। কবিতা লিখত কৌশিক। ক্রিকেটও খেলত। তার বাবার নাম শ্রীজগদানন্দ মিত্র, এম. এস্‌সি; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। রিটায়ার করেছেন। এখনও বেঁচে আছেন। থাকেন কাশীতেই। ভাই বোন আর কেউ নেই কৌশিকের। বিয়ে করেনি। বর্তমানে সে কোথায় আছে সে খবর এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজের ওর এক সহপাঠির কাছে কৌশিকের একখানা ফটো

পাওয়া গেছে। ফটোখানা রমেনবাবু নাটকীয়ভাবে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, এই হ'ল আপনার এক্সিবিট নম্বর ওয়ান!

ফটোটা হাতে নিয়ে সুজাতা অবাক হয়ে যায়। একটি গ্রুপ ফটো। তিনজন ছাত্র। প্রত্যেকেরই কনভোকেসন গাউন পরা। নিচে তিনজনের নাম 'চাইনিস ইংক' কালিতে সুন্দর করে লেখা। প্রত্যেকের নামের পাশেই বি. ই অক্ষর দুটি সযত্নে লেখা। বাঁ দিকের ছেলেটির নাম সুকমল দত্ত, ডানদিকের ছেলেটির নাম জীবন বসু। মাঝখানে কৌশিক মিত্রের নাম লেখা। অথচ ছবিটা হুবহু বিশুদাসের! তফাৎ শুধু এই যে কৌশিক মিত্রের সরু গোঁফ আছে, তার চোখে চশমা এবং কপালে একটা কাটা দাগ। গোঁফ আর চশমা একটা মানুষকে সনাক্ত করতে সাহায্য করেনা, বরং ছদ্মবেশ ধারণেই সাহায্য করে; কিন্তু কাটা দাগটা?

সুজাতা অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, এই ফটো আর ড্রাইভিঙ লাইসেন্সের ফটো যে এক লোকের নয়, তা কেমন করে বুঝলেন?

—বুঝলাম, দ্বিতীয় অনুসন্ধানের সূত্র থেকে। এই হচ্ছে (আপনার) এক্সিবিট নম্বর দুই!

সুজাতা দেখে একখানা টাইপ করা ইংরাজি চিঠি। সরকারী হলুদরঙের ছাপা কাগজে টাইপ করা। লিখছেন ও. সি. হাবড়া। এখানকার ও. সি-কে। উপরের রবার স্ট্যাম্পে ছাপ মারা 'একান্ত-গোপনীয়'। চিঠির বিষয়বস্তু:

"আপনার উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে শ্রীবিশ্বনাথ দাস, ওরফে বিশু দাস আপনার পত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় বাস করিত। তাহার পিতা শ্রীরঘুনাথ দাস এখনও জীবিত। সে উদ্বাস্তু, এখানে ঐ ঠিকানায় সে আজ পনের বৎসর বাস করিতেছে। বিশ্বনাথের বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ। এখানকার স্থানীয় স্কুলে সে নিচের দিকে দুই এক বৎসর পড়িয়াছে। মোটর ড্রাইভিং জানে। বিভিন্ন স্থানে ড্রাইভার হিসাবে কাজ করিয়াছে। তাহার পিতা রঘুনাথের জবানবন্দী অনুসারে জানাইতেছি, বিশ্বনাথের শেষ পত্র সে ভিলাই হইতে পাইয়াছিল। গতমাসে সে পিতাকে মনিঅর্ডার করে নাই। তাহার বর্তমান ঠিকানা সে জানেনা, তবে আপনার শহরে যে আছে এই তাহার বিশ্বাস। আপনার নির্দেশমত বিশ্বনাথের একটি ফটো সংগ্রহ করিয়াছি। এই সঙ্গে পাঠাইলাম। তাহার পিছন দিকে আমার সই আছে। প্রয়োজনবোধে

আপনি তাহার কপি করাইয়া মূল আলোকচিত্রটি আমাকে ফেরত ডাকে প্রত্যার্পণ করিবেন, কারণ তাহার পিতাকে উহা প্রত্যর্পণে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রঘুনাথের কথামত এ ছবি মাসছয়েক পূর্বে ভিলাইয়ে একজন রাশিয়ান ভদ্রলোকের তোলা। এ বিষয়ে আর কোন জ্ঞাতব্য থাকিলে অসংকোচে আমাকে জানাইবেন।

চিঠির সঙ্গে জেমক্লিপ দিয়ে আটকানো একটি ফটো। সেটা উল্টে সুজাতা পিছন দিকটা দেখবার উপক্রম করতেই রমেনবাবু বলেন, আপনি পাকা ডিটেকটিভ্-নভেলের পাঠক। সইটা আমিও পরখ করেছি!

ছোট্ট চৌকা ফটো। প্রকাণ্ড একটা মার্সেডিস্ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথ দাস। গোঁফ নেই, চশ্মা নেই, কপালে কাটা দাগ নেই—না হলে সে ছবি হুবহু কৌশিক মিত্রের!

রমেনবাবু বলেন, আপনি কি শুধু ডিটেকটিভ গল্পই পড়েন, না ইংরাজি নভেলও পড়েন?

—কেন বলুন তো?

—তাহলে প্রশ্ন করতাম, এ্যান্টনি হোপের 'দ্য প্রিস্‌নার অফ্ জেণ্ডা' পড়েছেন কি না।

—পড়েছি। আমি বরং প্রতিপ্রশ্ন করি, আপনি কি বাঙলা উপন্যাস 'ঝিন্দের বন্দী' পড়েছেন?

রমেনবাবু বলেন, এবার বলুন, কৌশিকের সন্ধান কেমন করে পেলেন?

সুজাতা বলে, তার কি আর কোন প্রয়োজন আছে?

—আছে কি না আপনি বলতে পারেন। যদি চান, আমি আরও খবর সংগ্রহ করতে পারি। মার্সেডিস্ গাড়িটার নম্বরও পড়া যাচ্ছে। ঐ সূত্র থেকে ভিলাইয়ে খবর করে জানতে পারি কোন রাশিয়ান অফিসারের ড্রাইভার ছিল এই বিশু দাস এবং এ ফটোখানা সত্যিই তাঁর তোলা কি না!

—আমার মনে হচ্ছে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। এ প্রকৃতির একটা খেয়াল। 'বিনিয়োগ প্রথা' আজ আর নেই, তবু যে করেই হ'ক দুটি ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন মানুষকে বিধাতা একেবারে একই ছাঁচে ঢেলেছেন। আমার ড্রাইভারকে আমি অহেতুক সন্দেহ করেছিলাম।

—কোন সংশয় নেই তো আপনার?

—এর পর আর সংশয় থাকবে কেমন করে বলুন?

—তা ঠিক!

রমেনবাবু বিদায় নেবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল সুজাতা। কী অদ্ভুত প্রকৃতির খেয়াল! অরুণরতন খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশু দাসকে ভুল করেছিল কৌশিক মিত্র বলে। আর তা থেকেই সুজাতার মনে হয়েছিল কৌশিক মিত্র বিশু দাসের ছদ্মবেশে ব্যাপির রিসার্চের কাগজগুলির সন্ধানে এসে হাজির হয়েছে! নিজে থেকে আসেনি, মানে আগরওয়ালই তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে। আগরওয়াল লোকটার অতীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছে এতদিনে। বুঝেছে তার বিষয়ে মাথা গলানোই ভুল হয়েছিল সুজাতার। এখন অবশ্য বেরিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়। তবু জাল কেটে তাকে বেরিয়ে যেতেই হবে। তা সে যাই হোক, আগরওয়ালই ঐ লোকটাকে এখানে পাঠিয়েছিল, এ ধারণাই হয়েছিল তার। আসলে এ আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে তার কল্পনা প্রসূত।

মনের মেঘ সরে যাবার পর বিশু দাসকে আবার ডেকে পাঠিয়েছিল। খবর পেয়ে বিশু এসে দাঁড়ায় হাসি হাসি মুখে, বলে, ডাকছিলেন ম্যাডাম?

—হ্যাঁ, দেখ ভাবছি গাড়ি চালানো শিখব। চুপচাপ বসেই তো আছি সারাদিন, আমাকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দাও না?

অভ্যাসমত বিশুর ডান হাতটা চলে যায় ঘাড়ের কাছে, বলে, এ আর বেশী কথা কি? আপনি একটা 'লার্নার্স লাইসেন্স' করিয়ে দিন। কাল থেকেই শুরু করে দিতে পারেন। সাত দিনেই শিখে যাবেন। তবে তারপর আমার চাকরিটা থাকবে তো?

হো-হো করে হেসে উঠেছিল সুজাতা, বলে, থাকবে না? তখন তো তুমি আমার গুরু হয়ে যাবে। গুরু বিদায় কি লোকে গলায় হাত দিয়ে করে?

এক গাল হাসলে বিশু।

সুজাতা এরপর সেই কাজেই মেতে উঠেছিল। গাড়ি চালানো শিখতে হবে তাকে। সকালে ও সন্ধ্যায় রাস্তায় ভীড় থাকে। দুপুর বেলায় নির্জন রাস্তায় ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ত ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে।

এই গাড়ি চালানো শিখতে গিয়েই একটা নতুন অনুভূতির সম্মুখীন হল সুজাতা। যেটার কথা ও সজ্ঞানে নিজের কাছেই স্বীকার করেনি প্রথমটায়। মাঝে মাঝে কেমন যেন অবশ হয়ে যেত ওর দেহ মন। যখন স্টিয়ারিঙে ওর ম্যানিকিওর করা নরম আঙুলের উপর হঠাৎ বলিষ্ঠ হাতটা

চাপা দিয়ে বিশুদাস ঘুরিয়ে দিত চাকাটা। গাড়িটা আচমকা বাঁক নিত। বিশুদাস ধমকে উঠতো, স্টিয়ারিং ঠিক থাকে না কেন? ঠিকমতন ঘোরাতে না পারলে খানায় গিয়ে পড়বেন যে!

সুজাতা চমকে উঠত, মনে হত গাড়ির স্টিয়ারিঙ নয়, বিশু আসলে বলতে চাইছে সুজাতার মনের স্টিয়ারিঙের কথা। সেই টাই-রডেও কোথায় যেন একটা নাট্ আলগা হয়ে গেছে। মনের উপর সুজাতার যথেষ্ট জোর আছে; কিন্তু সেই মনটা আজকাল যেন তার ইচ্ছায় ঠিক মত ঘুরছে না। যেন টাল্‌মাটাল গাড়ির স্টিয়ারিঙটার মত সে নিজের ইচ্ছায় ঘুরতে চাইছে। কিন্তু তার ইচ্ছামত ঘুরতে দিলে, ঠিকই বলেছে বিশু, সুজাতা যে খানায় গিয়ে পড়বে একেবারে।

এ কী হল সুজাতার? এ কী হতে চলেছে?

সতের বছরের কিশোরী মেয়েটি সে নয়! তবু একটা অনুভূত আবেশে সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ছে আজকাল। অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসতে হয় দুজনকে, গায়ে গা লাগা অস্বাভাবিক নয়। গাড়ি চালানো শিখতে গেলে এসব হবেই; কিন্তু—

বিশুদাস অসঙ্কোচে ওর ডান পায়ের পাতাটা দুহাত দিয়ে আলতো করে তুলে বসিয়ে দেয় এ্যাকসিলেটারে, বলে, চাপ দিন, একটু একটু করে চাপ দিন —অমন হঠাৎ দিলে হবে না, দাঁড়ান দেখাই—

ওর পায়ের উপর হাত রেখে অল্প অল্প করে চাপ দেওয়া শেখায়! সুজাতার মনে হয় সে চাপ শুধু এ্যাকসিলেটারে পড়ছে না। হঠাৎ পা টেনে নিয়ে বলে —পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

—তাতে কি হয়েছে, আপনি তো বামুন!

—তা হ'ক, তুমি বয়সে বড়! সম্পর্কে এখন তুমি আমার গুরু!

এসব সঙ্কোচ থাকলে সাতদিনে আপনাকে আমি শেখাতে পারব না কিন্তু, তা আগেই বলে দিচ্ছি!

—সাত দিনে না হয় নাই হল, পায়ে হাত দিও না তুমি। তাছাড়া আমার সুড়সুড়ি লাগে।

তড়াক্ করে নেমে পড়ে বিশু, রাগ করে, সরে বসুন।

সুজাতা অবাক হয়ে বলে, কেন কি হল?

—আপনার দ্বারা হবে না! ওসব সুড়সুড়ি কাতুকুতুর ভয় যাদের অত বেশি, তাদের আবার গাড়ি চালানো শিখতে আসা কেন?

সুজাতা চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি শেখাতে পারছ না, তাই বল। অন্য কোন ড্রাইভার হলে এতদিনে আমাকে ঠিক শিখিয়ে দিত।

বিশু দাস ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিঙে বসে, বলে, তাহলে কোন 'মোটর ড্রাইভিং স্কুলে' ভর্তি হন গিয়ে। আমার দ্বারা হবে না!

সুজাতা মুখ টিপে হাসে। বলে কিন্তু গম্ভীর হয়ে, তাই ভর্তি হতে হবে আমাকে। তুমি কিছুই শেখাতে পারছ না। শুধু পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছ!

বিশু ততক্ষণে গিয়ার বদলে হু-হু শব্দে ফিরে চলেছে বাড়ির দিকে। সেও রাগ করে বলে, ড্রাইভিং স্কুলের মাস্টারেও আপনাকে শেখাতে পারবে না। আপনার মাথায় গোবর পোরা।

সুজাতা রাগ দেখিয়ে বলে, দাঁড়াও আগরওয়াল আসুক! তাকে বলে তোমার চাকরি খতম করব আমি! তুমি বলেছ আমার মাথায় গোবর পোরা!

ঘ্যাঁচ করে গাড়িটা বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বিশু গাড়ি থামিয়ে বলে, আপনি তো বেশ লোক! এই বলছেন, তুমি আমার বয়সে বড়, তুমি আমার গুরু! তা গুরু কি শিষ্যকে ধমকও দেবে না? তবে আপনি শিখবেন কেমন করে?

—আর শিখে কাজ নেই। নাও চল এখন, বাড়ি চল। খানায় ফেল না গাড়িটা! তোমার কাছে শিখব না আমি!

কিন্তু তার পরদিন দেখা যায় গুরু শিষ্য আবার বসেছে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে!

বিশু দাস যেন মানুষ নয়, একটা মেশিন, ভাবে সুজাতা।

দুজনেই যখন স্টিয়ারিঙ ধরে চালাতে থাকে তখন উৎসাহের আতিশয্যে লোকটা খেয়ালই করেনা যে তার দেহের চাপ পড়ছে সুজাতার গায়ে। তার ডান হাতের কনুই বোধকরি অনুভব করে না অসতর্ক কঠিন স্পর্শে সুজাতার বুকের স্পন্দন, কিন্তু সুজাতার কান গরম হয়ে ওঠে। বিশু তার দিকে ফিরে যখন নির্দেশ দিতে থাকে তখন তার নিঃশ্বাস এসে লাগে সুজাতার আরক্তিম কপোলে, রোস্টেড টোব্যাকোর কড়া গন্ধ এসে আঘাত করে সুজাতার ঘ্রাণে—সুজাতা যেন অবশ হয়ে যায়। শিক্ষানবিশির পাঠ শেষ হলে যখন বিশু দাসের বাহুবন্ধ থেকে মুক্তি পায় সুজাতা, তখন যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায় তার দেহমন। সে ক্লান্তি যে শুধুমাত্র গাড়ি চালানো শিখতে যাওয়ার দৈহিক শ্রম এটাই নিজেকে বোঝাতে চায় সুজাতা; কিন্তু মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, মনকে চোখ ঠারছে না তো?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুজাতা রোমন্থন করতে থাকে সারাদিনের অনুভূতি-গুলোকে। হঠাৎ মনে পড়ে যেত আগরওয়ালের প্রথম দিনের সেই অশ্লিল রসিকতাটা। লেডি চ্যাটার্লি আর তার প্রেমাস্পদ! ওর মন বিদ্রোহ করে উঠ্‌ত, বলত এ অন্যায়, এ চিন্তা অশুচি; কিন্তু ওর অবচেতন মন হঠাৎ বলে বসত,—কী ক্ষতি হত দুনিয়ার, যদি বিধাতা ভুল করে বিশু দাসকে গড়তেন কৌশিক মিত্র করে?

পরদিন সকালে সুজাতা একটি টেলিফোন পেল স্থানীয় পোস্ট অফিস থেকে। তার প্রেরিত একটি পাঁচশো টাকার ইন্‌সিওর্ড পার্সেল প্রাপককে খুঁজে না পাওয়ায় ফেরত এসেছে। সুজাতাকে পোস্ট অফিসে গিয়ে সেই প্রত্যাখ্যাত ইন্সিওর্ড পার্সেলটা নিয়ে আসতে হবে। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে গেলেই ভাল হয়, কারণ বীটের পিয়নরা তাকে সনাক্ত করতে পারবে তাহলে।

তৎক্ষণাৎ বিশুকে ডেকে গাড়ি বার করতে বলে সুজাতা পনের মিনিটের মধ্যে হাজির হয় ডাকঘরে। ভারপ্রাপ্ত কেরানি ছেলেটি হেসে বলে, দেখুন আপনার অনুরোধ আমি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি। ইন্‌সিওরটা ফিরে আসামাত্র আপনাকে ফোনে জানিয়েছি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ! দিন কি কি কাগজে সই করতে হবে।

—এ ভদ্রলোক ঐ ঠিকানায় থাকেন না বুঝি?

—না উনি বিলেত চলে গেছেন! ইনসিওর করার পরেই সেটা জানতে পারি আমি।

মোটা খামটা ফেরত নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে সুজাতা। বিশু বলে এখন কোনদিকে যাবেন? শিখবেন চালানো?

সুজাতা বলে, না! সবার আগে এই খামটার গতি করতে হবে। এটার মধ্যে কি আছে বলতে পার?

—কাগজ পত্র হবে বোধহয়।

—না। এর মধ্যেই আছে সেই পরশ পাথরটা! যেটার কথা সেদিন তোমাকে বলেছিলাম।

—ওরে বাবা! বিশু ভীত দৃষ্টিতে খামটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ওরে বাবা কিসের? বল, এটা এখন কোথায় রাখা যায়?

—ঐ বাগান বাড়িতেই রেখে দিয়ে আসুন।

এবার আর কোন ইতস্তত করে না সুজাতা। গাড়ি নিয়ে ওরা চলে আসে সেই পড়ো বাড়িটায়। কাদের আলি ওদের আপ্যায়ন করে বসায়। আজ দিনের আলোয় লোকটাকে অত ভয়াবহ মনে হল না। তার উপরোধে এক পেয়ালা চা খেতেও রাজি হল। লোকটা চায়ের আয়োজন করতে যখন ব্যস্ত তখন বিশু দাসের সঙ্গে পরামর্শ করে সুজাতা বন্ধ খামটা লুকিয়ে রাখল একটা কুলুঙ্গির পিছনে।

বিশু বলে, চোরের বাবারও আর সাধ্যি হবে না এটা ওখান থেকে খুঁজে বার করার।

—কিন্তু তুমি চুরি করবে না তো?

—কি যে বলেন? ঘাড়টা চুলকাতে শুরু করে আবার।

এক পেয়ালা চা খেয়ে ওরা আবার রওনা হয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

খোলা রাস্তা দিয়ে হু-হু শব্দে গাড়ি ছোটায় সুজাতা, বিশু আলতো করে ধরে থাকে স্টিয়ারিঙ, বলে—এখন রিভার্স গিয়ারটা একটু প্র্যাকটিস্ হয়ে গেলেই আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন।

সমস্ত দুপুর গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত লাগছিল সুজাতার। বলে এখানে কিছু খাবার পাওয়া যায় না কোথাও?

বিশু আশে পাশে তাকিয়ে বলে, কি খাবেন বলুন? মিষ্টি না নোন্‌তা?

—যা পাওয়া যাবে।

একটা মিষ্টির দোকানের কাছাকাছি গাড়িটা রাখে বিশু। বলে, পয়সা দিন।

—পয়সা আমি কেন দেব? তুমি খাওয়াও!

—বারে! এই বুঝি আপনার গুরুদক্ষিণার বহর!

শেষপর্যন্ত সুজাতাই টাকা বার করে দেয়। এক ঠোঙা গরম সিঙাড়া ভাজিয়ে নিয়ে আসে বিশু, আর কাঁচা গোল্লা।

—এত কি হবে?

—বাঃ! আমিও আছি যে!

—ও! তুমিও আছ? বেশ, খাও তবে। কিন্তু জল কই?

জলও নিয়ে এসেছে দোকানের একটি ছোকরা চাকর। গাড়ির আয়নায় মুখখানা দেখছিল সে। খাবার ও জল খেয়ে সুজাতা বলল, এবার চা খেতে হয়।

—চায়ের কথাও বলে এসেছি। পান খাবেন?

—খাব। এই নাও পানের পয়সা!

—ওটার পয়সা আর আপনাকে দিতে হবে না ম্যাডাম। ওটা আমি খাওয়াচ্ছি আপনাকে। জর্দা খান নাকি?

—সে তো আরও ভাল কথা। না, জর্দা চাই না।

পানটা এনে দিয়ে বিশু বলে, পানটা খান, আমি একটু আসছি।

—আবার আসছি কেন? খাবার হল, চা হল, পান হল, আবার দেরী করা কেন? ও হরি! তাই তো! তা সিগারেট খাও তুমি, আমি কিছু মনে করব না।

বিশু জোরে জোরে ঘাড়টা চুলকাতে থাকে!

—আরে ধরাও না। যতদিন না ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছি ততদিন আমি তোমার শিষ্যা! তারপর কিন্তু আমার সামনে খেতে পাবে না। তা বলে দিচ্ছি!

বিশু আর ইতস্তত না করে পকেট থেকে চেপ্টে যাওয়া একটা চারমিনারের প্যাকেট বার করে একটা ধরিয়ে ফেলে।

—এসব খাওয়া কেন? স্বাস্থ্যও যায়, পয়সাও যায়! এ দিকে তো সেফ্‌টি রেজার কেনার পয়সা নেই!

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিশু বলে, সে যুগ পার হয়ে এসেছি ম্যাডাম, এখন আমি আমার আদমি!

—পঞ্চাশ টাকাতেই তুমি আমীর হয়ে গেছ?

বিচিত্র হেসে বিশু বলে, আমি যে পরশমনির খোঁজ পেয়েছি!

সুজাতা চমকে যায়! হাসিটা কেমন যেন!

॥ বোল ॥

অতি প্রত্যুষে, সূর্যোদয়ের আগেই সুজাতা এসে বসেছিল নদীর ধারে চিহ্নিত ঝুরিনামা বটগাছটার নিচে একটা পাথরের উপর। পূব আকাশটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। নদীর ওপারে ঝিমন্ত গ্রামটার উপর এক চাপ ধোঁয়ার মেঘস্তূপ, ধোঁয়া না কুয়াশা? অসংখ্য পাখি ডাকছে এখানে ওখানে। খেজুর রস পাড়তে এসেছে একজন গাঁয়ের মানুষ। নদীর বাঁধ

বরাবর খেজুর গাছের সারি। তাতে কলসি বাঁধা। লোকটা একে একে সঞ্চিত খেজুর রস সংগ্রহ করছে একটা হাঁড়িতে। আর বারে বারে আড় চোখে তাকিয়ে দেখছে নির্জন নদীতীরের ঐ একলা বসে থাকা মেয়েটার দিকে। একটা গরুর গাড়ি চলে গেল শহরতলীর দিকে। তার তৈল-তৃষিত চাকার আর্তনাদ অনেকক্ষণ শোনা গেল। টাপর তোলা, ঢাকা দেওয়া গো-গাড়ি। গাড়োয়ান কানমাথা ঢেকেছে ফেট্টা বেঁধে। বেশ হিম হিম লাগছে সকালের হাওয়া। সুজাতা ঘোমটার আকারে শালটা মাথার উপর তুলে দেয়। কানটা ঢাকে।

হাতঘড়িটা একবার দেখে। না, এখনও সাড়ে ছয়টা বাজেনি। এই গাছের তলায় আজ সকাল সাড়ে ছয়টার সময় তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন বৃদ্ধ ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। অদ্ভুত মানুষ ঐ বাসুসাহেব। তাঁরই দ্বারস্থ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। নাটকের মাঝখানে কয়েকটা সীনে তার অভিনয় নেই। তাই সুযোগ বুঝে বাসুসাহেবকে জনান্তিকে বলেছিল, আপনাকে কয়েকটা কথা প্রাইভেটলি বলতে চাই, মানে আমার ব্যক্তিগত কথা। জানেন বোধহয়, আমার কোন অভিভাবক নেই, আমার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন—

বাসুসাহেব নিম্নস্বরে বলেছিলেন, আই নো. বেশ ওঘরে এস।

রিহার্সালের ঘর ছেড়ে ওঁরা উঠে আসেন পাশের একটি ছোট ঘরে। বাসুসাহেব দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলেন, বল কী গোপনীয় কথা বলতে চাও।

—দেখুন, আমি বোধহয় একটা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছি। ঘটনাচক্রে কতকগুলো অত্যন্ত মূল্যবান কাগজ—

—জানি! এবং সম্ভবত তুমি যতটা জান, তার চেয়েও আমি কিছু বেশী জানি।—এক কথায় তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ!

—আপনি সব কথা জানেন? তবে তো অনেক সহজ হয়ে গেল আমার পক্ষে। কিন্তু আপনি আমার চেয়ে কী বেশী জানেন?

—তুমি এ জেলার রাজনীতিতে একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছ, তা কি তুমি জান?

—রাজনীতিতে?

—হ্যাঁ! আগামী ইলেকসানে তোমার যে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা রয়েছে এ খবর কি তুমি রাখ?

সুজাতা অবাক হয়ে বলে, এসব কী বলছেন আপনি!

—অর্থাৎ তুমি জান না। জানবার দরকারও নেই। কিন্তু আমি তো তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না সুজাতা। আমি প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছি আজ পনের বছর। আমি অথর্ব, বৃদ্ধ। আর তাছাড়া আমি কর্মজীবনে ছিলাম ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। ঐ একটা খেলাই জানি আমি—টাগ অব্-ওয়ার!

—টাগ-অব-ওয়ার। মানে?

—দড়ি টানাটানি! আমি ছিলাম খুনের মামলার স্পেশালিস্ট। অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটার ফাঁসির দড়িটা টেনে আমার মক্কেলের গলায় পরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, আর আমি টান মারতাম তার বিপরীত দিকে। এই একটি দড়ি টানাটানির খেলাই খেলে গেছি দীর্ঘ চল্লিশবছর। আমি তো তোমার কোন উপকারে লাগব না। তোমার প্রয়োজন একজন এ-ক্লাশ সলিসিটারের! আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি এখনই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। ক'লকাতায়। ইম্মিডিয়েটলি! আই মীন, কাল সকালের প্রথম ট্রেনেই!

—এতই জরুরী?

—এতই জরুরী! তুমি জান না, আমি জানি কী প্রচণ্ড রিস্ক নিয়ে তুমি চলেছ প্রতি মুহূর্তে। যে কোন মিনিটে তুমি খুন হয়ে যেতে পার!

—খুন! কী বলছেন আপনি? —ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল সুজাতা।

বাসুসাহেব ওর হাতটা তুলে নেন। আস্তে আস্তে সেই নরম হাতের উপর বলিরেখাঙ্কিত হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। তারপর গম্ভীরস্বরে বলেন, অন্য কোন মেয়ে হলে একথা বলতুম না। কিন্তু তোমার কথা আমি সমস্তই শুনেছি। আমার মনে হয়েছিল তুমি 'স্টে-ব্রাইট-স্টিল'। যে মেয়ে আগরওয়াল আর মহাপাত্রের মত দুই যোদ্ধার মাঝখানে মাথা ঠিক রেখে দাবার চাল দিতে পারে তার তো এ কথায় ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়ার কথা নয় সুজাতা!

সুজাতা মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে। কি একটা কথা বলতে যায়, তার আগেই একজন আর্দালী ভেজানো দরজাটা ফাঁক করে সেলাম করে। বাসুসাহেব বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখছ দরজাটা বন্ধ করে রেখেছি, যাও, পরে এস!

লোকটা আবার একটা লম্বা সেলাম করে বলে, গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর, আমি খবর দিতে এসেছিলাম, সেই ফুলটা ফুটছে—

চমকে ওঠেন বাসুসাহেব, বলেন, কতক্ষণ ?

—অনেকক্ষণ হুজুর, দরজা বন্ধ ছিল বলে—

—তুমি একটা বুদ্ধু ! চল চল, এস সুজাতা—

সুজাতা কিছুই বুঝতে পারে না। নির্দেশমত প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। টর্চের আলোয় লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাগানের একবারে অন্তপ্রান্তে। সেখানে চার পাঁচজন লোক টর্চ জেলে কি দেখছে। বাসুসাহেবকে দেখে সবাই সরে গেল। দামি স্যুটটার প্রতি কোন করুণা না করে বাসুসাহেব মাটির উপরেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। একটা নিচু ডালের সাদা ফুলের দিকে তাকিয়েই বললেন—এ ছি ছি! দেরি হয়ে গেল ! তুমি আগে ডাকলে না কেন শ্রীমন্ত !

—দরজা বন্ধ ছিল যে হুজুর !

—দরজা তো ছিটকিনি দেওয়া ছিল না, আর থাকলে ভেঙে ঢুকলে না কেন ? এই নিয়ে তিনবার মিস্ করলাম।

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান বাসুসাহেব।

সুজাতা অবাক হয়ে বলে, ব্যাপারটা কি ?

বাসুসাহেব টর্চের আলোটা ফেলেন ঐ গাছটার উপর, বলেন, কি ফুল জান ?

—না।

—এর নাম নাগচম্পা ! ইংরাজি নাম নাইট-কুইন, 'রাতের-রাণী'! তীব্র গন্ধ এর লোকে বলে কিছুটা বিষাক্ত ! ফুলগুলো কিন্তু বোঁটা থেকে হয় না, হয় পাতা থেকে, এই দেখ ! ঠিক সাপের ফনার মত একটা ফনা বেরিয়ে আসে পাতা থেকে, তারই মাথায় ধরে ফুলটা। সাধারণতঃ ফোটে সন্ধ্যাবেলায়। এক রাত্রেই ওর সমস্ত সৌরভ বিলিয়ে দিয়ে ঝরে যায় সকালে। সংক্ষিপ্ত জীবন ওর, কিন্তু যে রাতে নাগচম্পা ফুটবে সে রাত্রে সেই হচ্ছে বাগানের রাণী। আর কোন ফুলের গন্ধ ওকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। পাচ্ছ ? গন্ধ পাচ্ছ ?

সুজাতা অদ্ভুত মৃদু একটা সৌরভ পায়, বলে, আশ্চর্য ফুল তো !

—হ্যাঁ, কিন্তু ওর আসল বৈশিষ্ট্যটার কথা এখনও বলিনি। ঐ ফুলের কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটতে সময় লাগে মাত্র পনের থেকে বিশ মিনিট। ঠিক সে

সময় যদি উপস্থিত থাক লিটারালি দেখতে পাবে কুঁড়ির পাঁপড়িগুলি থর থর করে কাঁপছে। তোমার চোখের সামনেই মাত্র কয়েক মিনিটে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ফুলটা ফুটবে। অদ্ভুত সে দৃশ্য! এ গাছে এবার নিয়ে তিনবার ফুটল ফুলটা, অথচ ঐ বুক্কুর দোষে—

লাঠিটা তুলে তিনি মালিকে ছদ্ম তাড়না করলেন।

ভীড়ের মাঝে কে একজন বললে, একটা গাছে কটা ফুল হয় স্যার?

সুজাতা টর্চের আলোয় দেখে লোকটা বিশু দাস। সব কজনই গাড়ির ড্রাইভার। বাসু-সাহেব চলতে শুরু করেছিলেন, এ প্রশ্নে হঠাৎ থেমে পড়ে জবাব দেন, তার একটা নিখুঁত হিসাব আছে। সে হিসাবের একটি কম বা একটি বেশি ফুলও কোন গাছে ফোটে না। তবে সে হিসাব যে বেটা জানে তার পাত্তাই পাওয়া যায় না! সে লুকিয়ে বসে আছে ঐখানে!

হাতের লাঠিটা তুলে তারায় ভরা নৈশ আকাশের দিকে নির্দেশ করেন বৃদ্ধ।

টর্চের আলোয় বাড়ির দিকে ফিরে আসার পথে সুজাতা বলে, সেই কাগজ-গুলো—

বাধা দিয়ে বাসুসাহেব বলেন, এখানে আর একটি কথা নয়। চল রিহার্সালে যাই আমরা। কত ভোরে ওঠ তুমি?

সুজাতা প্রশ্নটা ঠিক মত বুঝতে পারে না, বলে, কী বলছেন?

—তুমি আর্লি রাইসার তো? না হলে আজ এ্যালার্ম দিয়ে শোবে। কাল ভোর সাড়ে ছয়টার সময় নদীর ধারে ঝুরি নামা বটগাছটার তলায় আমার দেখা পাবে।

—এমন অদ্ভুত স্থান-কাল?

—কারণ পাত্রটাও যে অদ্ভুত! স্থান কাল তো পাত্রের উপযুক্ত হবে, না কি বল? চিরটা কাল ক্রিমিনোলজি নিয়ে কেটেছে আমার। ফলে আমার 'রাঁদেভু' তো এমন একটা বিচিত্র কিছুই হবে। চল এবার ও ঘরে যাই।

তাই এই সাতসকালে এই নদীর ধারে এসে বসে আছে সুজাতা। বাসু সাহেব কিন্তু সূর্যের মত পাঙ্কুয়ালি উপস্থিত হলেন। ছয়টা পঁচিশ মিনিটে একটা পুরানো মডেল সিট্রন এসে দাঁড়াল নদীর ধারে। বাসুসাহেব নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। গাড়িটা রেখে লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে গাছতলায় এসে পৌছাতে তাঁর আরও মিনিট পাঁচেক লাগল।

: গুডমর্নিং ইয়াং লেডি! এস আমরা একটু পায়চারি করি।

বাসুসাহেবের ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতটা ধরল সুজাতা।

চট করে থেমে পড়েন বাসুসাহেব : জাস্ট এ মিনিট ! হাত ধরলে কেন ?

: আজ্ঞে ? —সুজাতা থতমত খেয়ে যায়।

: মানে, যদি মনে করে থাক বুড়োটার হাত না ধরলে খানায় পড়ে মরবে, তাহলে আমি ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করব ; আর যদি 'উইনসাম ম্যারোর' মতো হাত ধরে আমার সঙ্গে চলতে চাও—

সুজাতা ওঁর বলিরেখাঙ্কিত হাতটা ধরে হেসে বলে, আপনি বুড়ো কে বললে ?

বৃদ্ধ পকেট থেকে একখানা বন্ধ খাম বার করে সুজাতার হাতে দিয়ে বলেন, আজ সকাল দশটা কুড়ির ট্রেনে কলকাতা চলে যাও। এই তোমার পরিচয় পত্র। জীমূতবাহন সাহেবের পরিচয় পত্রটার আর প্রয়োজন হবে না—

: সে কথাও জানেন আপনি ?

বৃদ্ধ হাসলেন শুধু। আবার দু এক পা চলার পর বলেন, তোমাকে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার আছে। এমন জায়গায় এমন সময়ে কেন দেখা করলাম। একটা কারণ তোমাকে যতশীঘ্র সম্ভব কলকাতা পাঠাতে চাই। আর একটা কারণ, আমি জানাতে চাই না যে আমি তোমাকে সাহায্য করছি। প্রতিদিন এ সময়ে এখানে আমার সাক্ষাত পাবে। প্রাতঃভ্রমণ আমার রুটিন বাঁধা কাজ। ঘটনাচক্রে তোমার বেড়াতে আসাও অসম্ভব নয় কিছু। তারপর বেড়াতে বেড়াতে আজকের 'ওয়েদার' নিয়ে আমরা যদি দুটো কথা বলাবলি করি তাহলে লোকে বলতে পারবে না আমরা মৎলব ভাঁজছি, তাই নয় ?

: বুঝলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। আচ্ছা আমার ড্রাইভার বিশু দাস লোকটা কে আপনি জানেন ?

: জানি। বর্তমানে সে তোমার গুরুদেব। তার কাছে ড্রাইভিং শিখছ তুমি।

সুজাতার বিস্ময় ক্রমেই বাড়ছে, বলে, সে তো বর্তমানে। অতীতে লোকটা কি করত ?

: তাও জানি। কিন্তু তা তোমাকে তো জানাতে পারব না !

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সুজাতা, বলে—কেন ?

: কারণ তুমি ছাড়াও হয়তো আমার আরও মক্কেল আছে। তাদেরকেও

পরামর্শ দিই আমি। তাদের গোপন কথাও আমি তোমার কাছে প্রকাশ করে বলতে পারি না!

: লোকটা নিরক্ষর রিফুজি একজন ?

বারসাহেব জবাব দিলেন, ঐটা কি পাখি বলত? জান না? ওটা একটা মাইগ্রেটারী বার্ড! শীতকালে এদেশে আসে, ওর দেশ—

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, ঠিক আছে বিশুর কথা আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না। ভেবেছিলাম ওর রহস্যের কিনারা করে ফেলেছি; আজ আপনার কথায় সন্দেহ হচ্ছে বোধহয় ভুল করেছি কিছু! আবার ভাল করে ভেবে দেখব। কিন্তু আমার কাছে যে কাগজপত্রগুলো আছে—

—না সুজাতা। সে সম্বন্ধেও আমি কোন আলোচনা করব না। ওটা তোমার টপ্ সিক্রেট! একমাত্র তোমার সলিসিটারের হাতে, যাঁর নামে ঐ চিঠি লিখে দিলাম, তাঁর হাতে ঐ কাগজগুলো নিশ্চিন্ত মনে জমা দিতে পার। তবে একটা কথা। যেখানে সেটা লুকিয়েছ সেখান থেকে কাগজগুলো বার করার আগে একবার ভাল করে দেখে নিও চারিদিক! সম্ভব হলে আজই কাগজগুলো নিয়ে যাও। আজই জমা করে দিয়ে এস।

—মিস্টার ঘোষ কি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারেন না ?

—কে বিপুল? না! তার এসব ব্যাপারে মাথা গলানো ঠিক নয়। অন্তত এই সময়ে। সে চাকরি করে, এটা এখন রাজনীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বারসাহেব গাড়ি করে ওকে অনেকটা আগিয়ে দিয়ে গেলেন। রাস্তার ধারে এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়ার সময় বললেন সৌজন্য বলে, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য; কিন্তু সুবুদ্ধি বলে, তোমাকে এখানেই নামিয়ে দেওয়া উচিত। আশা করি আমাকে আন্‌শিভালরাস্ মনে করবে না।

সুজাতা বাড়ি এসে পৌঁছাল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই। তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র বনোয়ারিলাল নিবেদন করে—নকুলবাবু এই সাত সকালেই দু-দুবার এসে খোঁজ করে গেছেন। বলেছেন, মেমসাহেব ফিরে আসা মাত্র তাঁকে খবর দিতে।

খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হল নকুল হুই, তার সেই পেটেন্ট গলাবন্ধ কোট পরে। চোখ পিট্ পিট করে বলে, মালিক ক'লকাতা থেকে

কাল রাত্রে ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন। বলেছিলেন আজ সন্ধ্যায় তিনি আসবেন। সন্ধ্যা ছ'টার মে'লে। আপনাকে তৈরী থাকতে বলেছেন; কাল ক'লকাতা যেতে হবে পেটেন্ট নেওয়ার কাজে।

—ও আচ্ছা!

সুজাতা একটু বিচলিত হয়ে পড়ে। আগরওয়াল ট্রাঙ্ক কল করে জানিয়েছে যে সে পেটেন্ট নিতে প্রস্তুত। কেমন করে প্রস্তুত হল সে? কাগজ পত্র গুলো তো এখনও সুজাতারই কাছে আছে। আগরওয়াল তো তার নাগাল পায়নি। তাহলে কেমন করে সে পেটেন্ট নেবে? তা সে যাই হোক, কিন্তু আগরওয়ালের এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সুজাতা যদি আজই কলকাতা চলে যায়, তাহলে আগরওয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেই যেতে হয়। আগরওয়ালকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—কিন্তু সে যদি সত্যিই অন্যভাবে এ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে থাকে তাহলে সুজাতা তার এক কানা কড়িও পাবে না। এ ক্ষেত্রে তার কী করণীয় সে বিষয়ে একজনই তাকে পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি তীক্ষ্ণধী বাসুসাহেব। এতক্ষণে তিনি নিশ্চয় গিয়ে পৌচেছেন বাড়িতে। সুজাতা স্থির করে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের বাঙলোয় ফোন করে বাসুসাহেবের নির্দেশ নেবে। আগরওয়ালের আদেশ অগ্রাহ্য করেও কি সে ক'লকাতা যাবে দশটার ট্রেনে?

ঘরে এসে ফোনটা তুলে নেবার আগেই সেটা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে।

—হ্যালো? সাড়া দেয় সুজাতা।

—সুজাতা দেবী? আমি মিসেস্ রায়চৌধুরী কথা বল্‌ছি; চিনতে পারছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ; কি খবর বলুন।

মিসেস্ রায়চৌধুরী হচ্ছেন স্থানীয় পি. ডাব্‌লু ডি-র ডিভিসানাল এঞ্জিনিয়ার সুব্রত রায়চৌধুরীর স্ত্রী। রিহার্সালে আলাপ হয়েছিল কদিন আগে। ভদ্র-মহিলা খুব বক্‌বক্ করতে পারেন। রীতিমত গল্পবাজ।

—শুনুন, সেদিন আপনি ওঁর কাছে কৌশিক মিত্রের খোঁজ করেছিলেন মনে আছে?

—আছে। মিস্টার রায়চৌধুরী তো বলবেন তিনি অনেক দিন আগে পাশ করেছেন। কৌশিক মিত্রকে চেনেন না।

—কিন্তু কৌশিক মিত্রকে কেন খুঁজছেন বলুন তো?

সুজাতা হেসে বলে, আপনি সে কথা জানতে চাইছেন কেন বলুন তো?

—আমি আন্দাজ করেছি! কৌশিকের সঙ্গে আপনার একটা সম্বন্ধ উঠেছে। তাই নয়?

এসব বাজে গল্প এখন মোটেই ভাল লাগছিল না সুজাতার; কিন্তু তার-পরের কথাটাতে সে চমকে ওঠে। মিসেস্ রায়চৌধুরী বলেন, কৌশিকের একজন বন্ধু আজ এসেছে। আমাদের এখানেই আছে। কথা বলবেন?

—কৌশিকের ক্লাস ফ্রেণ্ড?

—হ্যাঁ। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

—কি নাম বলুন তো?

—কিশোর ডালমিয়া।

—তাঁকে ফোনটা দিতে পারেন?

—কথা বলুন না।

একটু পরেই ও প্রান্তের টেলিফোন হস্তান্তরিত হল বোঝা যায়। এবার পুরুষালি গলায় একজন বলেন: কিশোর ডালমিয়া বল্‌ছি; আপনার কথা বৌদির কাছে শুনেছি। কৌশিককে আপনি খুঁজছেন কেন বলুন তো?

সুজাতা একটু ইতস্তত করে বলে, ধরুন তার কাছে আমি কিছু টাকা পাই!

—বিশ্বাস করি না। পরের টাকা মেরে দেবার মত লোক নয় আমার বন্ধু।

—আপনি কি ওর সঙ্গে একই বছরে পাশ করেন?

—হ্যাঁ।

—সুকমল দত্ত আর জীবন বসুও আপনাদের ব্যাচের?

—নাম দুটি আজ প্রথম শুনলাম!

সুজাতা আবার ঘাবড়ে যায়। এ আবার কি কথা? কিশোর ডালমিয়া বলছে সে কৌশিকের ক্লাস ফ্রেণ্ড; কিন্তু কৌশিক যাদের সঙ্গে কনভোকেশনে গ্রুপ ফটো তুলেছিল তাদের ও চেনে না!

—আচ্ছা, কৌশিকের চোখে কি চশ্‌মা আছে?

—ছয় মাস আগেও ছিল না। এখন আছে কি না জানি না!

—গোঁফ?

—কি ব্যাপার বলুন তো? কৌশিক কি আজকাল গোঁফ রাখছে? তা রাখে রাখুক, এত খবর আপনি জানতেই বা চাইছেন কেন? কৌশিক যদি টাকা ধার নিয়ে থাকে তবে গোঁফ থাক না থাক—

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, আপনি কতদিন এখানে থাকছেন ?

—আজই দশটার গাড়িতে চলে যাব।

—আচ্ছা আমি এখনই যাচ্ছি। সাক্ষাতে কথা হবে!

সুজাতা যেমন ছিল নেমে আসে। গাড়ি বার করতে বলে। বিশ্বনাথ তৈরীই ছিল। এগিয়ে এসে বলে, কে ড্রাইভ করবে? আপনি না আমি ?

—আমিই চালাব। তুমি এই পাশে বস।

বিশ্বনাথকে পাশে বসিয়ে সুজাতা এল-মার্কা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। এ সুযোগ সে ছাড়তে পারে না। যেমন করেই হ'ক, আজ বিশু-কৌশিক রহস্যের যবনিকাপাত করতে হবে। বাসুসাহেবের কথাগুলো শুনে সে আবার বিচলিত হয়ে পড়েছিল—কী যেন ইঙ্গিত ছিল তাঁর সতর্ক গোপনের পিছনে। গাড়িটাকে রায়চৌধুরীর বাড়ির সামনে রেখে সুজাতা এগিয়ে যায়। কলিং বেল বাজাতে হল না, তার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিসেস্ রায় চৌধুরী : আসুন আসুন।

সুজাতাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভদ্রমহিলা কিশোর ডালমিয়াকে ডেকে আনেন।

বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়সের এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করেন, বলেন, কী ব্যাপার বলুন তো ?

সুজাতা কোন সৌজন্যের ধার দিয়েও গেল না। সরাসরি প্রশ্ন করে, কৌশিক মিত্র এখন কোথায় আছে জানেন ?

—না, অনেকদিন তার কোন খবর পাইনি।

—আপনার সঙ্গেই পাশ করেছিল ?

—হ্যাঁ, ও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল আমাদের বছর। অনেক দিন বেকার ছিল। আমারই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত—

—বলুন, কি বলছিলেন ?

—না, সত্য গোপন করে কি হবে ? সে কিছু দিন কলকাতায় ট্যাক্সি চালাত !

—ট্যাক্সি চালাত ? একজন গ্রাজুয়েট এঞ্জিনিয়ার ?

—হ্যাঁ তাই। আমি বড়লোকের ছেলে, বাবার বিসনেস আছে। তাই করে খাচ্ছি। অথচ আমার অনেক বন্ধু আজও বেকার। অনেকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এক বন্ধু সুইসাইড করেছে, একজন বিপথে গিয়ে জেল

খাটছে। কৌশিক যে ট্যাক্সি চালাবে এতে আর আশ্চর্য কি? দেশের যা হাল হচ্ছে, এতে পরের বছর এঞ্জিনিয়াররা ট্যাক্সি ছেড়ে রিক্‌শা চালাবে!

সুজাতা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

—কৌশিক সম্বন্ধে আপনার এত কৌতূহল কেন বলুন তো?

কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, আপনার বন্ধুর গোঁফ ছিল না? চশ্‌মা ছিল না? কপালে একটা কাটা দাগ ছিল না?

—না ছিল না, কিন্তু এসব কথা কেন উঠ্‌ছে?

মিসেস্ রায়চৌধুরী বলেন, কৌশিকের বিয়ের প্রস্তাব যখন উঠেছে তখন সে কোথায় কাজ করছে তা কি আপনি জানেন না?

এবার সুজাতা মুখ তুলে তাকায়। মিসেস্ রায়চৌধুরীকে বলে, না কৌশিকের বিয়ের কোন প্রস্তাব ওঠে নি। সে আমাদের এখানেই কাজ করে, এই আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিতেই—

—সে কি! তবে তো তাকে আপনি দেখেছেন?

—হ্যাঁ দেখেছি বই কি! দাঁড়ান তাকে ডেকে আনি।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সুজাতা।

কিশোর মিসেস্ রায়চৌধুরীকে বলে, বৌদি ওঁর কি মাথায় গণ্ডগোল আছে?

—আগে তো তা মনে হয় নি; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। তার আগেই সুজাতা প্রবেশ করে। তার দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা আছে বিশ্বনাথ দাসের হাতখানা। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে সুজাতা অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিচয় করিয়ে দেয়—ইনি মিস্টার কিশোর ভালমিয়া, কন্ট্রাক্টর, আর ইনি কৌশিক মিত্র, আমাদের আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসের—কি যেন কৌশিক? আমার আবার ঠিক ডেসিগ্‌নেসানটা মনে থাকে না!

বিশ্বনাথ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কিশোর এগিয়ে এসে বলে, কৌশিক! তুই এখানে?

মিসেস্ রায়চৌধুরী বলেন, বসুন কৌশিকবাবু।

—কি রে? তুই যে স্ট্যাচু হয়ে গেলি? এখানে চাকরি করছিস্? কতদিন? আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসে ঢুকেছিস? বস, দাঁড়িয়ে কেন?

বিশু দাস নয়, কৌশিক মিত্রকে অতঃপর বসতে হয় গদি-আঁটা সোফায়।

না, সোফা তো নয়, যেন সী-স! তার একপ্রান্তে কৌশিক বসা মাত্র অপর প্রান্তে বসা সুজাতা তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সুজাতা।

—কী হ'ল? উনি অমন করে কোথায় গেলেন?

পর মুহূর্তেই বাইরে পার্ক করা গাড়িটা গর্জন করে ওঠে। এক পাইপ ধোঁয়া ছেড়ে এল-মার্কা ফিয়াট গাড়িটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় সোজা রাস্তা বেয়ে।

॥ সতের ॥

ছি ছি ছি, কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! বুদ্ধিমতী বলে যে অভিমানটা ছিল ওর, সেটার আর চিহ্ন মাত্র রইল না। একেবারে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে তাকে নিয়ে। ভাবতে বসে এখন মনে হচ্ছে, হ্যাঁ ভুলই তো হয়েছে তার। প্রচণ্ড ভুল, আকাশচুম্বী ভ্রান্তি। 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার।' এ ভুল হয়েছে রমেনবাবুর রিপোর্ট থেকে। সদর থানার ও. সি. রমেন গুহ যে কাগজপত্রগুলো নিয়ে এসেছিলেন তাতে বিশুকে সন্দেহ করার আর কোন কারণ ছিল না। বিশ্বনাথ দাস আর কৌশিক মিত্র যে দুজন ভিন্ন লোক, তাদের মধ্যে যোগসূত্র শুধু তাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য, এটুকু নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মেনে নিয়েছিল সুজাতা। কে যে কেমন করে রমেনবাবুকে এভাবে ধোঁকা দিতে পারল তা অবশ্য এখনও আন্দাজ করতে পারেনি; কিন্তু এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে রমেনবাবুর সমস্ত তথ্যই ভুল। কৌশিক অবশ্য অদ্ভুত অভিনয় করে গেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তি-নির্ভর চিন্তাধারায় সুজাতার উচিত ছিল তার চালাকিটা ধরে ফেলা! ঘটনাচক্রে ভগবান তাকে সেটা বুঝবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেন্ট' বইখানা!

বিশু দাস আর কৌশিক মিত্র দুজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, তাদের জন্মস্থান ভিন্ন, কার্যক্ষেত্র ভিন্ন, তাদের শিক্ষায়-দীক্ষায় আশমান জমীন ফারাক। তারা কেউ কাউকে চেনেনা। তবু দুজনের আকৃতিগত সাদৃশ্য নাকি বিস্ময়কর। অরূপরতন, যে নাকি কৌশিকের সঙ্গে একমাঠে ক্রিকেট খেলেছে, সে বিশুকে

ভুল করে কৌশিক বলে ভাবে। এ পর্যন্ত অসঙ্গতি কিছু নেই। মানুষে মানুষে এমন আকৃতিগত মিল বাস্তবে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রকৃতির একটা অদ্ভুত খেয়াল বলে এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু!

হ্যাঁ, এতবড় একটা প্রকাণ্ড 'কিন্তু' ওর নজরে পড়ল না কেন? যে গাড়ি কৌশিক মিত্র কোনদিন চড়েনি, এবং যে গাড়ি বি দাস চালায় তার ড্যাসবোর্ডের ড্রয়ারে কেমন করে আবিষ্কৃত হল এমন একখানি ইংরাজী বই যা বিশু দাসের কাছে থাকা অযৌক্তিক। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যার প্রথম পাতায় নাম লেখা আছে কৌশিক মিত্রের?

রমেনবাবু বলেছিলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স একটা লোকের সনাক্তকরণের একেবারে শেষ কথা। ভুল বলেছিলেন। সেদিন বাসুসাহেব বলছিলেন, না ড্রাইভিং লাইসেন্স নয়, ফিঙ্গার প্রিন্টই হচ্ছে একটা মানুষের ব্যক্তিগত সনাক্তকরণের শেষ কথা। তিনিও ভুল বলেছিলেন। 'এ ম্যান ইস্ নোন বাই দ্য বুকস্ হি কিপস্'। একটা মানুষকে চিনতে পারবে যখন তার সঙ্কলিত বইগুলি উল্টে পাল্টে দেখ। অজানা অচেনা একটা মানুষের বইয়ের আলমারি ঘেঁটে দেখ, তুমি বলতে পারবে সে বিজ্ঞানের ছাত্র না কলাবিদ্যার, সে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, না আইনজীবী। তুমি বলে দিতে পারবে গান-বাজনায় তার সখ আছে কিনা, কন্‌ট্রাক্ট-ব্রীজ খেলায় তার নেশা আছে কিনা, ক্রিকেট-সিনেমা শিল্প-বাস্তুবিদ্যা কোন্‌দিকে তার ঝোঁক। বইগুলো ঘাঁটলেই অদেখা অচেনা মানুষটাকে চিনে ফেলতে পারবে তুমি।

ফিয়াট-গাড়ির খোপে যেমন পকেট এডিসান ইংরাজি বইটা সন্দেহাতীত প্রমাণ রাখতে চেয়েছিল সে গাড়ির ড্রাইভারের। আর মূর্খ সুজাতা সে কথা খেয়ালই করল না।

কিন্তু কেন? এ ভুল সে করল কেন? এই জলজ্যান্ত প্রমাণটা তার নজরে পড়ল না কী জন্যে? জীমূতবাহনকে চিনতে সে ভুল করেনি, আগরওয়ালকে চিনতেও তার দেরি হয়নি, তাহলে—?

হ্যাঁ, মনের অগোচরে পাপ নেই। স্বীকার করতে বাধ্য হয় সুজাতা এ তার অবচেতন মনের কামনায়! তার চেতন মনকে সে বুঝতে দেয়নি! বিছানায় শুয়ে সে রাত্রে সে না বলেছিল,—কী ক্ষতি হত ভগবান যদি বিশু দাসকে কৌশিক মিত্র করে গড়ে তুলতেন? বিশু দাস নিঃসন্দেহে তার কুমারী মনে রেখাপাত করেছিল, কিন্তু লোভ জ্যাটালি সে হতে চায়নি; সে মনে মনে

চেয়েছিল কিন্তু দাস পঞ্চাশ টাকা মাইনের ড্রাইভার নয়—ভদ্র শিক্ষিত অভাবগ্রস্ত একজন এঞ্জিনিয়ার! সজ্ঞানে সেটা চায় নি মনের গভীরে এ কামনা তার জেগেছিল,—আর তাই এতবড় প্রমাণটা সে নজরে আনেনি!

কিন্তু এ কী হল? কৌশিক তাঁকে ধোঁকা দিয়ে তার সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেল যে! রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে সে সোজা চলে গিয়েছিল সেই পড়ো বাগান বাড়িটায়। কাদেরআলির কাছ থেকে চাবি নিয়ে খুলেছিল সেই ভাঙা ঘরটা। পাগলের মতো ছুটে গিয়ে আঁতি পাতি করে খুঁজেছিল চিহ্নিত কুলুঙ্গিটা। যা আশঙ্কা করেছে, তাই! ধুলোই শুধু লেগেছিল তার শাড়িতে। মোটা ভারি খামটা ওখানে নেই!

আচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ বসে ছিল চুপ করে। তারপর কখন কি করে বাড়ি ফিরে এসেছে তা আর খেয়াল নেই। যখন আত্মস্থ হল তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে কাঁটাতারে ঘেরা কম্পাউণ্ডে তার দ্বিতল ঘরে। গাড়িটা তাহলে নিরাপদে ড্রাইভ করে নিয়ে আসতে পেরেছে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে দশটা বাজতে পনের মিনিট। মনে পড়ে যায় বাসুসাহেবের কথা। খেলা অবশ্য শেষ হয়ে গেছে, তার ট্রাম্প-কার্ডটা বেহাত হয়ে গেছে, তবু হারজিত নির্ধারিত হয়ে যাবার পরেও খেলার শেষ মিনিট পর্যন্ত তাকে ছুরি তিরি পাশিয়ে যেতে হবে। বাসুসাহেবকে ফোন করে জানাতে চাইল শেষ পরিস্থিতি। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাঙলোর নম্বরটা চাইল।

—হ্যালো, দিস্ ইস্ ডি. এম.'স বাঙলো।

—আমি সুজাতা বলছি।

—বলুন সুজাতাদি, আমি প্রণতি, কাকে ডেকে দেব?

—না। দাদুকে। বল জরুরী দরকার।

—দাদু? ওমা তিনি তো নেই। একটু আগে চলে গেলেন যে!

—চলে গেলেন? কোথায়?

—দশটা কুড়ির গাড়িতে। কলকাতায়।

—ও আচ্ছা তবে থাক!

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে সুজাতা। স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। বাসু-সাহেব ঐ দশটা কুড়ির গাড়িতে ক'লকাতা গেছেন? কেন? কই তিনি তো সুজাতাকে একথা ঘুণাক্ষরেও বলেন নি! তবে কি—? ঐ অতীন্দ্রিয় বৃদ্ধ! কিন্তু এ ছাড়া আর কী কৈফিয়ৎ হতে পারে? কিন্তু ড্রাইভার

যেমন অতি-নির্বোধ সেজে বলেছিল, পরশ পাথর গচ্ছিত রাখবার সাহস তার নেই, এবং তৎক্ষণাৎ যেমন সাজেস্ট করেছিল, পড়ো ভাঙা বাড়িটায় সেটা লুকিয়ে রাখতে, ঐ অশীতিপর বৃদ্ধও তেমনি অতি-নির্লোভ সেজে বলেছিলেন, এ সম্বন্ধে তিনি কোন আলোচনাই করতে চান না, ওটা সুজাতার 'টপ্-সিক্রেট', এবং তৎক্ষণাৎ সেই একই নিঃশ্বাসে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন যে সুজাতা যেন কাউকে না জানিয়ে আজ দশটা কুড়ির গাড়িতে কাগজগুলো নিয়ে ক'লকাতা যায়!

—উঃ। কী শয়তান!

কিন্তু ঐ মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের এ দুর্মতি হল কেন? কে যেন বলেছিলেন, যখন পুণ্য-সঞ্চয় করবে, তখন মনে রেখ কালই তোমার মৃত্যু হতে পারে, এখনই যা পার পুণ্য অর্জন করে নাও; আর যখন অর্থ সঞ্চয় করবে তখন মনে ক'র তুমি অজর, অমর! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঐ অশীতিপর বৃদ্ধও কি আজ ভেবেছিলেন—তিনি অজর, অমর। টাকার নিকষে কি কোন সোনাই পাকা নয়? অথচ উনিই না বলেছিলেন, তুমি 'স্টে-ব্রাইট ষ্টীল'! হ্যাঁ, তাও যেমন বলেছিলেন, তেমনি একথাও বলেছিলেন জীবনের চল্লিশটা বছর তিনি ডুবে ছিলেন অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে। ক্রিমিনোলজিতেই তাঁর প্যাশান! আজ এই ট্রেনে ঐ কাগজগুলো নিয়ে কলকাতা যাবার চেষ্টা করলে কি আকস্মিক মৃত্যু হত সুজাতার? চলন্ত ট্রেন থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, বা ঐ ধরনের কিছু? তাই হত, বাসুসাহেব তো স্পষ্টই বলেছিলেন, যে কোন মিনিটে তুমি খুন হয়ে যেতে পার!

সেই মুহূর্তে যদি সেই রাশভারি মানী বৃদ্ধটি এসে দাঁড়াতেন ওর দোর গোড়ায়, সুজাতা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথমেই ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিত তাঁর গালে।

অথচ কী আশ্চর্য! এবার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি সুজাতার আগর-ওয়ালকে চিনতে তার ভুল হয়নি। মৃত্যুর আগেই যখন সে বুঝতে পেরেছিল বাপির মৃত্যু আসন্ন, তখনই সে পাঁচশ টাকার ইন্সিওর্ড পার্সেলটা পাঠিয়ে দিয়েছিল গড় ঠিকানায় একজন মানুষের উদ্দেশ্যে। জানত, পাঞ্জাব থেকে সে পার্সেল ফিরে আসতে অন্তত একমাস সময় লাগবে। মৃত্যুপথযাত্রী ডক্টর চ্যাটার্জীকে প্রাণ খুলে দেবা পর্যন্ত করতে পারছিল না বেচারি। সর্বদা তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছিল ঐ কাগজগুলোর উপর। বাপির মৃত্যুর

পর থেকে সুজাতার উপর অতন্দ্র পাহারার আয়োজন করেছিল আগরওয়াল। ইন্দির সর্দার সর্বদা তাকে চোখে চোখে রাখে, কিন্তু সে আগরওয়ালকে বুদ্ধির যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। বাপির জীবিতাবস্থাতেই সে মনগড়া এক নাম ঠিকানায় ঐ ইন্সিওর্ড পার্সেলটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। নিশ্চিত জানত মাস খানেকের মধ্যে সেটা ফেরত আসবে প্রেরকের কাছে। জীমূতবাহনকে চিনতেও সে ভুল করেনি। দেশহিতৈষীটির সাম্প্রতিক রূপ সে আন্দাজে বুঝে নিয়েছিল। বিশুর ব্যাপারে তার ভুল হয়েছে; কিন্তু নিরঙ্কুশ ভুল নয়। মাঝে মাঝেই তার মনে সন্দেহ জেগেছে, খোঁজ খবরও নিয়েছে সেই মত।

কিন্তু শুভ্রকেশ বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধ বাসুসাহেবকে সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে ছিল। তাহলে মানুষ চিনতে সুজাতারও ভুল হয়?

হঠাৎ ধীরে ধীরে করাঘাতের শব্দ হতে শুন্‌ল রুদ্ধ দরজায়। বাইরে থেকে কেউ টোকা দিচ্ছে। সুজাতা উঠে বসে। গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নেয়। তারপর এগিয়ে এসে দ্বার খুলে দেয়।

খোলা দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে না বিশুদাস নয়। নির্লজ্জ বেহায়া সেই মানুষটা—কৌশিক মিত্র।

—কি চাই? রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করে সুজাতা।

—অনেক কথা আছে। ঘরের ভিতর চল—

—বেরিয়ে যাও বলছি!

বেহায়ার মত লোকটা পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। বলে, তোমার রাগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে মানি, কিন্তু আমার বক্তব্যটাও শোন—

তুমি আমাকে 'তুমি' বলছ কোন অধিকারে?

—তুমিও তো আমাকে 'তুমি' বলছ সুজাতা!

—তুমি আমার ড্রাইভার, মাইনে করা চাকর!

—ছিলাম। এখন আর নই!

—তুমি যাবে কি না?

—আমার সব কথা না শুনলে যাব না।

প্রচণ্ড রাগে হঠাৎ ওর গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে বসে সুজাতা। হাতটা টন্ টন্ করে ওঠে ওর। পাঁচটা আঙুলের দাগ বসে যায় কৌশিকের

থাকে। উত্তেজনায়, রাগে, দুঃখে সুজাতা হাঁপাতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য, একচুলও বিচলিত হল না লোকটা। এর পরেও বলে, তুমি কাঁপছ সুজাতা, থর থর করে কাঁপছ! আমার কি মনে হচ্ছে জান? নাগচম্পা ফুল ফুটছে! চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি দলগুলো খুলে যাচ্ছে। পাপড়িগুলো থর থর করে কাঁপছে!

আচ্ছা, ও কি পাগল? কিন্তু সুজাতার রাগ তখনও একতিলও পড়েনি, বললে—বিশ্বাসঘাতক! স্পাই! আই হেট য়ু! বেরিয়ে যাও বলছি!

মৃদু হেসে কৌশিক বলে, বাসু দাদু বলেছিলেন, নাগচম্পার সৌরভে বিষ থাকে! তোমার নিঃশ্বাসেও তাই পাচ্ছি আমি।

কৌশিকের ন্যাকামি দেখে একেবারে জ্বলে উঠল সুজাতা। বললে, চাকর দিয়ে গলাধাক্কা না দিলে তুমি যাবেনা, না? বনোয়ারীলাল!

এত চীৎকার করে সুজাতা ডেকেছিল যে কৌশিক আর অপেক্ষা করে না; নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। চৌকাঠের ওপারে গিয়ে বারান্দায় এক নজর দেখে নেয়, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, তোমাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে আর কোন অপরাধ আমি করিনি। বিশ্বাসঘাতকতা আমি করিনি। এটা রাখ! নকুল কিন্তু জানে পরশপাথরটা পোস্টাপিস থেকে তুমি ফেরত পেয়েছ!

চাদরের তলা থেকে বন্ধ একটা গালা মোহর করা খাম বার করে সুজাতার হাতে দেয়।

ঠিক তখনই বনোয়ারিলাল এসে দাঁড়ায়।

কৌশিক ধীর পদে বেরিয়ে যায়।

সুজাতা বনোয়ারিলালকে বলে, ম্যানেজারবাবুকে সেলাম দাও।

বনোয়ারিলাল নেমে যেতেই বন্ধ খামটা সে লুকিয়ে ফেলে বিছানার তলায়। অল্প পরে নকুল হুই এসে দাঁড়ায়।

সুজাতা বলে, বিশু দাস আজ থেকে আমার গাড়ি আর চালাবে না। অন্য কোন গাড়ির ডিউটিতে ওকে বদলি করে দিন।

—বদলি করতে হবে না। বিশুর চাকরি গেছে।

—চাকরি গেছে! কেন? কার হুকুমে?

—কাল রাত্রে মালিক যখন ফোন করেছিলেন, তখনই বলেছেন।

আজই বরখাস্তের চিঠি ওকে দেওয়া হবে। একমাসের আগাম মাইনেও পাবে সে।

—কেন? ওর চাকরি গেল কেন?

—কেন, তা তো জানিনা। এই রকমই হুকুম হয়েছে।

—ও আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

আবার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে সুজাতার। এতো তার হিসাবের মধ্যে ছিল না! বিশু দাস আগরওয়াল নিযুক্ত স্পাই, কিন্তু সে যে সুজাতার কাছে ধরা পড়ে গেছে, কাল রাত্রে কলকাতায় বসে আগরওয়াল তো তা জানত না। তাহলে এমন একটা নির্দেশ সে পাঠালো কেন? দরজাটা বন্ধ করে বিছানার তলা থেকে খামটা বার করে দেখে। আশ্চর্য! পোস্টাল-সীল তো অটুট আছে। কৌশিক তো সেটা হাতে পেয়েও খুলে পড়েনি, কপি করে নেয়নি। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? তবে কি কৌশিক আগরওয়াল নিযুক্ত স্পাই নয়, অন্য কারও লোক? আগরওয়াল কি সেকথা জানতে পেরেই তাকে তাড়াচ্ছে? তাহলে কৌশিক কার চর? কেন সে এসেছিল? রিসার্চ-পেপারগুলো চুরি করতেই যদি সে এসে থাকে তাহ'লে পরশপাথর হাতে পেয়েও অজ্ঞানে ক্ষ্যাপার মতো সেটা অবজ্ঞাভরে ওকে ফেরত দিয়ে গেল কেন? তাছাড়া বিশ্বনাথ দাসের জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সই বা সে পেল কোথা থেকে? রমেনবাবুও এমন সব ভুল খবর পেলেন কোন সূত্রে? এতক্ষণে রাগটা অনেক পড়ে গেছে। ডান হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরে। লাল হয়ে গেছে হাতের পাঞ্জাটা! চড়টা আচমকা বড় জোরে মেরে বসেছিল! হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল একটা কথা! এত দুঃখেও হাসি পেল তার। কদিন আগে সে না বলেছিল, ভগবান, বিশু দাসকে তুমি কৌশিক মিত্র করে গড়লেনা কেন?

ভগবান তার প্রার্থনা শুনেছেন।

বনোয়ারিলাল এসে বলে, আজ তাহলে তো আপনার কলকাতা যাওয়া হচ্ছে না?

—না। হ্যাঁরে বিশুবাবু কোথায় গেল?

—ওর ঘরে আছে। মালপত্র বেঁধে নিচ্ছে। ওর চাকরি তো খতম হয়ে গেল। ওকে ডেকে দেব?

—না থাক, আমিই যাচ্ছি।

বন্ধ খামটা ব্লাউজের ভিতর ভরে নিয়ে সুজাতা পায়ে পায়ে নেমে যায়।

মেজানাইন ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ওকে আসতে দেখে কৌশিক অবাক হল না, হাসল, বললে—এও জানতাম আমি সুজাতা! বাবুসাহেব বলেছিলেন, সংক্ষিপ্ত জীবন ওর, কিন্তু যে রাত্রে নাগচম্পা ফোটে সে রাত্রে সেই হচ্ছে বাগানের রাণী! ওর ইংরেজি নাম নাইট-কুইন! তার ক্ষণিক সৌরভ সে চেপে রাখতে পারে না! 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরীমৃগ সম!'

সুজাতা জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—বস সুজাতা! খাটিয়ার উপর সতরঞ্চিটা বিছিয়ে দেয়।

তবু বসে না সুজাতা, দাঁড়িয়েই থাকে। মুখ তোলে না, তবু বলে, তখন কী বলতে চাইছিলে?

—তখন যা বলতে চাইছিলাম, এখন ভেবে দেখছি, সে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি তো চলেই যাচ্ছি! সংক্ষিপ্ত সময় আমার।

—কিন্তু আমি এখন কি করব?

—সে কথা কি আমার ভাববার?

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকায় সুজাতা। বলে, তোমার নয়? তবে কার?

—কিন্তু তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না?

ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠ্‌ল সুজাতার, দৃষ্টি হল নত, বললে, আমাকে ক্ষমা কর কৌশিক! কিন্তু এভাবে আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না!

—এত কাণ্ডের পরও কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে?

—তোমাকে ছাড়া আর কাকে বিশ্বাস করব এ সময়ে! আমার বাপি ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, তুমিও তাই। আর কিছু না হ'ক তোমার প্রফেসনাল এটিকেটের উপর—

—ও! প্রফেসানাল এটিকেট! নিজেই খাটিয়ায় বসে পড়ে এবার। বলে, বেশ, এক চাকরি গেছে, দোশ্‌রা চাকরি নিচ্ছি! তোমাকে সাহায্য করব। আমার প্রফেসনাল এটিকেটের দোহাই পেড়েছ যখন। বল, কি জিজ্ঞাস্য আছে তোমার?

—এখানে চাকরি নিয়ে ছদ্মবেশে এভাবে কেন এসেছিলে?

ম্লান হেসে কৌশিক বলে, অন্তত তোমার পরশ পাথর চুরি করতে নয়।

—সে তো জানিই। যেহেতু হাতে পেয়েও সেটা ফেরত দিয়েছ, তবে কেন এসেছিলে?

—আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ! স্পেশাল কাজে। ময়ূরকেতন আগরওয়ালের ব্যবসায়ে অনেক গোপন রন্ধ্র আছে। তার ছিদ্র অন্বেষণ করতে। তাই আমার কাছে এমন একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে বিশ্বনাথ দাস যার লাইসেন্সি। সেটা জাল হলেও জাল নয়!

—এখানকার ও সি. রমেন গুহ তোমার পরিচয় জানতেন?

—জানতেন; তিনি আমার কাজটার কথাও জানতেন। পাছে তুমি আমার পরিচয় জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠ, এবং সেই সূত্রে আমার কাজে বাধা সৃষ্টি হয়, আগরওয়াল সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, তাই আমাকে দুখানা ফটো তোলাতে হয়েছিল। একখানা মার্সেডিস্ বেঞ্জ্ গাড়ির সামনে, একখানা কনভোকেসন গাউন পরে। দুটোই আমার ফটো। তুলেছিলেন্ রমেনবাবু তাঁর নিজের ক্যামেরায়। হাবড়া থানার ও. সি-র চিঠিটাও জাল। সবই করতে হয়েছে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে। আর কি জানতে চাও বল?

—যে কাজে তুমি এসেছিলে তা কি সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে?

—হ্যাঁ এবং না! এবং তাতেই ঘটনাচক্রে তোমার সমস্যার সমাধানটাও হয়েছে।

—আমার কী সমস্যা এবং কী তার সমাধান?

—আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি জানতে পেরেছি, ময়ূরকেতন আগরওয়াল ডক্টর চ্যাটার্জির ঐ আবিষ্কারের কতটা জানতে পেরেছে, এবং কেন সে পেটেণ্ট নিতে পারছে না, অর্থাৎ কতটা সে জানে না।

সুজাতা কৌতূহলী হয়ে বলে, আমাকে বুঝিয়ে দাও তো!

—আগরওয়াল তোমার বাবার আবিষ্কারের ব্যাপারটার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। তোমার বাবা তাকে কিছুই বলে যান নি। তাঁর মন্ত্রগুপ্তি ছিল অসাধারণ!

—তা কেমন করে হবে? তাহলে আগরওয়াল কেমন করে সেগুলো হাতে কলমে তৈরি করছে?

—কে বলল তোমাকে?

—দেখ্‌ছি চোখের উপর। বাজারের তুলনায় অনেক সস্তায়—

—ভুল দেখছ সুজাতা। সস্তায় মোটেই বানাচ্ছে না। আমার হিসাব অনুযায়ী প্রতিশত হলো-ব্লকে তার লোকসান যাচ্ছে সাড়ে বেয়াল্লিশ টাকা। মানে, তার দৈনিক লোকসানের পরিমান বারো-তেরশ' টাকা!

—হতেই পারে না। সে রীতিমত হিসাব করে আমার লভ্যাংশ আমাকে দিয়ে যাচ্চে—

—কতটাকা এ পর্যন্ত সে এভাবে দিয়েছে সুজাতা ?

—তা তিন চার হাজার টাকা হবে !

কৌশিক হেসে বলে, সবটা শোন আগে। লাভ তার সত্যিই হচ্ছে না। খাতা কলমে সে লাভ দেখাচ্ছে, তোমাকে লভ্যাংশও দিচ্ছে। এই লোকসান সে দুভাবে পুষিয়ে নিচ্ছে। প্রথমতঃ তোমার এবং জীমূতবাহনের মনে সে বিশ্বাসউৎপাদন করিয়েছে যেতোমার বাবার আবিষ্কারের প্র্যাকটিক্যাল দিকটা তার জানা। এতে জীমূতবাহন থমকে গেছেন এবং তুমিও ওর গণ্ডী কেটে বেরিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছ না। তুমি প্রায় নিমরাজি হয়ে পড়েছ কাগজগুলো তার হাতে তুলে দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে। কাগজগুলো হাতে পেলে এসব লোকসান কোথায় তলিয়ে যাবে। এ ছাড়াও দ্বিতীয় একটি পন্থায় সে আর এক ভাবে লাভ করছিল, সেটা বেআইনি লাভ। বস্তুত সেইটে আবিষ্কার করাই ছিল আমার কাজ। তোমার বাবার আবিষ্কারের গোপনীয়তার অজুহাতে আগরওয়াল তার ফ্যাকটারির চারিধারে উঁচু কাঁটা তারের বেড়া তুলেছে। বাইরের লোকের অবাধ প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেছে এতে তার চোরাই ব্যবসার সুযোগ চতুর্গুণ বেড়ে গেছে—

—কিসের চোরাই ব্যবসা ?

—হলো—ব্লক বানাতে মাটি লাগে। তাই বাইরে থেকে এতদিন গঙ্গামাটি আনা হচ্ছিল। এখন ফ্যাকটারির ভিতরেই পুকুর কাটা হচ্ছে। সে মাটি সর্বসমক্ষে গুঁড়ো করা হচ্ছে। চালুনিতে ছাঁকা হচ্ছে—বাইরের লোক দেখতে পাচ্ছে না। যারা দেখছে, তারাও ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না; তারা জানে ও মাটি ঐ নতুন হ'লো-ব্লক তৈরীর কাজে লাগছে। আসলে রাতের অন্ধকারে ঐ মিহি-মাটি চলে যায় আগরওয়াল হলোব্লক কারখানা থেকে আগরওয়াল স্টকিস্টের এলাকায়। মাঝরাত্রে ঐ দু অংশের মাঝখানে দরজাটা নিঃশব্দে খুলে যায়। ইন্দির সর্দারের অধীনে কয়েক জন বিশ্বস্ত কর্মী সিমেন্ট বোরার মুখ খোলে আর নতুন করে সেলাই করে। হোলসেল ডীলার ময়ূরকেতন আগরওয়াল মাসে লক্ষ বোরা সিমেন্ট বিক্রি করে থাকেন। সিন্ডার-ব্লকের দৈনিক বারো শ'টাকা লোকসান কোথায় তলিয়ে যায়, লাভের অঙ্ক ফুলে ফেঁপে ওঠে !

—তাজ্জব কাণ্ড।

—তাজ্জব? না সুজাতা, যে পর্যন্ত তোমাকে বলেছি তার মধ্যে তাজ্জব কাণ্ড কিছু নেই। সারা দেশে এটাই তো স্বাভাবিক আজকের দিনে। ওষুধের ল্যাবরেটারীতে, ইনজেকসনের এ্যাম্পুলে, বেবিফুডের কারখানায় আজ নির্বিচারে ভেজাল চলছে। চালে কাঁকর, ঘিয়ে ডালডা, সরষের তেলে শেয়াল কাঁটার বীজ—এতে কেউ অবাক হয় না! আসল তাজ্জব করা খবর তো এইবার বলব।

—আরও বলবে!

—হ্যাঁ বলব বইকি! তারপর অল্প হেসে বলে, সুজাতা, একটু আগে তুমি আমাকে একটা চড় মেরেছিলে; কিন্তু তাতে আমার গালে কোন ব্যথা লাগেনি। কেন জান? তার আগেই গালে আমি আর একটা বড় রকম চড় খেয়েছিলাম। গালে আমার সাড় ছিল না।

সুজাতা প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়।

কৌশিক ম্লান হাসে, হেসেই বলে, একদিন আমাকে বলেছিলে তুমি নাকি একটা পরশপাথর পেয়েছ, সেটা নিয়ে তুমি কি করবে জানতে চেয়েছিলে। উত্তরে নির্বোধ বিশু-ড্রাইভার বলেছিল সেটা ফেলে দিতে। পরশ পাথরের বোধহয় তাই নিয়তি। আজ যদি তুমি এঞ্জিনিয়ার কৌশিক মিত্রকে ঠিক ঐ প্রশ্নটি কর, তাহলে সেও ঐ একই কথা বলবে!

—কেন কৌশিক? বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করে সুজাতা।

—শুনেছ বোধহয় ড্রাইভার হিসাবে আমার চাকরি গেছে। কেন, নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছে। আগরওয়াল জানতে পেরেছে আমার পরিচয়—জীমূতবাহনের রেকমেণ্ডেসনে আমি পুলিশের চর, ওর ব্যূহের ভিতর ঢুকে পড়েছি। এটা তাজ্জব করা খবর নয়। তাজ্জব করা খবর এই যে ডিটেকটিভ হিসাবেও আমার চাকরিটা রইল না। তার কারণটা আন্দাজ করতে পার?

—না, কেন?

—কারণ ইতিমধ্যে শ্রীল শ্রীযুক্ত ময়ূরকেতন আগরওয়াল ডাক্তার আলিকে ত্যাগ করে আবার শ্রীল শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন মহাপাত্রকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। যে মুহূর্তে আমি হাতে নাতে ধরলাম যে আগরওয়াল সিমেণ্টে গঙ্গা-মাটির ভেজাল মেশাচ্ছে, সেই দিনই আমার প্রতি আদেশ হল—সমস্ত

ব্যাপারটা চেপে যেতে। কেন? না আগরওয়ালের সঙ্গে ইতিমধ্যে জীমূতবাহনের নির্বাচনী আঁতাত হয়ে গেছে। সহজ সর্তে। আগরওয়াল ডাঃ আলিকে ত্যাগ করে জীমূতবাহনকে সমর্থন করবেন এবং জীমূতবাহন গঙ্গামাটির তদন্তটা চাপা দিয়ে দেবেন!

—কিন্তু গুপ্তচর হিসাবে তোমাকে তো জীমূতবাহন নিয়োগ করেন নি, তোমার চাকরি যাবে কেন?

—তুমি বুদ্ধিমতী, কিন্তু এবার বোধহয় তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বললে সুজাতা!

—তাই বোধহয় বললাম। কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না!

॥ আঠারো ॥

মনে আছে গল্পটার এই অংশে সুকুমার বাবুকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম, আপনিই কি কৌশিককে পাঠিয়ে ছিলেন আগরওয়ালের কাছে?

উনি হেসে বলেন, হ্যাঁ পাপ কার্যটা আমারই! আর সেইজন্যই তখন বলছিলাম কৌশিকের কৃতকর্মের জন্য পরোক্ষ ভাবে আমিও আংশিক ভাবে দায়ী।

—কি ব্যাপার বলুন তো, যদি আমার প্রশ্ন করা অবশ্য অসঙ্গত না হয়।

সুকুমারবাবু বলেন, আপনিও সরকারী চাকুরে, আপনার কাছেও যদি মনের দুঃখ চেপে রাখতে হয় তবে বাঁচি কেমন করে বলুন। আপনি ভুক্তভুগী, জানেন নিশ্চয় আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি। আজ এদল সরকার গঠন করেছে, নির্দেশমত আমরা চলেছি এপথে। হঠাৎ কাল এরা হল ক্ষমতাচ্যুত, গদিতে বসল ওরা। হুকুম দিল, এবার ও পথে চল। এতদিন যেসব দেশদ্রোহীর প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করছিলাম, গোপন ফাইলে যাবতীয় কার্যকলাপ টুকে রাখছিলাম, হঠাৎ একদিন জানতে পারি তাঁরা দেশদ্রোহী নন দেশসেবক। তাঁদেরই একজন এসে বসেন গদিতে, বলেন—ফাইলগুলো নিয়ে এস তো! কী করব আমরা ভেবে পাই না। যাঁদের নির্দেশে সে ফাইলগুলো খোলা হয়েছিল তাঁরা আর কোন সাহায্য করতে পারেন না। তাঁরা তখন বিরোধদলে গিয়ে বসেছেন। বস্তুত হয়ত তখন তাঁদের নামেই ফাইল খুলছি আমরা, তাঁরা হয়ে গেছেন দেশদ্রোহী!

বললাম, আমি এ ব্যাপারটা জানি—কৌশিক কেমন ভাবে ওই কাজে জড়িয়ে পড়ল সেইটুকু শুধু বলুন।

সুকুমারবাবু যা বললেন, তার মর্মার্থ এই রকম।

মাস দেড়েক আগে বর্তমানে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের মতে একজন পরম দেশহিতৈষী (নাম বলা চলে না, কারণ তিনি এখনও ক্ষমতাসীন) সুকুমারবাবুকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, আগরওয়ালের বিষয়ে তাঁরা কতদূর কি করছেন। সুকুমারবাবু স্বতই ঘাবড়ে যান। তাঁর যতদূর জানা ছিল ঐ আগরওয়াল ব্যক্তিটি বরাবর এই অত্যন্ত উপরতলার হোমরা-চোমরা ব্যক্তিটিকে নির্বাচনী-মদৎ জুগিয়ে এসেছেন। বরাবর পার্টি ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিয়েছেন। এমন কি দুজনের বুঝি কিছু কিছু যৌথ কারবারও আছে। অর্থাৎ আগরওয়াল যে দীর্ঘদিন ধরে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে যাচ্ছে একথা ঐ দেশহিতৈষীও জানেন, পুলিশ বিভাগও জানেন। কেউই এ বিষয়ে মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু সেকথা তো বলা চলে না। সুকুমার গুপ্ত ফলে আমতা আমতা করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁকে ধমক খেতে হয়েছিল: লোকটা একনম্বরের ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। আপনারা সব জানেন, অথচ কিছুই করছেন না।

সুকুমার বাবু বলেছিলেন, আমার ধারণা ছিল—

—আমরা তাকে শেলটার দিচ্ছি; এই তো? এইসব ভ্রান্ত ধারণা বশে আপনারা নিজেরাও ডুবছেন, আমাদেরও ডোবাচ্ছেন। লোকের কথায় সে আর কান পাতা যাচ্ছে না। আপনাদের কি? বাঁধা চাকরি, বাঁধা মাইনে বাঁধা পেনসন! আমাদের তো তা নয়। আমাদের জনগণের আস্থাভাজন হতে হয়। ইলেকটরেটের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। যাই হোক এতদিন যা করেছেন, করেছেন; এবার দয়া করে একটু তৎপর হবেন কি?

অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলেই বুঝতে পারেন, আগরওয়াল এবার আর ওঁকে সাপোর্ট করছে না। অথবা সে টালমাটাল করছে। অগত্যা তাঁকে কাত করা প্রয়োজন। ঠিক কি জাতীয় চার্জ তা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি। অর্থাৎ চার্জটা স্পেসিফিক নয়, লোকটা স্পেসিফিক। ইনকামট্যাক্সই হক, ব্ল্যাক মার্কেটই হক বা ঐ জাতীয় একটা কিছু হলেই হল। মোট কথা আগরওয়ালকে ফাঁসাতে হবে।

তা ফাঁসাবেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ইদানিং কালে আগরওয়াল এব

দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে যে, তাঁকে ফাঁসানো খুব কঠিন হবে না। প্রয়োজন ছিল ওর ব্যূহ মধ্যে একজন অত্যন্ত দক্ষ, সুচতুর চরকে প্রেরণ করা। ওর কাঁটাতারে ঘেরা কারখানার ভিতর সুকুমারবাবুর একজন নিজস্ব লোককে সর্বপ্রথমে ঢুকিয়ে দিতে হবে। গণেশ পাণ্ডে নামে একজন শ্রমিক নেতা ও এলাকায় খুব প্রতিপত্তিশালী; কিন্তু সে হচ্ছে বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের লোক। তার কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া যাবেনা। বড় কর্তাই অবশ্য বললেন উপযুক্ত একটি লোককে জোগান দিলে ব্যূহের ভিতর ঢুকিয়ে দেবার দায়িত্বটা তিনি নিতে পারেন। ঘটনাচক্রেই বলতে হয়, ঠিক ঐ সময়েই কৌশিকের সঙ্গে সুকুমারবাবুর সাক্ষাত পরিচয় হয়ে গেল অদ্ভুতভাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেন কি? তার আগে ওকে চিনতেন না?

—না। সেই প্রথম সাক্ষাত।

—আর সেই অজ্ঞাতকুলশীলকে এমন একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন?

—হ্যাঁ দিলাম! গল্পটা শুনুন তাহলে:

একটা অত্যন্ত গোপন এবং জরুরী তদন্ত সেরে উত্তরবঙ্গ থেকে গুপ্ত সাহেব ট্রেনে করে কলকাতা এসে পৌছালেন। যে ট্রেনে তাঁর ফেরার কথা ছিল তার আগের ট্রেনে ফিরেছেন। স্টেশানে সরকারি গাড়ি ছিল না; টেলিফোন করে সরকারি গাড়ি আনাতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। উনি একটা ট্যাক্সি নিলেন। বাক্স বিছানা উঠল পিছনের কেরিয়ারে। ওঁর হাতব্যাগটা, যাতে মূল্যবান দলিলপত্র ইত্যাদি রয়েছে সেটা রাখলেন পিছনের সীটের উপরের খোপে। আর্দালি রামদীন বসল ড্রাইভারের পাশে। অল্পবয়সী বাঙালী ড্রাইভার, প্রশ্ন করল—কোথায় যাবেন স্যার?

ধড়া চূড়া পরা ছিল না গুপ্তসাহেবের। গোপন তদন্তে গিয়েছিলেন। গুপ্তসাহেব বলেন, রাইটার্স বিল্ডিংস।

গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে এল তা ঠিক মনে করতে পারেন না গুপ্তসাহেব। তিনি তন্ময় হয়ে চিন্তা করেছিলেন ঐ কেসটার বিষয়ে। স্বর্ণ-আইন ঘটিত কেস। চাঞ্চল্যকর খবর সংগ্রহ করে এনেছেন তিনি।

অফিসে পৌছে আর্দালীকে বললেন, মালপত্র তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে; নিজে সোজা চলে গেলেন আই. জি-র ঘরে! প্রাথমিক সংবাদটা তাঁকে মৌখিক না জানিয়ে তাঁর স্বস্তি হচ্ছিল না। আই. জি-র ঘরের সামনে গিয়ে শোনেন,

সেখানে একটা কনফারেন্স চল্‌ছে। প্রায় ঘন্টা খানেক পরে তিনি আই জি-র সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন। কথাবার্তা বলে আরও আধঘন্টা পরে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখেন মালপত্র আগলে রামদীন পাহারা দিচ্ছে।

—আমার ব্যাগটা ?

—সেটাতো আপনার হাতেই ছিল স্যার !

—সেকি ? কই না তো ?

—হ্যাঁ স্যার, আমি বাক্সবিছানা নামালাম, আপনি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বড় সাহেবের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

গুপ্তসাহেব তখনই দৌড়ালেন আই. জি-র ঘরে। বৃথা আশা। সেখানে নেই। গুপ্তসাহেবের স্পষ্ট মনেও আছে ব্যাগহাতে তিনি প্রথমবার আই. জি-র ঘরে যাননি। একমাত্র সম্ভাবনা, আর সম্ভাবনা কেন, সেটাই নিশ্চিত ঘটেছে—ব্যাগটা ট্যাক্সি থেকে আদৌ নামানোই হয় নি। সর্বনাশ! ব্যাগের মধ্যে মূল কাগজপত্র প্রমাণ ছাড়াও ছিল একটা স্যাম্প্‌ল। অর্থাৎ একটি নিরেট সোনার বার। অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা দাম হবে। পাঁচ হাজার টাকাটা বড় কথা নয়, সে খেসারৎ না হয় দেওয়া যায়; কিন্তু এইমাত্র আই. জি.-কে তদন্তের যে ফলাফল মৌখিক জানিয়ে এলেন তার কাগজপত্রও যে খোয়া গেল ঐ সঙ্গে! কী কৈফিয়ৎ দেবেন? রামদীনকে দায়ী করা চলে না, তার দোষ নেই। ব্যাগটা বরাবর ওঁর হাতেই ছিল। খেজুরিয়া-ঘাটে উনি কুলিকে বইতে দেন নি। রামদীন ব্যাগটা নিতে চেয়েছিল, তাকেও দেন নি। রামদীন ধারণাই করতে পারেনি যে ব্যাগটা না-নিয়েই উনি নেমে গেছেন। ট্যাক্সির নম্বরটা মনে নেই। ড্রাইভারের চেহারাটা আবছা মনে আছে। বাঙালি, অল্পবয়স, হাফ-সার্ট পরা। না কি বুশ-সার্ট? চশমা ছিল কি? না:, আর দশটা ঐ বয়সী ছেলের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিলে উনি তাকে সনাক্ত করতে পারবেন না। ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে দেখেনই নি। লালবাজার কন্ট্রোলরুমে এখনই খবর দেওয়া দরকার; কিন্তু তাহলে পুলিশ মহলে এ কেলেঙ্কারি জানাজানি হতে আর মুহূর্ত বিলম্ব হবে না। ঘরে ঘরে ফিস্‌ফিসানি শুরু হয়ে যাবে। অসতর্ক অকর্মণ্য বলে এতদিন যে সব অধঃস্তন অফিসারকে গালাগাল দিয়েছেন তারা এখনি ছুটে আসবে সহানুভূতি জানাতে। সোনার বারটা থাকায় ওটা ফিরে পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বারটা গলিয়ে ফেললে ধরে কার বাবার সাধ্য? কী করবেন, কার

সঙ্গে পরামর্শ করবেন কিছুই স্থির করতে পারেন না। মুখটি চুন করে রামদীন দাঁড়িয়ে আছে হুকুমের অপেক্ষায়॥ নিজের ঘরের মধ্যেই অশান্ত পায়চারি করতে করতে ভাবছেন, কী করা উচিত! হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিরক্ত হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বলেন, গুপ্ত স্পিকিং!

ইংরাজীতে প্রশ্ন করল ও-প্রান্তবাসী, আপনি কি আজ সকাল দশটার সময় শেয়ালদহে একটা ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন?

নিমজ্জমান ব্যক্তি যে অধীর আগ্রহে ভেসে যাওয়া কাঠের গুঁড়ির দিকে হাত বাড়ায়, সেই ভাবে বলে ওঠেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো? কে আপনি?

—আপনি কি গাড়িতে কিছু ফেলে গেছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কালোরঙের এট্যাচি কেস; আমার নাম লেখা কার্ড আছে তাতে। কে আপনি?

—আমি সেই ট্যাক্সির ড্রাইভার! আমি অনেকদূর থেকে ফোন করছি ত. আপনার মাল ঠিক আছে।

—আপনার ট্যাক্সির নম্বর কত?

লোকটা হেসে বলে, অত ব্যস্ত হবেন না স্যার। সোনার বারটা গায়েব করার ইচ্ছে থাকলে যেচে ফোন করতাম না। শুনুন, আপনি রাইটার্স বিল্ডিংসের মেইন গেটে আধঘণ্টা পরে নেমে আসুন। আপনার চেহারা আমার মনে আছে। হাতে হাতে ব্যাগটা ফেরত দিতে চাই।

—আপনার নাম কি? ট্যাক্সির নম্বর কত?

আবার হেসে উঠল লোকটা। বললে, একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে আপনাকে ফোন করছি। যদি বলি আমার নাম বিশ্বনাথ দাস এবং আমার ট্যাক্সির নম্বর W. B. T 420, আপনি আমাকে ধরতে পারবেন? এক্সচেঞ্জকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন না? লালবাজার কণ্ট্রোলরুমে ফোন করে দেখুন, আমাকে ধরতে পারেন কিনা!

বলেই লাইনটা কেটে দিল!

আধঘণ্টা সবুর করার মত মনের অবস্থা ছিল না, তখনই নেমে এলেন নিচে। আধঘণ্টা পায়চারি করলেন রাস্তায়। তারপর একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো, মেন গেটে। গাড়িটা পার্ক করে ব্যাগ হাতে ছেলেটি নেমে এল। ওঁর হাতে ব্যাগটা দিয়ে বললে, তালা লাগান নি কেন? নিন, মাল মিন।

তিনটাকা পঁচানব্বই নয়া পয়সা দেবেন। টালিগঞ্জ থেকে মিটারে উঠেছে তিনটাকা আশি, আর পনের নয়া একটা টেলিফোন কল বাবদ!

উনি ছেলেটির হাত ধরে বলেছিলেন, তোমার নাম বিশ্বনাথ দাস নয়, কি নাম তোমার?

—কৌশিক মিত্র।

—তুমি আমার সঙ্গে উপরে এস।

—খামোকা খেজুরে আলাপ করে কি হবে স্যার? আমি মেহনতি মানুষ। আপনার মত সরকারী চাকুরে নই। আমায় সময়ের দাম আছে।

—তা হ'ক। এস তুমি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলেটি শেষপর্যন্ত উঠে এল লিফ্‌টে করে। ওঁর ঘরে তাকে বসিয়ে বলেন, এই ব্যাগের ভিতরে কি আছে তুমি জান?

হো হো করে হেসে ওঠে কৌশিক, বলে, ও হো, তাই জন্যে উপরে নিয়ে এসেছেন? ধরুন, ধরুন, রাঘব বোয়ালটাকে ধরুন। আমি ওয়ার্ড-অফ-অনার দিচ্ছি এ কথা প্রকাশ পাবে না।

—তুমি কাগজ পত্রগুলো সব দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—আর কেউ দেখেছে?

—না।

—তুমি এসব পড়ে বুঝতে পেরেছ?

—তা কিছু কিছু পেরেছি বৈকি।

—কতদূর লেখাপড়া শিখেছ তুমি?

কি মনে হয় আপনার?

—আমার কি মনে হয় সে প্রশ্ন অবান্তর। কতদূর লেখাপড়া শিখেছ বল।

—আমি বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটির বি এস্‌সি এবং কলকাতার বি. ই!

—বি. এস্‌সি, বি. ই? তুমি পাশ করা এঞ্জিনিয়ার?

কৌশিক হেসে বলে, শুধু যেমন তেমন পাশকরা নয় স্যার, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম, দুবারই!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গুপ্তসাহেব, বিশ্বাস করা কঠিন! বলেন, দেখি তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স।

কৌশিক হেসে বললে, পুলিসে চাকরি করতে করতে মানুষজনকে কেবল অবিশ্বাস করতেই শিখেছেন স্যার? নিন, দেখুন।

ড্রাইভিং লাইসেন্সে কৌশিক মিত্রের নামের পাশে লিখা আছে বি. এস্‌সি; বি. ই

—আপনি ট্যাক্সি-ড্রাইভারী করছেন কেন?

আবার হো হো করে হেসে ওঠে কৌশিক।

—হাসছেন কেন?

—এতদিন ভেবেছিলাম, বৃথাই দু'দুটো ডিগ্রি নিয়েছি। এখন দেখছি একবারে বৃথা হয়নি। ঐ ডিগ্রির কল্যাণে 'তুমি' থেকে 'আপনি' হয়ে গেলাম কিনা!

আপনি তুমির বিড়ম্বনা এড়িয়ে ইংরাজিতে প্রশ্ন করেন গুপ্তসাহেব, সুবিধামত চাকরি পেলে আপনি করতে রাজি আছেন?

—সুবিধামত মানে? পুলিসের চাকরি তো? ও আমার ধাতে সইবে না। তারচেয়ে এই বেশ আছি।

গুপ্তসাহেব তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললেন। এই ছেলেটিকেই তিনি পাঠাবেন আগরওয়ালের চক্রব্যূহের ভিতর। পারলে এই পারবে সপ্তরথীর আক্রমণ তুচ্ছ করে সে ব্যূহের ভিতর ঢুকে পড়তে! ও সিভিল এঞ্জিনিয়ার। সিমেণ্ট আর লোহার কারবারে ময়ূরকেতন আগরওয়াল কিছু কালোবাজারী খেল দেখাচ্ছে কিনা ওর চেয়ে তা অন্য কোন ডিটেকটিভ ভাল বুঝবে না। ছেলেটি পড়াশুনায় খুবই ভাল ছিল, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এবং সবচেয়ে বড় কথা ছেলেটি অত্যন্ত সৎ। আগরওয়ালের ব্যাপারে ওঁর সবচেয়ে ভয় ছিল, আগরওয়াল ঘুষের অস্ত্রে ওকে কাবু করে ফেলবে। ময়ূরকেতন আগরওয়াল যে দীর্ঘদিন ধরে কালোবাজারি করে চলেছে এটা তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল, জীমূতবাহনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইদানিং সে অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে পড়েছে এটাও জানতেন। সুতরাং তদন্তকারী অফিসার যে সহজেই সাফল্যমণ্ডিত হবে এটাও জানতেন তিনি; জানতেন না যেটা সেটা হচ্ছে শেষ মুহূর্তে আগরওয়াল তদন্তকারী অফিসারের মুখবন্ধ করতে কি পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসাবে দিতে চাইবে। ওঁর মনে হল এই হীরের টুকরো ছেলেটিকে কিনবার মূলধন বোধহয় আগরওয়ালের কুবেরের ভাণ্ডারেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গুপ্ত সাহেব সব কথা ওকে খুলে বলেন।

ছেলেটা এক কথায় রাজি হয়ে গেল! বলেই নিজেকে সংশোধন করেন আবার। বলেন, না এক কথায় রাজি হয়নি, একটি সর্ত আরোপ করেছিল সে বলে আবার চুপ করে গেলেন।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কী সর্ত আরোপ করেছিল কৌশিক?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুকুমার গুপ্ত বলেন, আমার সমস্ত কথা শুনে ছেলেটি বললে, বেশ, এ চাকরি নিতে আমি রাজি আছি। কিন্তু একটি সর্তে!

—কী তোমার সর্ত বল?

—আমি যখন তদন্ত শেষ করে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমেত আমার রিপোর্ট পেশ করব তখন আপনি বা আপনার কোন উপরওয়ালা ঐ আগরওয়ালের কাছে ঘুষ খেয়ে সেটা চেপে যাবেন না তো?

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, বললাম, এই কথা বললে কৌশিক? ইন সো মেনি ওয়ার্ডস?

ম্লান হেসে গুপ্ত সাহেব বলেন, হ্যাঁ! যেন ঠাস করে একটা চড় মারল আমাকে! আর এখানেই আমার গল্পের ট্র্যাজেডি নরেনবাবু, আমি ছেলেটির হাত দুটি ধরে বলেছিলাম, আই এ্যাকসেপ্ট!

তখনও ব্যাপারটা ঠিক জানতাম না আমি, তাই বলি, কিন্তু সেটা আপনার ট্র্যাজেডি হতে যাবে কেন?

গুপ্তসাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বলেন, কৌশিক যেদিন তার রিপোর্ট দাখিল করল, তারপর দিনই আমার উপর হুকুম হল সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যেতে!

—আপনার উপরওয়ালার হুকুম?

—না! পুলিস-বিভাগের অর্ডার নয়। রাজনৈতিক চাপ! ক্ষমতাসীন পার্টির উপর-মহলের যে কর্তাব্যক্তির নির্দেশে এ তদন্ত শুরু করেছিলাম, তাঁরই হুকুম এল, আর তদন্তের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু খুনের মামলায় সে জড়িয়ে পড়ল কি করে? খুন সত্যিই ও করেছে?

—সেইটাই আমি আজও জানি না! হাজতে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম একজন উদীয়মান উকিলকে নিয়ে। তাঁকে ওকালতনামা দিতে রাজি হল না। বললে, ও ডিফেন্স দিতে চায় না!

—গিল্টি প্লীড করবে?

—না তাও করবে না। তাকে বলেছিলাম, আমার বিশ্বাস তুমি ঘটনা

চক্রে জড়িয়ে পড়েছ, তুমি মিস্টার অরূপরতন মহাপাত্রকে ওকালতনামা দেও। আমি কথা দিচ্ছি, আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে তুমি বেকসুর হয়ে বেরিয়ে আসতে পার। জবাবে কি বলল জানেন? বললে, আপনার কথার মূল্য কি? চাকরি গ্রহণ করবার সময়েও তো আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা রাখতে পেরেছেন?

শেষ দিকে গলাটা ধরে এল গুপ্তসাহেবের! বললেন, এতবড় অপমান আমি জীবনে হইনি। সাতআটটা মানুষ আমার রোজগারের উপর নির্ভরশীল, না হলে আমি রিজাইন করতাম নরেনবাবু!

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

কথার মোড় ঘোরাতে তাড়াতাড়ি বলি, যাক ওকথা। গল্পটা শেষ করুন।

—গল্প তো আর নেই। কাহিনীর যে এখানেই শেষ।

আমি বলি, সে কি? কৌশিক কাকে খুন করল, কেন খুন করল, অথবা কেমন করে খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল সে গল্প তো বলবেন?

—বলব, কিন্তু সেটাতো কাহিনী নয়। এ পর্যন্ত হল ঘটনা; যাকে বলে ফ্যাক্‌ট। এর পর তো শুধু এভিডেন্স! ফ্যাক্ট ধরে যদি চলতে চান তাহলে একটা মস্ত বড় মিসিং লিংক বাদ দিয়ে একেবারে অকুস্থলে হাজির হতে হবে। খুন হয়েছে খবর পেয়ে সদর থানার বড় দারোগা রমেন গুহ যখন তদন্ত করতে এল।

—কোথায় এল, কখন এল, খুনই বা হল কে?

—খবর নিয়ে এসেছিল কাদের আলি শেখ। আগরওয়ালের বাগানবাড়ির চৌকিদার। সাতই নভেম্বর রাত্রি দশটায় সে একখানা সাইকেলে চেপে থানায় আসে এবং খবর দেয়—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, সাতই নভেম্বর মানে কবে হল? আগে আপনি তারিখ বলেন নি; যেদিন সকালে কৌশিকের চাকরি গেল—

—হ্যাঁ, সেইদিনই রাত্রে। রমেন গুহ জীপে করে তখনই হাজির হয়েছিল অকুস্থলে, অর্থাৎ সেই ভাঙা পড়ো বাগান বাড়িটায়। রমেন সেখানে পৌঁছায় রাত দশটা পঁচিশে। কাদের আলির মুখে আগরওয়াল খুন হয়েছে শুনে—

আগরওয়াল। সে তো ছিল কলকাতায়।

—হ্যাঁ তাই ছিল। তাহলে সুজাতার স্টেটমেন্ট থেকে খানিকটা আগে বলে নিই। কৌশিকের পরামর্শমত সেদিনই সন্ধ্যায় সুজাতা ওখান থেকে

পালাবার চেষ্টা করে। কথা ছিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার মেলে আগরওয়াল আসবে। ওরা স্থির করে সেই ট্রেনেই পালাবে ওরা। কৌশিককে তার আগেই বিদায় করা হয়েছে। একটি ড্রাইভার সঙ্গে নিয়ে সুজাতা স্টেশনে বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়ে। নকুলকে বলে যায় সে সময়মত স্টেশনে যাবে এবং সন্ধ্যা ছটা পনেরোর ট্রেন এ্যাটেণ্ড করবে, আগরওয়ালকে রিসিভ করতে। এদিকে কৌশিকের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল যে, ট্রেন যখন স্টেশনে ঢুকবে তখন সুজাতা একেবারে ইঞ্জিনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। টিকিট কাটবে কৌশিক। গাড়ি স্টেশনে প্রবেশ করা মাত্র ওরা দুজনে তাতে চড়ে বসবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। ট্রেনটা স্টেশনে আসে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সুজাতা সওয়া ছয়টার সময় স্টেশনে পৌছায় ;—গিয়ে শোনে গাড়ি সেদিন সত্তর মিনিট লেট। দূর থেকে সে কৌশিককে দেখতে পেয়েছিল, ইচ্ছে করেই কথাবার্তা বলেনি, অনেকক্ষণ মেয়েদের ওয়েটিং রুমে বসেছিল চুপ করে। হঠাৎ দেখে আগরওয়াল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। সুজাতা খুব অবাক হয়ে যায়। আগরওয়াল জানায় সে শেষমুহূর্তে মত বদলে কলকাতা থেকে সরাসরি গাড়িতেই এসেছে। সুজাতা স্টেশনে এসেছে শুনে সে সোজা চলে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। নকুলও তার সঙ্গে ছিল। কথা বলতে বলতে ট্রেনটা এসে যায়। ওরা স্টেশান থেকে বেরিয়ে আসে। কৌশিক যে দূর থেকে এই নূতন পরিস্থিতি লক্ষ্য করছে তা সুজাতা বুঝতে পারে ; কিন্তু বাধ্য হয়ে সে আগরওয়ালের সঙ্গে ফিরে যায়। তারপর কেন যে ওরা সবাই বাড়ি না গিয়ে বাগানবাড়িতে এল সে রহস্য এখনও ঠিক পরিষ্কার হয়নি।

আমি প্রশ্ন করি, সেই কাগজগুলো কোথায় ছিল ?

—সুজাতা একেবারে খালি হাতে স্টেশনে এসেছিল, যাতে ইন্দির সর্দার অথবা নকুল দুই সন্দেহ না করে ; কিন্তু তার ব্লাউসের ভিতর ছিল সেই বন্ধ খামটা !

—তারপর ?

—তারপর আবার এভিডেন্স। কাদের আলির মুখে আগরওয়াল খুন হয়েছে শুনে রমেন যাওয়ার পথে ডাক্তার অতুল সান্যালকেও উঠিয়ে নিয়ে যায়। ওরা গিয়ে দেখতে পায় আগরওয়াল ঘরের চৌকাঠের উপর খুন হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা। কৌশিক, নকুল আর সুজাতা তিনখানা

চেয়ারে বসে আছে বাইরের বারান্দায়। ডাঃ সান্যাল প্রথমেই আগরওয়ালের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করেন। পরমুহূর্তেই, বলেন শেষ হয়ে গেছে।

ডাক্তারের ঘোষণায় অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। রমেন তার আগেই বুঝতে পেরেছিল অনেকক্ষণ মৃত্যু হয়েছে আগরওয়ালের। লোকটা উবুড় হয়ে পড়ে আছে। তার বাঁ হাতটা ছড়ানো, ডান হাতের মুঠোয় একটা রিভলভার। পিঠের পিছন দিকে যেখানে গুলিটা বিঁধেছে সেখান থেকে রক্তের একটা ধারা নেমে এসে জমাট বেঁধেছে।

রমেন শুধু প্রশ্ন করে, ঘরের জিনিষপত্রে বা মৃতদেহে কেউ হাত দিয়েছিল ?

কৌশিক বলে, বেঁচে আছে কিনা দেখবার জন্যে আমি একবার নাড়ি দেখেছিলাম। বেঁচে নেই বুঝতে পারার পর আমরা ওঁকে কার কেউ স্পর্শ করিনি। ঘরের কোন জিনিষপত্রেও কেউ হাত দেয়নি।

—ওঁকে মৃত অবস্থায় কে প্রথম দেখেছিলেন ?

উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হয়। নকুলই শেষ পর্যন্ত বলে, সে সময়ে আমরা তিনজনই উপস্থিত ছিলাম।

—অর্থাৎ আগরওয়ালকে গুলিবিদ্ধ হতে আপনারা তিনজনেই দেখেছেন

কেউ জবাব দেয় না। মৌন সম্মতিই তাদের স্বীকৃতি।

রমেন একটু ইতস্তত করে। কে গুলি করেছিল এই প্রশ্নটা সরাসরি পেশ করা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠ্‌তে পারে না। তারপর স্থির করে ঐ চরম প্রশ্নটা একেবারে প্রথমাবস্থায় পেশ করা বোধহয় ঠিক হবে না। কথাবার্তায় ওদের আর একটু সহজ করে নেওয়া দরকার। ওর আশঙ্কা হয়, তিন জনের স্টেটমেণ্ট তিন রকম হবে। ওরা কোন স্বীকারোক্তি দেওয়ার আগে ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে প্রয়োজনবোধে ওদের এ কথা আদালতে সে পেশ করবে এভিডেন্স হিসাবে। এ সাবধানবাণী উচ্চারণ না করলে এ স্বীকারোক্তির কোন মূল্য থাকবেনা আদালতে। অথচ যে মুহূর্তে ও এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করবে, অমনি ওরা সাবধান হয়ে যাবে। তাই এ পর্যায়ে সে আরও কিছুটা স্বাভাবিক কথোপকথন চালিয়ে যেতে চাইল। কৌশিককে বলে, আপনি কখন এখানে এসেছিলেন ?

—ঘড়ি দেখিনি, আন্দাজ নটার সময়।

—কেমন করে আসেন ?

—সাইকেলে চেপে।

—কেন এসেছিলেন এত রাত্রে?

—সুজাতার খোঁজে। আমি খবর পেয়েছিলাম, সুজাতাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে ধরে আনা হয়েছে।

রমেন এবার সুজাতার দিকে ফিরে বলে, একথা সত্যি? আপনাকে এখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে আনা হয়েছিল?

পাথরের মূর্তির মত বসেছিল সুজাতা। বললে—আমি কোন কথা বলব না। আমার সলিসিটারের সঙ্গে কথা না বলে আমি একটা প্রশ্নেরও জবাব দেব না।

রমেন চম্‌কে ওঠে। বুঝতে পারে, অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। ওরা দুজনেও যদি এমনি আবদার ধরে বসে তাহলে কিছুই জানা যাবে না। নকুল হুইয়ের দিকে ফিরে বলে, আপনি বলেছিলেন, মৃত্যুসময়ে আপনারা তিন জনেই উপস্থিত ছিলেন। কে ওঁকে গুলি করেছে?

নকুল একটু নড়ে চড়ে বলে, আজ্ঞে গুলি ওঁকে কেউই করেনি। রিভলভারটা মালিকের হাতেই ছিল।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান আগরওয়াল আত্মহত্যা করেছে?

—আজ্ঞে না, তা ঠিক বলতে চাই না। আচ্ছা, আমাকে সবটা গুছিয়ে বলতে দিন। আমি এখানে সন্ধ্যা নাগাদ এসেছিলাম মালিকের সঙ্গে একই গাড়িতে। উনিই চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে সুজাতা দেবীও ছিলেন। তারপর সুজাতা দেবী আর মালিক এই ঘরে চলে এসে কীসব কথাবার্তা বলতে থাকেন। খানিক পরে মালিক আমাকে ডেকে বললেন গাড়ি থেকে হুইস্কির বোতলটা নামিয়ে আনতে। গাড়ির ভিতর বেতের ঝুড়িতে একটা মদের বোতল ছিল হুজুর, মালিক সেটা কলকাতা থেকেই এনেছিলেন। কিন্তু সেটা আনতে গিয়ে দেখি অসাবধানে সেটা ভেঙে গেছে। মালিক আমাকে একটা একশ টাকার নোট দিয়ে বললেন লক্ষ্মীসাহার দোকান থেকে এক বোতল হুইস্কি কিনে আনতে। আমি সাইকেলে চেপে চলে গেলাম শহরের দিকে। খানিক দূর যেতেই, বুঝেছেন, সাইকেলটা গেল পাংচার হয়ে। ফলে অনেকটা রাস্তা আমাকে হেঁটেই যেতে হল সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে। তারপর মদের বোতলটা কিনে, সাইকেল মেরামত করিয়ে ফিরে আসতে আমার বেশ দেরী হয়ে গেল। ঠিক নটা বায়ো মিনিটে আমি এখানে ফিরে আসি—

বাধা দিয়ে রমেন বলে, রাত ঠিক নটা বারো কেমন করে জানলেন ?

—আজ্ঞে সাইকেলটা পাংচার হয়ে যাওয়ায় আমার খুব দেরী হয়েছিল। আমার মালিক ছিলেন খুব রাগী মানুষ। তাই সাইকেল থেকে নেমেই আমি ঘড়ি দেখেছিলাম টর্চের আলোয়, বুঝে নিতে কতটা দেরী হয়েছে। সাইকেলটা গাবগাছের গায়ে লাগাতে গিয়ে দেখি আরও একখানা সাইকেল সে গাছের গায়ে লাগানো আছে। এখানে কাদের আলি ছাড়া আর কেউ থাকে না। কাদেরের সাইকেল নেই। তাই আর একখানি সাইকেল দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। সরাসরি মালিকের ঘরে না গিয়ে আমি আউটহাউসের দিকে গেলাম। বদরকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম কে এসেছে। কিন্তু অতদূর পৌছানোর আগেই হঠাৎ ও ঘর থেকে সুজাতা দেবী একবার চিৎকার করে উঠ্লেন। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। পিছন ফিরে ঘরের খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম, মালিকের সঙ্গে কার যেন ধস্তাধস্তি হচ্ছে। লোকটাকে ঠিক তখনই আমি চিনতে পারিনি, তখনও সাইকেলটা আমার হাতে ধরা ছিল। সেটা গাছের গায়ে ঠেকিয়ে রাখছি, হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ শুনলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি মালিক দরজার উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছেন। আর সেই লোকটা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সাইকেলটা ফেলে আমি তখনই এখানে ছুটে এলাম। এসে দেখি কৌ—, মানে ঐ বিশু ড্রাইভার দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, তার জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, চুলগুলো উস্কো খুস্কো। আমি তখনই বুঝতে পারলাম বিশুর সঙ্গেই মালিকের ধস্তাধস্তি হচ্ছিল।

রমেন দারোগা তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টিতে নকুলের দিকে তাকিয়ে বলে,—ওঁর নাম যে কৌশিক মিত্র তা আপনি জানেন না বলতে চান ?

তাড়াতাড়ি একটা ঢোঁক গিলে নকুল বলে, আজ্ঞে না, তা বলব কেন ? আমিও শুনেছি ওঁর নাম কৌশিক মিত্র !

—আপনি যখন এখানে এসে পৌছালেন তখন রিভলভারটা কার হাতে ছিল ?

—মালিকের মুঠোয় ধরা ছিল, ঠিক এখন যেমন আছে।

নকুল যখন তার বক্তব্য বলে যাচ্ছে তখন সুজাতা আর কৌশিক রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিল তার কথা। তারা কোন কথা বলেনি।

রমেন সুজাতার দিকে ফিরে বলে, আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?

পাথরের মূর্তির মত ভাবলেশহীন মুখে সুজাতা বলে, আপনাকে আগেই বলেছি, যে আমার উকিলের সঙ্গে কথা না বলে আমি কোন স্বীকারোক্তি করব না।

কৌশিক হঠাৎ সুজাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, সুজাতা প্লীস্, তুমি যখন উপস্থিত ছিলে তখন যা দেখেছ তা বল।

সুজাতা জবাব দেয় না। মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

রমেন তখন কৌশিকের দিকে ফিরে বলে, বেশ, তাহলে আপনিই বলুন, নকুলবাবু যা বললেন, তা সব সত্যি ?

কৌশিক তৎক্ষণাৎ বলে, তা আমি কেমন করে জানব ? তিনি মদ কিনতে শহরে গিয়েছিলেন কিনা, তাঁর সাইকেল পাঙ্কার হয়েছিল কিনা—

—না, তা বলছিনা আমি। আচ্ছা, আপনি, বরং বলুন আগরওয়াল কিভাবে গুলিবিদ্ধ হল।

—বেশ বলছি। আন্দাজ নয়টার সময় আমি এখানে আসি—

রমেন বাধা দিয়ে বলে, একটু দাঁড়ান। আমার বোধহয় এই সময়ে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে আপনি এখন যা বলছেন, প্রয়োজনবোধে আমরা তা আপনার বিরুদ্ধে আদালতে এভিডেন্স হিসাবে ব্যবহার করব। আপনি ইচ্ছা করলে সুজাতা দেবীর মত কোন কথা বলতে অস্বীকারও করতে পারেন।

কৌশিক এক মুহূর্তও চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে বলে, তার প্রয়োজন নেই মিষ্টার গুহ। সত্যিই যা ঘটেছে তাই আমি বলছি এবং বরাবরই তাই বলব। প্রয়োজনবোধে আমার এই স্বীকারোক্তি আপনি আমার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমি আন্দাজ নটার সময় এখানে আসি একটা সাইকেলে চেপে। সাইকেলটা রাখতে রাখতেই শুনতে পেলাম সুজাতার একটা আর্ত চিৎকার। দরজাটা খোলাই ছিল। আমি ছুটে এসে দেখি সুজাতা খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, আর আগরওয়াল তার কাঁধ দুটো ধরে তাকে চিৎ করে দেবার চেষ্টা করছে।

একটু ইতস্তত করে আবার বলে, আমি জানতাম একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল সুজাতার ব্লাউসের ভিতর লুকানো ছিল, বস্তুত এখনও আছে। আমি বুঝতে পারলাম, আগরওয়াল হয় সেটা হস্তগত করবার চেষ্টা করছে, অথবা সুজাতাকে, ওয়েল—, যাই হোক আমি ঘরে ঢুকতেই আগরওয়াল ওকে ছেড়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমি তখন ঠিক দরজার উপর। আমি তার

উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই আগরওয়াল টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল একটা রিভলবার। তার ডানহাতে। আমরা দুজন কতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছি জানিনা, তবে সারাক্ষণই আমি ওর ডানহাতের কব্জিটা আমার বাঁ হাতে ধরে রেখেছিলাম। আগরওয়াল সমস্ত শক্তিতে অস্ত্রটা আমার দিকে ফেরাতে চাইছিল। আমরা দুজনে জড়াজড়ি অবস্থায় বারান্দার দিকে চলছিলাম। দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমরা দুজনেই একসঙ্গে পড়ে যাই। তখনও আমরা আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। ঠিক পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা ফায়ার হয়ে যায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আগরওয়ালের আলিঙ্গন শিথিল হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ। ঠিক তখনই নকুলবাবু এসে পড়েন! নকুলবাবুই ঐ মুসলমান দারোয়ানটিকে তারপর থানায় পাঠিয়ে দেন।

রমেন হঠাৎ সুজাতার দিকে ফিরে বলে, আপনি কি কিছুই বলবেন না?

—না!

ইতিমধ্যে রমেনের ব্যবস্থামত একজন ক্যামেরাম্যানও এসে গিয়েছিল। ফ্ল্যাসবাল্‌বের ঝলকানি উঠল বার কয়েক! তারপর মৃতদেহ সরাবার ব্যবস্থা হল। ঘরটি পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে তল্লাস করে এবং ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে এসে রমেন বলে, নকুলবাবু আপনি আমাকে না জানিয়ে শহরের বাইরে যাবেন না।

এরপর কৌশিকের দিকে ফিরে বলে, আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। আর সুজাতা দেবী, আপনি যখন আমার সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করতে রাজী নন, তখন আপনাকেও আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এও বল্‌ব, এ উৎপাত আপনি নিজেই ডেকে এনেছেন। ভাল কথা, আপনার উকিলের নামটা যদি বলেন, তাহলে আমি তাঁকে একটা খবর দিতে পারি।

—ধন্যবাদ। আমার সলিসিটার মিঃ পি. কে. বাসু, কিন্তু তিনি বর্তমানে কলকাতায়। ফলে, আপনি দয়া করে মিঃ এ. আর. মহাপাত্রকে একটা সংবাদ দেবেন।

কৌশিক এই সময় বলে, রমেনবাবু, আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি একটি কথা সুজাতা দেবীকে বলতে চাই।

—সর্বসমক্ষে ?

—নিশ্চয়ই ! গোপন পরামর্শ কিছু নয়—

—বেশ, বলুন।

কৌশিক সুজাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, সুজাতা, একটু আগে, আই মীন, রমেনবাবুরা এসে পৌঁছাবার আগে, আমি তোমাকে নকুলবাবুর সামনেই বলেছিলাম—যা ঘটেছে আমরা তিনজনেই তা অকপটে স্বীকার করব। আমরা তিনজনেই তাতে রাজি হয়েছিলাম। এখন হঠাৎ তুমি বেঁকে দাঁড়াচ্ছ কেন ?

সুজাতা জবাব দেয় না।

—তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি যে ভাবে সত্য গোপন করছ তাতে কেসটা আমার বিরুদ্ধে কি বিশ্রিভাবে টার্ন নিচ্ছে ?

চকিতে সুজাতা উঠে দাঁড়ায়, বলে—তোমার বিরুদ্ধে ?

—নয় ? রমেনবাবু মনে করতে পারেন যে নকুলবাবু এবং আমি যা বলেছি, তা বোধহয় সত্যকথা নয়, মানে—

আবার বসে পড়ে সুজাতা। ঠোঁট দিয়ে দাঁতটা কামড়ে কি যেন ভাবে, তারপর বলে, আমি সব কথা বলব—

রমেন তৎক্ষণাৎ বলে, কিন্তু মনে রাখবেন সুজাতা দেবী, আপনি যা বলছেন তা স্বেচ্ছায় বলছেন, এবং আপনার এই বক্তব্য প্রয়োজনবোধে আমরা আদালতে আপনার বিরুদ্ধেও এভিডেন্স হিসাবে দাখিল করতে পারি।

—সে কথা তো আপনি ইতিপূর্বেই বলেছেন।

—আপনাকে তখন বলিনি। এখন বিশেষ করে আপনাকেই বল্‌ছি।

—বেশ। শুনুন, নকুলবাবু ও কৌশিকবাবু যা বললেন তা সব সত্যি।

—আপনি তখন এ ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ?

—ছিলাম।

—আপনাকে কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে ধরে আনা হয়েছিল ?

—ঠিক ও কথাটা বলা উচিত হবে না। আসবার সময় প্রথমটা আমি স্বেচ্ছায় গাড়িতে উঠেছিলাম। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল একথা সত্যি।

—স্বেচ্ছায় আপনি এখানে এসেছেন বলছেন। কেন এসেছিলেন ?

—স্টেশানে মিঃ আগরওয়াল আর নকুলবাবুর সঙ্গে আমার যখন দেখা

হয় তখন আমার কাছে একটা মূল্যবান কাগজ ছিল। আমি ভেবেছিলাম আগরওয়াল সে কথা জানেনা। পাছে সে কোন সন্দেহ করে তাই তার সঙ্গে গাড়িতে বাড়ি ফিরে আসতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু গাড়ি কারখানার দিকে না গিয়ে যখন এ দিকে আসতে চাইল, তখন আমি প্রতিবাদ করি। আমার প্রতিবাদ শোনা হয়নি।

—বেশ, কৌশিকবাবু আর মিঃ আগরওয়াল যখন ধস্তাধস্তি করছিলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

—এইখানে। খাটের এ পাশে।

—কৌশিকবাবু রিভলভারটা আগরওয়ালের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন নি?

—না!

—দুজনে ধস্তাধস্তি করতে করতে এই চৌকাঠে বাধা পেয়ে একসঙ্গে পড়ে যায়?

—হ্যাঁ।

—এবং তখনই গুলিটা ছুটে যায়?

—হ্যাঁ।

—ধন্যবাদ! আর কিছু প্রশ্ন আমি করব না। আপনাকে তাহলে আমি এ্যারেস্ট করছি না। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে আপনি শহর ত্যাগ করবেন না। আপনি বাড়ি যেতে পারেন। আপনার গাড়িতো আছেই।

সুজাতা তার ব্লাউসের ভিতর থেকে গালা-মোহর করা একটা খাম বার করে সেটা রমেনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, এই খামটা আপনি রাখুন, এবং শীল করা একটি খাম পেয়েছেন বলে আমাকে একটা রসিদ দিন। এটা এখন আমার কাছে থাকা নিরাপদ নয়। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই খামটার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এটাও হয়তো এভিডেন্স হিসাবে আপনার দরকার হবে। এর ভিতর—

—জানি সুজাতা দেবী। ওটা আমিই রাখছি। রসিদও লিখে দিচ্ছি, কিন্তু আমার আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

—বলুন।

—আপনারা তিনজনেই যা বললেন তাতে দাঁড়াচ্ছে এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা। সে ক্ষেত্রে প্রথমটায় আপনি সমস্ত সত্যি কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন কেন? দ্বিতীয়ত এইমাত্র আপনি বললেন, এই 'হত্যাকাণ্ডের'

সঙ্গে খামটার সম্পর্ক নিবিড়। হত্যাকাণ্ড কেন সুজাতা দেবী? আপনি তো প্রত্যক্ষদর্শী যে এটা হত্যাকাণ্ড নয়, এ্যাকসিডেণ্ট।

সুজাতা একটু ভেবে নিয়ে বলে, আপনার দু'টো প্রশ্নেরই কৈফিয়ৎ আমি দেব। ঠিক এই জন্যই আমি উকিলের উপস্থিতি ছাড়া কোন কথা বলতে চাইনি। আমি জানি, যে এ রকম একটা রক্তাক্ত দৃশ্যের পরে আমি এখনও স্বাভাবিক হতে পারিনি। আপনাকে কোন এজাহার দিতে গেলে উল্টোপাল্টা শব্দ ব্যবহার করে বসব, ঠিক এখনই যেমন 'দুর্ঘটনা' কথাটা বলতে 'হত্যাকাণ্ড' বলে ফেলেছি। তাই আমি বলেছিলাম, আমার সলিসিটারের উপস্থিতি ভিন্ন কোন কথা আমি বলব না।

—আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বলেছিল দুঁদে দারোগা রমেন গুহ।

॥ উনিশ ॥

বাসুসাহেব তাঁর প্রশস্ত ড্রইংরুমে অস্থিরভাবে পদচারণ করে চলেছেন। হাত দুটি পিছনে। তাঁর গায়ে একটা গরম কাপড়ের ড্রেসিং গাউন। সুজাতা আর অরূপরতন বসে আছে সামনের দুটি সোফায়। পদচারণ করতে করতে হঠাৎ থেমে পড়ে বাসুসাহেব বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত সুজাতা; কিন্তু আমি তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি? তুমি তো আমার পরামর্শ মত চললে না। তোমাকে আমি বারে বারে বললাম, কাগজগুলো নিয়ে সেদিন দশটার গাড়িতে কলকাতা যেতে, এমন কি আমি নিজেও এই বুড়ো বয়সে তোমার জন্যে ক'লকাতা দৌড়লাম। কিন্তু না এখানকার স্টেশানে, না ক'লকাতায় কোথাও তোমার দেখা পেলাম না। ফিরে এসে এখন শুনছি তুমি আদৌ সে ট্রেনে যাওনি।

সুজাতা আচ্ছন্নের মত চুপ করে বসে থাকে।

অরূপ বলে, কিন্তু সুজাতা দেবী তো সমস্ত কথা আপনাকে বলেছেন। ওঁর কৈফিয়ৎটাও আপনি বিচার করে দেখুন। এখন আপনি যদি কৌশিকের ডিফেন্সটা হাতে নিতে রাজি না হন—

—কিন্তু তাই বা নেব কেমন করে? সুজাতা তো এখনও আমাকে সমস্ত

কথা খুলে বলছে না। 'নট দ্য হোল ট্রুথ।' কোথাও কিছু একটা সে গোপন করছে!

সুজাতা মাথা নেড়ে বলে, না, আমি সমস্ত কথাই আপনাকে খোলাখুলি বলেছি, কোন সত্য গোপন করিনি।

—কিন্তু আমি যে তোমাদের স্টেটমেণ্টে অনেক ফাঁক দেখতে পাচ্ছি।

—কি ফাঁক?

—অনেক ফাঁক! প্রথমতঃ কৌশিকের জামা ও কাপড় দুইই ছিঁড়ে গেছে। অথচ আগরওয়ালের বেশবাসে মারামারির তো কোনও চিহ্ন ছিল না! কেন?

সুজাতা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলে—ওঁর গায়ে গরম স্যুট ছিল, তাই টানাটানিতে ছিঁড়ে যায়নি।

—কিন্তু তার ব্যাকব্রাশ করা চুলটাও কেমন করে পরিপাটি থাকল?

সুজাতা চুপ করে থাকে।

বাসুসাহেব আবার কয়েকবার পায়চারি করে এসে বলেন, মারামারি করল আগরওয়াল, অথচ চশমাটা ভেঙে গেল নকুলের, যে নাকি মারামারির ধারে কাছে ছিল না—

—ওটা ঘটেছে অনেক আগে। নকুলবাবু মদ কিনতে যাবার আগে, তখন একদফা ধস্তাধস্তি হয়েছিল। আমার সঙ্গে নকুলবাবুর। সে যখন আমাকে জোর করে গাড়ি থেকে নামাচ্ছিল—

—কিন্তু সে কথা তো তুমি এতক্ষণ বলনি!

সুজাতা আবার চুপ করে যায়।

অরূপ বলে, একটি মহিলা দু তিনজন পুরুষমানুষের কাছ থেকে কি ভাবে শালীনতা রক্ষা করেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা—

বাধা দিয়ে বাসুসাহেব বলে ওঠেন—দেন গো টু সামওয়ান এল্স্। ডাক্তারের কাছে রোগী যখন উপসর্গ লুকাতে চায়, আর উকিলের কাছে মক্কেল লুকায় সত্য ঘটনা তখন সেটা শিবের অসাধ্য!

সুজাতা আবার বলে, বিশ্বাস করুন, সব কথাই বলেছি আমি! লুকাইনি কিছুই।

আবার কিছুক্ষণ নীরব পদচারণা করে বাসুসাহেব টেবিল থেকে পাইপটা

তুলে নেন, তাতে তামাক ভরতে ভরতে বলেন, স্টেশান থেকে রওনা হওয়ার পর ঘটনাগুলো পর পর বলে যাও তো—

—সেদিনই তো বলেছি।

—আবার বল। আমি দেখতে চাই সেদিনের স্টেটমেণ্টের সঙ্গে কোন অসঙ্গতি হচ্ছে কিনা।

সুজাতা আবার বলতে থাকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা :

স্টেশানে আগরওয়াল এবং নকুলের আকস্মিক আবির্ভাবে সে প্রথমটায় খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। তবু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলে নেয়। ওর তখন ধারণা হয়েছিল, আগরওয়াল জানতে পারেনি যে সে পালাবার মতলবেই স্টেশানে এসেছিল, এবং তার ব্লাউসের ভিতর কাগজগুলো আছে। সেটা যে ওর ভুল ধারণা এটা প্রথম বুঝতে পারে বাগানবাড়িতে পৌঁছে। তখন সে বুঝতে পারে, যে সকালবেলা সে যখন মেজ্জানইন ঘরে কৌশিকের সঙ্গে পরামর্শ এঁটেছে তখন নকুল ছই আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে সবটাই জানতে পারে। আগরওয়ালও নিশ্চয় নকুলের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরে স্টেশানে ছুটে এসেছিল—

বাসুসাহেব বলেন, আগরওয়াল কি ভেবেছিল, তুমি কি ভেবেছিলে এসব আমি শুনতে চাই না। ঘটনা যা ঘটেছিল তাই শুধু পর পর বলে যাও।

সুজাতা আবার শুরু করে তার কাহিনী :

গাড়িতে সে পিছনের সীটে বসে। নকুল সামনের আসনে। গাড়ি চালাচ্ছিল আগরওয়াল। সুজাতা লক্ষ্য করেছিল, পিছনে সীটের উপর একটা ফলের ঝুড়ি ও একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল। ফলের ঝুড়ি থেকে একটা মদের বোতলের মাথাও দেখা যাচ্ছিল। গাড়িটা কারখানার দিকে না গিয়ে বাগানবাড়ির পথের দিকে মোড় নিতেই সুজাতা বলেছিল, একি, কোথায় যাচ্ছেন?

আগরওয়াল বলেছিল, ঘাবড়াচ্ছো কেন? এদিকে একটা কাজ আছে সেটা সেরে এখনই আমরা ফিরে আসব।

—জাস্ট এ মিনিট। আন্দাজ কটার সময় তোমরা রওনা হয়েছিলে?

—ঘড়ি তো দেখিনি। সন্ধ্যে নাগাদ।

—তখনও মেল ট্রেনটা আসেনি?

—না এসেছিল। ট্রেনটা তখন এসেছিল, কিন্তু ছাড়েনি। প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল।

—ঠিক মনে আছে তোমার ?

—হ্যাঁ ; কারণ নকুলবাবুকে টিকিট কালেকটার আটকে ছিল। তার কাছে প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছিল না। গেটের টিকিট কালেকটার বলেছিল, আপনি যে এই মেল ট্রেনে নামেন নি তার প্রমাণ কি ? তখন মিস্টার আগরওয়াল এগিয়ে যান। রেলের লোকটি আগরওয়ালকে চিনত। তাই নকুলকে ছেড়ে দেয়।

—বেশ। তারপর ?

সুজাতা আবার শুরু করে :

গেটটা হাট করে খোলা ছিল। গাড়িটা সোজা কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়ে। বারান্দায় একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল। গাড়ি থামাতে দেখে একটা লোক আগিয়ে আসে। সে ওখানকার একজন মুসলমান চৌকিদার। আগরওয়াল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়, সুজাতাকে বলে, নেমে এস।

নিস্তব্ধ পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সুজাতার গা ছমছম করে ওঠে, বলে—আমি নেবে কি করব ? আপনার কি কাজ আছে সেরে তাড়াতাড়ি আসুন!

আগরওয়াল পিছন দিকের দরজাটা খুলে হঠাৎ সুজাতার হাতটা চেপে ধরে, বলে, নেমে এস সুজাতা, কথা আছে।

কেমন যেন রোখ চেপে যায় সুজাতার। আগরওয়াল ইতিপূর্বে কখনও এভাবে তার গায়ে হাত দেয়নি। ততক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে ওদের কোন বদ মতলব আছে। হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিতে যায়, বলে—কী অসভ্যতা করছেন! হাত ছাড়ুন।

আগরওয়াল সরে দাঁড়ায়, এবং তৎক্ষণাৎ নকুল আর ঐ মুসলমান লোকটা এসে ওর দু হাত ধরে। জোর করে ওকে টেনে নামায়। প্রথমটা সুজাতা দৈহিক বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু তিনজন পুরুষ মানুষের বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারেনি। ঐ সময়েই সুজাতার হাতের ধাক্কা লেগে নকুলের চশমাটা ভেঙ্গে যায়। কাদের আলি সুজাতার মুখটা একটা গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং পাঁজাকোলা করে ওকে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। হাত দুটোও ওর বেঁধে দেয়। ঘরের খাটে ওকে শুইয়ে দিয়ে নকুল ও কাদের আগরওয়ালের ইঙ্গিতে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

আগরওয়াল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে ওর মুখোমুখি বসে। তখনও হাত ও মুখ বাঁধা। আগরওয়াল ধীরে-সুস্থে একটি সিগার ধরায়; একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, শুনেছি তুমি ভাল থিয়েটার করতে পার, অভিনেতা হিসাবে আমার কৃতিত্বটাও কম নয়, কি বল?

জবাব দেবার কোন উপায় ছিল না সুজাতার।

আগরওয়াল বলে, প্রেমালাপ এক তরফা হয় না। ইচ্ছে করছে তোমার মুখের বাঁধনটা খুলে দিতে। দেব? তুমি চিৎকার করবে না তো? দেখ, চিৎকার করলে কোন লাভ নেই। আধমাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই। তবে চেঁচামেচিতে আমার মুডটা নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু শুধু চেঁচামেচি কর না, কেমন লক্ষীটি!

বলে সে এগিয়ে আসে। ওর মুখের বাঁধনটা খুলে দেয়। হাতটা বাঁধাই থাকে।

কথা বলতে পেরে সুজাতা প্রথমেই বলেছিল, আমাকে এভাবে ধরে এনেছেন কেন? কী চান আপনি?

বিচিত্র হেসে আগরওয়াল বলেছিল, এতদিন তোমার কাছে একটি জিনিসই চাইছিলাম, যা তোমার ব্লাউসের মধ্যে লুকানো আছে; কিন্তু আজ তার চেয়েও বেশি কিছু চাইছি! বেণীর সঙ্গে মাথা!

সুজাতার হাত পা হিম হয়ে আসে।

আগরওয়াল আবার বলে, মুখের বাঁধন খুলে দেবার পর তুমি চিৎকার করনি, সুতরাং আমার দিক থেকে আরও কিছু 'গুড্ জেস্‌চার' দেখানো উচিত, কি বল?

এবারও জবাব দেয় না সুজাতা।

—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবার মত সাহস আমার নেই—এ অপবাদ আমাকে কেউই দেবে না। সুতরাং হাত বাঁধা অবস্থায় তোমার ব্লাউসের বোতাম খুলে খামটা আমি বের করে নিতে পারি। তা আমি নেব না। আমি আশা করব, তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ওটা হাতে তুলে দেবে!

আগরওয়াল উঠে গিয়ে দরজার ছিটকানিটা তুলে দেয়। পকেট থেকে একটা লোডেড রিভলভার বার করে সেটা টেবিলে রাখে। তারপর এগিয়ে এসে সুজাতার হাতের বাঁধনটা খুলে দেয়, বলে খামটা নিজেই বার করে দাও!

সুজাতা কোন আপত্তি করেনি। খামটা বার করে আগরওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেটাকে টেবিলের উপর রেখে আগরওয়াল বলে, তুমি বুদ্ধিমতী। দুটো দাবী ছিল আমার। একটা মিটিয়েছ তুমি। দ্বিতীয়টাও স্বেচ্ছায় মিটিয়ে দেবে আশা করি।

সুজাতা বলে, যার জন্যে আমাকে আটকে রেখেছিলেন তা তো পেয়েই গেলেন, আবার কেন আটকে রেখেছেন আমাকে?

—তারপর? ওটা আমি হজম করব কেমন করে? ছাড়া পেলেই তো তুমি সোজা পুলিশে যাবে?

—আমি কথা দিচ্ছি, আমি পুলিসে যাব না।

—তোমার কথার গ্যারান্টি কি?

—কি গ্যারান্টি দিতে পারি বলুন?

—তোমার সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা আছে। দু-ভাবে তুমি গ্যারান্টি দিতে পার আমাকে যে তুমি পুলিসে যাবে না। এক, তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজি হবে। দুই, তুমি এখানে আজ রাত্রেই আত্মহত্যা করবে। ভেবে দেখার সময় আমি দিচ্ছি।

সুজাতার হাত পা হিম হয়ে আসে। এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এমন সংক্ষেপে প্রস্তাব দুটি আগরওয়াল পেশ করেছে তার সামনে যে সুজাতা বুঝতে পারে এছাড়া তৃতীয় কোন পথ ওর সামনে খোলা নেই। আগরওয়াল দরজার ছিটকানিটা খুলে নকুলকে ডাকে। বলে, গাড়িতে হুইস্কি আর সোডার বোতল আছে, নিয়ে আসতে।

একটু পরে নকুল ফিরে এসে বলে, হুইস্কির বোতলটা ভেঙ্গে গেছে। আগরওয়াল তখন একটা একশ টাকার নোট নকুলকে দিয়ে বলে এক বোতল হুইস্কি কিনে আনতে। নকুল অবশ্য একবার আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, আমার চশমাটা ভেঙ্গে গেছে, কাদের-আলি গেলে হয় না? আগরওয়াল ধমক দিয়ে বলেছিল, কাদের গেলে মুর্গীটা রাঁধবে কে? তুমি?

অগত্যা নকুলই তার সাইকেল নিয়ে মদ কিনতে বেরিয়ে যায়।

নকুল চলে যাবার পর আগরওয়াল আবার এসে বসেছিল তার চেয়ারে। দরজাটা সে আবার বন্ধ করে দিয়ে আসে। সুজাতাকে সে প্রশ্ন করে তুমি মনস্থির করেছ সুজাতা?

অদ্ভুত মেয়ে ঐ সুজাতা। অসম্ভব তার মনের বল। দাঁতে দাঁত দিয়ে

বলেছিল, কিন্তু আমি বিয়ে করতে রাজী হলেই বা আপনি গ্যারান্টি পাবেন কেমন করে? কালই তো আমি আবার গররাজি হতে পারি?

—তা পার। বিয়ে করতে রাজি হওয়াটা কোন গ্যারান্টি নয়। সেই কথাটা পাকা করতে আজ রাত্রে তোমাকে আমার সঙ্গে এখানে রাত্রিবাস করতে হবে। জীবনে অনেক মেয়েমানুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি। আমি বেশ বুঝতে পারব, যা দিলে, তা স্বেচ্ছায় দিলে না বাধ্য হয়ে দিলে।

—আর যদি আমি তাতে রাজী না হই?

—তার বিকল্প ব্যবস্থাও করে রেখেছি। দেখবে? বলে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে কাদের-আলিকে চীৎকার করে ডাকে। এই সুযোগে সুজাতা উঠে দাঁড়ায়। যে টেবিলটার উপর রিভলভারটা পড়ে আছে সেটা ওর কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে। রিভলভার সে জীবনে কখনও ছোঁড়েনি কিন্তু সুজাতা জানত সেটা ছোঁড়ার দরকার হবে না। কোনক্রমে ওটা হাতে তুলে নিয়ে আগরওয়ালের সামনে উদ্যত করে ধরলেই সে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এক পা ওদিকে অগ্রসর হবার আগেই আগরওয়াল ঘুরে দাঁড়ায়। সে বুঝতে পারেনি সুজাতার উদ্দেশ্য, সহজ ভাবেই বলে, বস, উঠে দাঁড়ালে কেন?

সুজাতা আবার বসে পড়ে।

কাদেরআলি এসে দাঁড়ায় খোলা দরজার সামনে।

আগরওয়াল বলে, গর্ত খুঁড়ে রেখেছ?

লোকটা ভাবলেশহীন মুখে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেবার সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটার বেলায় যে কাণ্ড হয়েছিল সে রকম কিছু হবে না তো?

লোকটা সলজ্জে জবাব দেয়, আজ্ঞে না, সেবার টাইম বড় কম হয়ে গিয়েল, তাই শ্যালে টেনে তুলেছিল। এবার মানুষভর গাড়া বানিয়েছি।

আগরওয়াল হেসে বলে, বেশ করেছ, ওটা বুজিয়ে দাও। ওর আর দরকার হবে না।

—দরকার হবে নি? তবে লাস কোথায় যাবে?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, বলে, এ পকেট ও পকেট হাতড়ে বলে, এঃ সিগার ফুরিয়ে গেছে। নকুল কি চলে গেছে নাকি?

কাদের বলে, তিনি তো অনেকক্ষণ চলে গেছেন আজ্ঞে।

—তবে তুমি যাও। শহর তক্ যেতে হবে না! নটাও বাজে নি, সোনাডাঙার মুদি দোকানটা খোলা আছে এখনও। কাঁচি ছাড়া আর কি? পাবে না। তাই নিয়ে এস তিন প্যাকেট। মাংসটা গলে যাবে না তো?

—আজ্ঞে না। আগুনটা টেনে দিয়ে যাচ্ছি। কাঠের আগুনে গুমে গুমে সেদ্ধ হবে ভাল।

—আজ রাতেই গর্তটা বন্ধ করে রেখ।

যে আজ্ঞে, বলে লোকটা চলে যায়।

দরজাটা হাট করে খোলাই থাকে।

আগরওয়াল তার চেয়ারে ফিরে এসে আবার বসে। বলে, দেখলে তো, দুরকম ব্যবস্থাই করা আছে।

দুর্জয় সাহস মেয়েটার। এর পরেও বলে, লাস যখন মাটি চাপা দেবার ব্যবস্থাই আছে, তখন আর আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে কেন? হত্যাও তো করতে পারেন।

আগরওয়াল হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, এমন অবস্থায় পড়লে আমি কিন্তু তোমার মত মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারতাম না।

—আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না যে?

—হত্যা আত্মহত্যা কোনটাই করতে হবে না। তুমি যখন স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এখানে—

—কিন্তু তারপর যে আপনিই আমাকে হত্যা করবেন না তার গ্যারান্টি কি?

—গর্তটা তো বুজিয়ে ফেলতেই বললাম। তোমাকে আমি নিজে হাতে মারতে পারব না।

—নিজের হাতে কি এর আগে কাউকে হত্যা করেন নি?

—টেপ-রেকর্ডার যখন তোমার কাছে নেই তখন আর অস্বীকার করে লাভ কি? ঐ যে খাটে বসে আছো ঐ খানেই বছর খানেক আগে আর একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে—

—চুপ করুন আপনি।

—হ্যাঁ আজকের দিনে সেসব কথা না তোলাই ভাল! তুমি তো আর তার মত অবুঝ এক গুঁয়ে নও, তুমি যখন স্বেচ্ছায়—

—চুপ করুন।

—বেশ চুপ করলাম। তাহলে তুমিই কিছু বল। না হয়, গানই শোনাও একটা?

সুজাতা চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। আগরওয়াল ছাড়া ত্রিসীমানায় আর কেউ নেই! নকুল এবং কাদেরআলি দুজনেই ঘটনাচক্রে সরে গেছে। এখন আগরওয়াল যদি একবার চেয়ার ছেড়ে ওঠে তবেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে দখল করতে পারে আগ্নেয়াস্ত্রটা। এমন চরম বিপদেও তার মাথা ঠিক আছে। বাঁচতে হলে তাকে বুদ্ধির দৌড়ে হারাতে হবে আগরওয়ালকে। চরম একটা অভিনয়ের চেষ্টা করল সে। হঠাৎ কান খাড়া করে বলে, বাইরের বারান্দায় কেউ এসেছে।

সুজাতা যা আশা করেছিল তা হ'ল না। আগরওয়াল চট করে উঠে দাঁড়াল ঠিকই; কিন্তু সবার আগে হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা তুলে নিল। টর্চটাও তুলে নেয়। বারান্দায় এসে চারদিকে টর্চের আলো ফেলে কি দেখে নেয়। ফিরে এসে বলে, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!

আবার টেবিলের উপর পিস্তল আর টর্চবাতিটা রেখে ফিরে এসে বসে সামনের চেয়ারটায়; বলে, কই গান শোনালে না?

সুজাতা মরিয়া হয়ে বলে, আমি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি নই।

—আত্মহত্যাই করবে স্থির করলে?

—আত্মহত্যা করতে যাব কোন দুঃখে?

—সংসারে তোমার বীতরাগ হয়েছে এই দুঃখে!

—আপনি কি রসিকতা করছেন?

—এটা কি রসিকতা করবার সময়?

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে আগরওয়াল সেটা আলোর সামনে মেলে ধরে। বলে. কাগজটা তোমার হাতে দিতে পারছি না. পড়ে শোনাচ্ছি, শোন: "পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ হয় না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। তোমরা সুখে থাক, এই কামনা জানাইয়া গেলাম। আমার এই মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেছি।"—বেশ হাতের লেখাটা কিন্তু তোমার।

সুজাতা লাফিয়ে ওঠে—কার লেখা ওটা?

—লেখিকা তো নিজের নাম সইও করেছেন।

—কোথায় পেলেন ওটা ?

আগরওয়াল হেসে বলে, জোগাড় করতে হয়েছে। করোনার-সম্ভবত এ চিঠিখানা কোন হস্তরেখাবিদের কাছে পাঠাবেন। তা পাঠান, এ তোমারই হাতের লেখা বলে প্রমাণিত হবে। সেই ভরসাতেই তো গর্তটা বন্ধ করে দিতে বললাম। লাস পাচার করার চেয়ে আত্মহত্যা প্রমাণ করা অনেক সহজ। কি বল ? কিন্তু তার চেয়েও সহজ হবে তুমি যদি মিসেস্ আগরওয়াল হ'তে রাজি হও !

এই কথা বলেই আগরওয়াল এগিয়ে আসে। সুজাতা উঠে দাঁড়ায়। আগরওয়াল ওর বাঁ হাতটা চেপে ধরতেই সুজাতা ডানহাতে তাকে একটা প্রচণ্ড চড় মারে। আর পরমুহূর্তেই আগরওয়াল একটা পাগ্‌লা হাতীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সুজাতার উপর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুজাতা চিৎকার করে ওঠে। এরপর বোধহয় কয়েক সেকেণ্ড সুজাতা ওকে বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, এবং ঠিক তখনই ঘরে ঢোকে কৌশিক ! সেই প্রথম আঘাত করে আগর-ওয়ালকে। আগরওয়াল তৎক্ষণাৎ সুজাতাকে ছেড়ে কৌশিককে জাপটে ধরে। দুজনে জড়াজড়ি করতে থাকে—

—জাস্ট এ মিনিট,—বাধা দিয়ে বলে ওঠেন বাসুসাহেব, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। তোমার নজর বরাবর ছিল ঐ রিভলভারটার উপর। কৌশিক আর আগরওয়াল যখন পরস্পরকে জাপটে ধরল তখন তো তোমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হত ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ রিভলভারটা হস্তগত করা—

সুজাতা বলে, হয়তো তাই ছিল, কিন্তু তখন আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।

বাসুসাহেব টেবিলে একটা প্রচণ্ড চাপড় মেরে বলেন, এইখানে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। একা ঘরে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনের জোর ঠিক রাখতে পারলে, আর কৌশিক আসার পর তুমি বিহ্বল হয়ে পড়লে ? এ যে অবিশ্বাস্য।

অরূপরতন বলে, একটা কথা হয়তো আপনি জানেন না, সুজাতা দেবী কৌশিকবাবুকে ভালবাসেন !

—ভালবাসা ! মাই ফুট। যাক্, তারপর কি হ'ল বল ?

আগরওয়ালই প্রথমে পিস্তলটার নাগাল পায়। ডানহাতে তুলে নেয়

সেটা; কিন্তু কৌশিকও বাঁ হাতে ওর কব্জি চেপে ধরে। আগরওয়াল অস্ত্রটার মুখ ঘুরিয়ে কৌশিকের দিকে আনতে চায়, আর কৌশিক প্রাণপণ শক্তিতে তাতে বাধা দিতে চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় দুজনে টল্‌তে টল্‌তে বারান্দার দিকে চলতে থাকে। হঠাৎ দরজার চৌকাঠে বাধা পেয়ে দুজনেই পড়ে যায়। ঠিক তখনই পিস্তলটা ফায়ার হয়ে গেল। আমি দেখি আগরওয়াল উবুড় হয়ে পড়ে আছে, আর কৌশিক ঝুঁকে পড়ে দেখছে। ঠিক পর মুহূর্তেই নকুলবাবু এসে ঘরে ঢোকেন।

অরূপ বলে, কাদের আলি কখন ফিরে আসে?

—আরও মিনিট পাঁচেক পরে।

—সিগারেট নিয়ে এসেছিল সে?

—তা আমি খোঁজ করিনি।

বাসু সাহেব উঠে দাঁড়ান। বার কতক পায়চারি করে ফিরে এসে বলেন, তুমি যা বলছ, তাতে পিস্তলটায় কৌশিকের হাতের প্রিন্ট থাকা উচিত নয়। তা পাওয়া যাবে না তো?

—না কৌশিক ওটা স্পর্শ করেনি।

—তুমি এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত?

—হ্যাঁ নিশ্চিত।

—পিস্তলটা আগরওয়ালের হাতেই ধরা ছিল? মৃত্যুর পরেও?

—হ্যাঁ।

পাইপে বার কতক টান দিয়ে বাসু সাহেব বলেন, তুমি বললে, ঠিক পরের মুহূর্তেই নকুলবাবু এসে ঘরে ঢোকেন। পরমুহূর্ত বলতে ঠিক কী মীন করতে চাইছ? দু পাঁচ সেকেণ্ড, না আধ মিনিট, অথবা—

—আমি এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, যে সময়ের মাপটা ঠিক বলতে পারব না। আধমিনিটের বেশি কিছুতেই হবে না।

আই মীন সময়ের ব্যবধান কি এতটা হবে যে কৌশিক কোঁচার খুঁটে পিস্তলটা মুছে নিয়ে আগরওয়ালের হাতে গুঁজে দিতে পারে?

—তা সে দেয়নি।

—আমি জানি। আমি সময় কতটা তাই বুঝে নিতে চাইছি। কৌশিক তা করেনি সেকথা তুমি আগেই বলেছ। আমার প্রশ্ন ইচ্ছে করলে সেই সময়টুকু সে পেত?

—খুব তাড়াতাড়ি করলে হয়তো পেত।

—কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পিস্তলটায় থেকে যাবার কথা, যদি না সে রুমালে জড়ানো হাতে পিস্তলটা আগরওয়ালের হাতে গুঁজে দেয়, তাই না ?

—তা তো বটেই।

—তবু তুমি বলছ কৌশিকের ফিঙ্গার প্রিন্ট ঐ রিভলভারে পাওয়া যাবে না ?

—সে কথা তো আগেই বলেছি।

—এখনও তাই বলছ তো ?

সুজাতা রাগ করে বলে, আপনি বিশ্বাস করছেন না, যে আমি সবটাই সত্য কথা বলছি।

—ওয়েল, আই এ্যাডমিট ! তাই আমার ধারণা !

এরপর আর কথা কি ?

॥ কুড়ি ॥

জুরিমহোদয়গণকে শপথ গ্রহণ করিয়ে জাস্টিস্ সদানন্দ ভাদুড়ী নিজের আসনে এসে বসলেন। আদালতে তিলধারণের স্থান নেই। ময়ূরকেতন আগরওয়াল শুধু এ জেলা সদরের নয়, এ অঞ্চলেরই একজন নাম করা লোক। একডাকে তাঁকে সবাই চেনে। ফলে আদালতে অভূতপূর্ব লোক সমাগম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তার উপর একটা গুজব বাজারে ছড়িয়েছে, যে আগরওয়ালের হত্যাকারী ঐ বিশু দাস লোকটা আসলে নাকি শিক্ষিত ভদ্রলোক। সে নাকি পাশ করা একজন এঞ্জিনিয়ার। ছদ্মবেশে আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসে চাকরি করতে এসেছিল। শুধু তাই নয়, এ মামলার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ঐ মেয়েটার সঙ্গে বিশু ড্রাইভারের বুঝি গোপন অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে নারীঘটিত কারণে ধনকুবেরের হত্যা। লোকজনের ভীড় তো হবেই ! দর্শকদের আসন অনেক আগে থেকেই পূর্ণ হয়ে গেছে। অনেকে দেওয়াল ঘেঁসে সার দিয়ে দাঁড়িয়েও আছে। কিছু প্রেসের লোকও এসেছে।

জনতার উপর থেকে বিচারকের দৃষ্টি সামনের দিকে চলে আসে। একদিকে বসে আছেন বিশালকায় প্রবীন ও অভিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি। এই আদালতেই জীবনের পঁচিশটা বছর কেটে গেছে তাঁর। পাশে বসে আছে তাঁর তরুণ সহকর্মী সুনীলেন্দু পাল। সামনে আসামীর কাঠগড়ায় খাকি ফুলপ্যান্ট আর হাফসার্ট-পরা আসামী। কদিন সে দাড়ি কামায়নি। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন, তার মনোভাব বোঝা যচ্ছে না।

প্রতিবাদীর নির্দিষ্ট আসনে সর্বপ্রথম আসনে পলিত কেশ স্থবির ব্যারিষ্টার পি. কে বাসু। পনের বছর পর গাউনটাকে আজই বার করে পরেছেন। তাঁর ঠিক পাশেই তাঁর সহকারী নবীন উকিল অরূপরতন মহাপাত্র।

প্রথামাফিক বাদী ও প্রতিবাদী প্রস্তুত কিনা জেনে নিয়ে বিচারক বিচার আরম্ভ ঘোষণা করলেন। পাবলিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আপনি কি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দেবেন?

বিশালায়তন প্রৌঢ় উঠে দাঁড়ান, অভিবাদন করে বলেন, আদালত যদি অনুমতি দেন, আমি একটি প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়েই এই বিচারের সূচনা করতে চাই। যে হত্যাকাণ্ডের বিচার জুরিমহোদয়গণ করতে বসেছেন তার ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ আসামীর অপরাধ সূর্যোদয়ের মত প্রকাশ্য। অপরাধ গোপন করবার যে সব চেষ্টা সে করেছে তার অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই প্রমাণিত হবে। আমি এই প্রারম্ভিক ভাষণে সে সব কথা কিছুই বলব না, আমি শুধু এ বিচারের বৈশিষ্ট্যটুকু বিশ্লেষণ করতে চাই। এ বিচারের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।

বিচার চলা কালে জুরিমহোদয়গণ লক্ষ্য করবেন, আজকের সমাজে যুবশক্তির কী নিদারুণ অবক্ষয় হয়েছে। উচ্চশিক্ষিত ভদ্রবংশীয় একটি তরুণ, যে নাকি দেশের ও দশের আশা ভরসা হতে পারত, সে কী ভাবে ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে তাই দেখবেন আপনারা। আমার তো মনে হয়, সমাজের এই অবক্ষয়ের পশ্চাতে আছে বিলাতি ডিটেকটিভ নভেলের এবং সস্তা ক্রাইম-চিত্রের প্রভাব।

আপনারা জানেন, স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ কত সহস্র সহস্র নূতন প্রকল্প হচ্ছে। সেখানে সুশিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারদের একান্ত অভাব। আপনারা এও জানেন যে একজন এঞ্জিনিয়ারকে তৈরী করতে রাষ্ট্রকে কত অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। সে অর্থ আপনি-আমি যোগান দিচ্ছি, আমরা

এজন্য করভারে প্রপীড়িত হচ্ছি! কেন? না আমরা আশা করে আছি আমাদের দেশের যুবশক্তি ঐ সব কারিগরী কাজ শিখে নূতন করে দেশকে গড়ে তুলবে। সন্তপাশকরা ঐ সব এঞ্জিনিয়ারদের কাছে দেশবাসীর এই হচ্ছে প্রত্যাশা।

এবার আপনারা ঐ তরুণ আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। উনি শিবপুরের বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে দুই বৎসর আগে পাশ করে বেরিয়েছেন। ওঁর পিতৃদেব কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সৎ বংশের অতি উচ্চশিক্ষিত একজন প্রাণবন্ত সুস্থ যুবকের পরিণতি এবার দেখুন আপনারা। উনি নিজের নাম গোপন করে ড্রাইভারের ছদ্মবেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর ছত্রছায়ে। স্বর্গত: ময়ূরকেতন আগরওয়ালকে আপনারা সকলেই চেনেন; অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সংখ্যাতীত প্রতিষ্ঠানে তাঁর দানের কথা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দূর পশ্চিমের লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাঙলা শুনে বোঝা যেত না যে তিনি প্রবাসী। সেই নিরভিমান, সদালাপী, মহাপ্রাণ দানবীর বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।

কী পাপ? তাঁর পাপ ছিল একটি বেকার বাঙালী যুবকের কাতর অনুনয়ে অভিভূত হওয়া; তাঁর পাপ একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে ভালবেসে বুকে টেনে নেওয়া।

জানি, আপনাদের মনে কী প্রশ্ন জেগেছে। কেন এই হত্যাকাণ্ড? সে কথা এ বিচারালয়ে ক্রমশ: প্রকাশ্য। এক কথায় তার জবাব, পরশ্রীকাতরতা, অর্থ-লালসা এবং যৌনক্ষুধা। বাদীপক্ষ থেকে আমরা আশা করব যে, এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্থির মস্তিষ্কে যে করতে পারে এবং 'পার্টনার-ইন্-ক্রাইমের' সাহায্যে প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করতে পারে তাকে জুরিমহোদয়গণ চরমতম দণ্ডের আদেশ দিয়ে বিচারালয়ের মর্যাদা রক্ষা করবেন।

কপালের ঘাম মুছে বিশাল বপু মাইতি সাহেব আসন গ্রহণ করেন।

জজ সাহেব প্রতিবাদী আইনজীবীদের দিকে দৃক্‌পাত করে বলেন, আপনারা কোনও প্রারম্ভিক ভাষণ দেবেন?

অরূপরতন উঠ্‌তে যাচ্ছিল, তার কাঁধে একটা হাত দিয়ে ব্যারিস্টার বাসুসাহেব উঠে দাঁড়ান। বিচারালয়ে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। কিন্তু সকলের প্রত্যাশাকে

ধূলিসাৎ করে বাসুসাহেব বলেন, না, আদালত অনুমতি করলে বাদীপক্ষ তাঁদের প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

নিরঞ্জন মাইতি বোধহয় এটা আশা করেননি। জজ সাহেবের ইঙ্গিতে তিনি তাঁর প্রথম সাক্ষীকে আহ্বান করলেন,—ডাঃ অতুলকৃষ্ণ সান্যাল।

অতুলকৃষ্ণ যথারীতি শপথ নিয়ে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ান। মাইতি মশাই তাঁর নাম, পরিচয়, পেশা ইত্যাদি প্রশ্নের আকারে প্রতিষ্ঠা করলেন। ডাক্তার সান্যাল তাঁর সাক্ষে জানালেন, গত সাতই নভেম্বর রাত্র দশটা কুড়িমিনিটে তিনি মৃত ময়ূরকেতন আগরওয়ালকে পরীক্ষা করেন। তাঁর অনুমান গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগরওয়ালের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থাও তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে করেছেন। অটোপ্সি রিপোর্ট অনুযায়ী গুলি পিঠের দিক থেকে দেহে প্রবেশ করেছে, মেরুদণ্ডের কঠিন অস্থিতে প্রতিহত হয়ে গুলিটা তীর্যকগতি প্রাপ্ত হয় এবং হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে। গুলিটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের সময় পাওয়া গেছে। সেটি তিনি তদন্তকারী অফিসারের কাছে অর্পণ করেছিলেন।

মাইতি প্রশ্ন করেন, মৃত্যু কখন হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস?

—রাত্র আটটা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে।

দেহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত সীসার গোলকটিকে এ মামলায় এক নম্বর এক্সিবিট রূপে চিহ্নিত করিয়ে মাইতি সাহেব প্রশ্ন করেন, আপনি বলেছেন গুলিটি পিঠের দিক থেকে মৃতের দেহে প্রবেশ করে হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করেছিল, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গুলির আঘাতে মৃত কতগুলি কেসের অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে সারা জীবনে?

—আন্দাজ করা শক্ত।

—তবু কত হবে? পাঁচ-দশটা, অথবা কয়েক শ, অথবা কয়েক হাজার?

—না হাজার হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ধরে শত খানেকের উপর হবে।

—এর মধ্যে একটি কেসও কি আপনি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছেন, যেখানে আহতের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে গুলি দেহে প্রবেশ করেছে, অথচ পরে প্রমাণিত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র আহতের নিজের হাতে ছিল?

—না।

ক্ষেত্রে কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, যে রিভলভারটি মৃতের হাতে থাকা সত্ত্বেও ফায়ার হয়ে যায় এবং গুলিটি তাঁর পৃষ্ঠদেশ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে?

—অবজেক্‌শান য়োর অনার! উঠে দাঁড়ান বাসু-সাহেব। বলেন, সাক্ষী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারেন, তাঁর অনুমান কোন এভিডেন্স নয়।

জাস্টিস ভাদুড়ী গম্ভীরভাবে বলেন অবজেক্‌সান ওভাররুল্‌ড্‌। সাক্ষী একজন বিশেষজ্ঞ। আদালত সাক্ষীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনুমান শুনতে ও নথীবদ্ধ করতে প্রস্তুত।

ডাক্তার সান্যাল বলেন. আমার মতে আগ্নেয়াস্ত্রটি মৃতের হাতে থাকা অবস্থায় ফায়ার হলে এভাবে তার পিঠে গুলি লাগতে পারে না।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, রিভলভার থেকে যখন গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেটা মৃতব্যক্তি ছাড়া আর কারও হাতে ছিল।

—আমার তাই বিশ্বাস।

—আপনি যখন মৃতদেহটি পরীক্ষা করেন তখন রিভলভারটি কি মৃতের ডান হাতের মুঠিতে ধরা ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার কি এই অনুমান যে রিভলভারটি ফায়ার করার পরে মৃতের হাতে কেউ সেটা গুঁজে দিয়েছিল?

—অবজেক্‌সান, য়োর অনার! সাক্ষীর অনুমান কোন এভিডেন্স নয়— আবার প্রতিবাদ করে ওঠেন বৃদ্ধ বাসুসাহেব।

—অবজেকসান সাস্‌টেইনড। এ প্রশ্ন বিশেষজ্ঞর কাছে পেশ করা হয়নি। সাক্ষীর অনুমাননির্ভর উত্তর এ ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য।

মাইতি একটু হেসে বলেন, আমার সওয়াল শেষ হয়েছে।

বাসুসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বলেন, আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন যে রিভলভার থেকে যখন গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেটা মৃতব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও হাতে ছিল—এইটেই আপনার বিশ্বাস! নয় কি?

—হ্যাঁ তাই বলেছিলাম।

—আপনি কি প্রাথমিক তদন্তের সময় শুনেছিলেন যে আসামী স্বীকারোক্তিতে বলে যে তার সঙ্গে মৃতব্যক্তির একটা ধস্তাধস্তি চলছিল এমন সময় দুজনেই পড়ে যায়?

—হ্যাঁ শুনেছি।

—এমন কি অসম্ভব যে পতনের পূর্বমূহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্রটি মৃতব্যক্তির হস্তচ্যুত হয় এবং সে তার উপর পড়ে যায়?

—আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। আমি তো সে সময় উপস্থিত ছিলাম না।

আপনি যখন পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে আমার সহযোগীকে বললেন যে যন্ত্রটা মৃতব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও হাতে ছিল, তখনও কি আপনি ভেবে দেখেছিলেন যে আপনার পক্ষে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়াও শক্ত ছিল, যে হেতু আপনি সে সময় উপস্থিত ছিলেন না?

সাক্ষী নীরব।

—আমি প্রশ্ন করছি যে আপনার মতে এ ঘটনা ঘটা সম্ভব কিনা?

—অসম্ভব নাও হতে পারে।

—সে ক্ষেত্রে আগরওয়ালের দেহের চাপে হস্তচ্যুত সেই রিভালভারটি ফায়ার্ড হয়ে যেতে পারত?

—তা পারত।

—এবার বিশেষজ্ঞ হিসাবে বলুন, সে ক্ষেত্রে গুলি মৃতের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করতে পারত কি?

—তা পারত।

—এবং সে ক্ষেত্রে ফায়ার্ড হওয়ার মুহূর্তে রিভলভারটি কারও হাতে থাকত না?

—না, তা থাকত না!

—অথচ আপনি নিঃসন্দেহ যে ফায়ার হওয়ার মুহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্রটি মৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও 'হাতে' ছিল.?

—না, মানে—

—মানে কিছু নেই। আপনি নিঃসন্দেহ কি না। হ্যাঁ, না, না?

—না।

—অথচ বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি হলপ করে একটু আগেই বলেছেন যে আপনি নিঃসন্দেহ, কেমন?

সাক্ষী নিরুত্তর।

—আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—আমি ভুল বলেছিলাম।

—বিশেষজ্ঞ হিসাবে আর কি কি ভুল উত্তর দিয়েছেন আপনি ?

সাক্ষীর মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে।

—অবজেক্‌সান য়োর অনার ! জেরার পদ্ধতিতে আমার আপত্তি। বলেন মাইতি।

অবজেক্‌সান সাসটেইন্‌ড। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

—আচ্ছা ডাক্তার সান্যাল, আপনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিশ্চয় জানেন যে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আহতের দূরত্ব যদি মাত্র দু-চার ইঞ্চি হয় তাহলে আঘাত চিহ্নের কাছে ঝল্‌সে যায়, যাকে ইংরাজিতে বলে 'চার্ড' হয়ে যাওয়া ? বারুদের চিহ্নও তার চামড়া ও জামায় থাকার কথা ?

—হ্যাঁ জানি।

—এক্ষেত্রে মৃতের দেহের চামড়ায় অথবা কোটে সে রকম কোন চিহ্ন ছিল কি ?

—না।

—বিশেষজ্ঞ হিসাবে তা থেকে আপনার এই অনুসিদ্ধান্তই করা উচিত নয় কি, যে আগরওয়ালের দেহের চাপে রিভলভারটা ফায়ার্ড হয়ে যায় নি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অথচ আমি যখন প্রশ্ন করলাম যে এভাবে পিছন থেকে মৃতদেহে গুলি প্রবেশ করা সম্ভব কিনা, তখন আপনি জবাবে বললেন যে সম্ভবপর !

সাক্ষী এবারও নিরুত্তর।

—এটাও বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনার ভুল উত্তর, তাই নয় ?

—অবজেক্‌সান য়োর অনার। উনি ধমক দিচ্ছেন !

—অবজেক্‌সান সাসটেইনড !

আমার জেরা এখানেই শেষ।

বাসুসাহেব আসন গ্রহণ করা মাত্র অরূপরতন তাঁর কাছে সরে এসে নিম্নস্বরে বলে, এটা আপনি কি করলেন স্যার ? এরপর পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কী যুক্তি দেখাব আমরা ?

বাসুসাহেব চোখ থেকে চশমাটা খুলে বলেন, ভুল করলাম, না ?

অরূপ কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। বৃদ্ধের প্রতি যে প্রগাঢ় আস্থা

নিয়ে এ আদালতে সে এসেছিল সে আস্থা অনেকাংশে কমে যায়। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন বাসুসাহেব। যুক্তির পারম্পর্য আর তাঁর ঠিক থাকছে না।

মাইতি তাঁর পরবর্তী সাক্ষীকে আহ্বান করেন অতঃপর।

করিডোরে দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম ঘোষিত হল।

অনতিবিলম্বে মিঃ জিতেন বসাক এসে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাত তুলে যথারীতি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। ব্যালিসটিক্ বিভাগের সরকারী অফিসার লেফটেনান্ট জিতেন বসাকের নাম, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রশ্নাদি শেষ করে মাইতি প্রশ্ন করেন, মৃত ময়ূরকেতন আগরওয়ালের হাতে যে রিভলবারটি পাওয়া গেছে তা কি আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—তাতে কারও আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে কি?

—একমাত্র আগরওয়ালের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আর কারও নয়।

—রিভলভারটি কি জাতীয়?

—এটি একটি স্প্যানিস রিভলবার। তৈরী করেছেন, মেসার্স রুবি এ্যাণ্ড কোং। এটার ৩৮ ক্যালিবারের বোর।

সাক্ষী রিভলভারটির নম্বর মিলিয়ে সেটি সনাক্ত করেন। বাসুসাহেবের অনুমতি নিয়ে মাইতি সেটাকে দুই নম্বর এক্সিবিট হিসাবে নথীভুক্ত করলেন।

—মৃত ময়ূরকেতন আগরওয়ালের দেহ ব্যবচ্ছেদের সময় তার হৃদপিণ্ডে যে বুলেটটি পাওয়া গেছে সেটিও কি আপনি পরীক্ষা করে দেখছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার কি বিশ্বাস ঐ এক নম্বর এক্সিবিট বুলেটটি এই দুই নং এক্সিবিট রিভালভার থেকে ছোঁড়া হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবজেক্‌সান। উঠে দাঁড়ান বাবুসাহেব। বলেন, সাক্ষী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারেন, তাঁর বিশ্বাস অবিশ্বাস কোন এভিডেন্স নয়।

মাইতিসাহেব তাঁর বিশাল দেহটি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান: সাক্ষী একজন আগ্নেয়াস্ত্র-বিশেষজ্ঞ। তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া পরোক্ষ জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে দেওয়া এভিডেন্সও গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

—সে ক্ষেত্রে মাননীয় সহযোগীর সওয়াল স্থগিত রেখে, এই পর্যায়ে আমাকে জেরা করবার অনুমতি আমি আদালতের কাছে প্রার্থনা করি।

মাইতি হেসে বলেন, মাননীয় ডিফেন্স কাউন্সেল পনের বছর পরে কোর্টে আসছেন। তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমার সওয়াল শেষ না হলে তাঁর জেরা শুরু হতে পারে না—

বাসুসাহেবও হেসে বলেন, মাননীয় পি. পি. পঁচিশ বছর প্র্যাকটিশ করেও বোধহয় জানেন না আমার সে অধিকার এক্ষেত্রে আছে।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, আপনারা দুজনেই প্রবীণ আইনজীবি। আশা করি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে আদালত এ জাতীয় ব্যক্তিগত আক্রমণ পছন্দ করেন না।

বাসুসাহেব জাস্টিস্ ভাদুড়ীকে একটি বাও করে বলেন, I beg to ask the witness some questions on voir dire, my Lord !

জজসাহেব জুরিদের দিকে ফিরে বলেন, সাক্ষী আগ্নেয়াস্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করতে পারেন কিনা প্রতিবাদী এই পর্যায়ে সেটা যাচাই করে দেখতে চান। আইনত সে অধিকার তাঁর আছে। আপনাকে অনুমতি দেওয়া গেল।

বাসুসাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, অনুমতি পেয়েছি, কিন্তু আমার অনুযোগ অনুপ্রবেশের পথ আমি পাচ্ছি না !

মাইতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিশালবপুতে সাক্ষী প্রায় ঢাকাই পড়ে গিয়েছিল। সসংকোচে মাইতি তার দেহটা সঙ্কুচিত করে বাসুসাহেবকে এগিয়ে যেতে দেন। আদালতে মৃদু হাসির রোল উঠছিল। জাস্টিস্ ভাদুড়ী একবার হাতুড়িটা ঠুকলেন।

—আপনি বলেছেন, যে বুলেটে মিস্টার আগরওয়ালের মৃত্যু হয়েছে সেটি ঐ রিভলভার, যা নাকি দু-নম্বর এক্সিবিট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটা থেকে ছোঁড়া। এটা আপনার আন্দাজ, বিশ্বাস না স্থির সিদ্ধান্ত ?

—স্থির সিদ্ধান্ত।

—কি যুক্তিতে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন আপনি ?

—বুলেটটি '৩৮ বোর রিভলভারের—

—পৃথিবীতে কি ঐ একটিই '৩৮ বোর রিভলভার আছে ?

—আমি আমার উত্তর শেষ করিনি।

—আমি আমার প্রশ্ন শেষ করেছি। পৃথিবীতে কি ঐ একটি '৩৮ বোর রিভলভার আছে?

—আমি যে আপনার আগের প্রশ্নের জবাব দিইনি।

—আনসার ইয়েস অর নো! পৃথিবীতে কি ঐ একটিই '৩৮ বোর রিভলবার আছে?

—না।

ধন্যবাদ। আর কি যুক্তিতে আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন ঐ গুলিটি ঐ রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত?

—তাই তো বলতে চাইছি। শুনুন; ঐ রিভলভার থেকে একটি টেস্ট বুলেট ছুঁড়ে দেখা হয়েছে। কম্পারিসন মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ঐ বুলেট ঐ রিভলভার থেকে ছোঁড়া। রিভলভারটিতে ছয়টা চেম্বার আছে। আর তিনটি খালি ছিল! দুটি খোপে দুটি ডিস্‌চার্জ বুলেট ছিল এবং একটা তাজা বুলেটও ছিল। তাজা বুলেটটা ছিল ট্রিগারের সামনে। অর্থাৎ ট্রিগার টিপলেই ফায়ার হয়ে যাওয়ার কথা ডিসচার্জড বুলেট দুটি ছিল ক্লক-ওয়াইজ সামনে। অর্থাৎ বেশ বোঝা যায় দুবার ফায়ার করা হয়েছিল এবং তৃতীয় একটি তাজা বুলেট ওতে ছিল।

—যে অব্যবহৃত বুলেটটি ছিল আশাকরি সেটাই আপনারা পরীক্ষা কার্যে ব্যবহার করেছেন?

—না তা আমরা করিনি। আমরা আমাদের একটি নিজস্ব বুলেট নিয়ে টেস্ট ফায়ার করে দেখেছিলাম।

—সেই অব্যবহৃত তৃতীয় বুলেটটি দিয়ে পরীক্ষা করা হল না কেন?

—আমরা মনে করেছিলাম, আদালতে এভিডেন্স হিসাবে সেটার প্রয়োজন হতে পারে। সেটি এইটি।

বাসুসাহেব সেই বুলেটটিকে প্রতিবাদী পক্ষের এক্সিবিট হিসাবে নথীবদ্ধ করিয়ে প্রশ্ন করেন, রিভলভার তৈরীর কারখানায় যখন ব্যারেল তৈরী করা হয় তখন সেগুলো কি এক ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা হয়, না কামারেরা হাত আন্দাজে তৈরী করে?

ছাঁচে ঢেলেই তৈরী করে।

—আমি যদি ঐ কবি কোম্পানীর ঐ বছরের ঐ মেকের আর একটি

রিভলভার নিয়ে এসে ঐ অব্যবহৃত বুলেটটা ফায়ার করতে চাই, তাহলে তা আমি ফায়ার করতে পারব, না পারব না ?

—পারবেন।

—তখন যদি আমি আপনাকে সেই রিভলভারটি এবং এক্সিবিট নং দুই রিভলভারটি এনে দিই, আপনি দেখে বলতে পারবেন যে কোন গুলিটা কোন অস্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত ?

—স্যার, একই কোম্পানীর একই বছরের, একই স্পেসিফিকেসনের—

—বাজে কথা বলবেন না। যা প্রশ্ন করেছি তার জবাব দিন। হ্যাঁ, না, না ?

—না !

—তা সত্ত্বেও আপনার অনুমান নয়, বিশ্বাস নয়, একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত যে ঐ ১নং বুলেটটি ঐ ২নং রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত ?

—হ্যাঁ, কারণ ঐ একই কোম্পানীর, একই বছরে, একই মেকের দ্বিতীয় রিভলভার অকুস্থলে ছিল না।

—আপনি অকুস্থলে গিয়ে নিজে খুঁজে দেখেছেন ?

—না আমি নিজে যাইনি , তবে—

—ঐ তবে'টা তো আমি বলব। তবে আপনি কেমন করে স্থির সিদ্ধান্তে এলেন ?

—না, ওখানে যে ঐ কোম্পানীর, ঐ বছরের ঐ রকম আর একটা রিভলভার ছিল না, এটাতো সবাই জানে।

—সাক্ষী কে দিচ্ছে ? আপনি না 'সবাই' ?

সাক্ষী নীরব।

—জবাব দিন, সাক্ষী কে দিচ্ছে ? আপনি না 'সবাই' ?

—মাইতি উঠে দাঁড়ান—ধর্মাবতার, জেরার পদ্ধতিতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। মাননীয় সহযোগী সাক্ষীকে ধমক খাওয়াচ্ছেন।

বাসুসাহেব ঘুরে দাঁড়ান, 'ধমক' জিনিসটা বেবিফুড নয়। ধমক কেউ খাওয়ায় না, লোকে ধমক খায়। আমার বক্তব্য, সাক্ষী বিশেষজ্ঞের মত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। তিনি মনে মনে একটা পূর্বসিদ্ধান্ত করে রেখেছেন এবং তারই ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন।

বিচারক বলেন, আমি প্রতিবাদীর সঙ্গে একমত। অবজেক্‌শান ওভাররুল্‌ড্‌ ; সাক্ষী প্রশ্নের জবাব দিন।

বাসুসাহেব পুনরায় প্রশ্ন করেন, সাক্ষী কে দিচ্ছে? আপনি না 'সবাই'?

—আমি।

বাসুসাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, আমার Voir dire শেষ হয়েছে। আমার বিশ্বাস মহামান্য আদালত অনুধাবন করেছেন যে সাক্ষী ঘটনাস্থলে কি ঘটেছিল তার একটা মনগড়া চিত্র এঁকেছেন; এবং সেই পূর্বসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন। মহামান্য আদালতকে প্রতিবাদীর অনুরোধ সাক্ষীর সমস্ত সাক্ষ্যই নথী থেকে নাকচ করা হ'ক।

বিচারক বলেন, প্রতিবাদীর এ আবেদন আদালত নামঞ্জুর করছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আদালত জুরিমহোদয়গণকে একথাও জানিয়ে রাখছেন যে ঘটনাস্থলে কি হয়েছিল, না হয়েছিল বলে সাক্ষী যেসব অবান্তর কথা বলেছেন, তা অগ্রাহ্য করতে! আগ্নেয়াস্ত্র ও বুলেটটি সম্বন্ধে যেসব তথ্য তাঁর সাক্ষ্যে পাওয়া যায় শুধু তাই গ্রাহ্য করতে। বাকি অংশ আদালতের নথী থেকে নাকচ করবার আদেশও আমি এই সঙ্গে দিচ্ছি।

বাসুসাহেব প্রশ্ন করেন, ঐ ১নং বুলেটটি ২নং রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিষয়ে সাক্ষীর স্থিরসিদ্ধান্ত সমেত নাকচ হবে?

—নিশ্চয়ই। একথা সাক্ষী জ্ঞানতঃ বলতে পারেন না। সাক্ষী দেখিয়েছেন বুলেটটি '৩৮ ক্যালিবারের, দেখিয়েছেন রিভলভারটিও ঐ বোরের। এর থেকে কি সিদ্ধান্ত হবে তা জুরি-মহোদয়গণ বুঝে নেবেন, সাক্ষী নন!

মাইতি উঠে দাঁড়ান, সবিনয়ে বলেন, আমার মনে হচ্ছে মাননীয় সহযোগী বড় বেশী টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী তৎক্ষণাৎ বলেন, কিন্তু আদালত মনে করেন, ব্যালাসটিক্ এক্সপার্ট বড় কম টেক্‌নিক্যাল হয়ে পড়েছিলেন। আদালতের রুলিং বহাল থাকবে।

মাইতির মুখ লাল হয়ে ওঠে। আত্মসম্বরণ করে তিনি বলেন, আমি মনে করি মহামান্য আদালত এভাবে সাক্ষীর বিধিবদ্ধ সাক্ষ্য নাকচ করতে পারেন না এবং আদালতে আলোচ্য অংশের কতটুকু জুরিমহোদয়গণ গ্রহণ করবেন, সে বিবেচনাতে হস্তক্ষেপ করাও আদালতের অধিকার বহির্ভূত।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলেন, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, লুক হিয়ার মিস্টার প্রসিকিউটার আমি সময় সংক্ষেপ করতে চাইছি মাত্র। আদালতের অধিকার সম্বন্ধে যদি আপনার মনে কোন

সংশয় থেকে থাকে তাহলে প্রতিবাদীপক্ষ যে আবেদন করেছেন তা মঞ্জুর করতে আমি বাধ্য হব, এবং এই সাক্ষীর সমস্ত সাক্ষ্যই বিধি বহির্ভূত বলে নাকচ করে দেব। স্পষ্টতই সাক্ষী একটি পূর্বসিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মাইতি জবাব দেন না।

বিচারক বলেন, যেহেতু Voir dire শেষ হয়েছে, সুতরাং আপনি সাক্ষীকে সওয়াল করতে পারেন।

—আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই, বলে স্পষ্টত আহত হয়ে আসন গ্রহণ করেন মাইতি-সাহেব।

এরপর বাদীপক্ষ কন্‌স্ট্রাকসন এঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদার কিশোর ডালমিয়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তা থেকে জানা যায়, আসামীর নাম কৌশিক মিত্র সে শিবপুরের গ্র্যাজুয়েট এঞ্জিনিয়ার। যে নাটকীয় পরিস্থিতিতে এঞ্জিনিয়ার সুব্রত রায়-চৌধুরীর বাড়িতে দীর্ঘদিন পরে সে বন্ধুর সাক্ষাত পায়, সুজাতা যেভাবে তাকে হঠাৎ হাজির করে সব কথাই কিশোর জানালো। তারপর আগরওয়াল ইণ্ডস্ট্রীসের কেশিয়ারের সাক্ষ্যে প্রমাণ হল আসামী বিশ্বনাথ দাসের ছদ্মনামে এখানে কেমন করে চাকরি করেছে। একমাসের মাহিনাও সে গ্রহণ করেছে রেভিনিউ টিকিটের উপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে বিশ্বনাথ দাসের নাম সই করে।

বাসুসাহেব ওদের দুজনের কাউকেই কোন জেরা করলেন না।

বিরতির সময় হয়ে এসেছিল। তবু জজ সাহেবের অনুমতি ক্রমে মাইতি তাঁর পরবর্তী সাক্ষীকে তলব করলেন। করিডোরে উচ্চৈস্বরে ঘোষিত হল —নকুল হুই, হাজির?

অনতিবিলম্বে সাক্ষী নকুল হুই সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ায়। তার পরনে একটি গলাবন্ধ কোট চোখে চশমা, গলায় কম্ফাটার। সাক্ষীর শপথ নেওয়া হতেই একজন অল্প বয়সী উকিল এগিয়ে এসে বলে, মহামান্য আদালতকে আমার নিবেদন, আমি শ্রীগণপতি জানা, সাক্ষীর তরফে আমি উকিল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি।

ওকালতনামার কপি সে আদালতে দাখিল করে।

মাইতি তাঁর সওয়ালের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নকুল হুইয়ের নাম ধাম, পরিচয় ইত্যাদি প্রথানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে প্রশ্ন করেন, গত সাতই নভেম্বর রাত্রি নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার ভিতর আপনি কোথায় ছিলেন?

—অবজেকশান য়োর অনার! তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায় গণপতি জানা। বলে, মাননীয় সহযোগীর প্রশ্ন অবৈধ। রাত্রি নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার ভিতর একটা লোক একাধিক স্থানে থাকতে পারে। 'কোথায় কোথায় ছিলেন' জিজ্ঞাসা করেন নি উনি, প্রশ্ন করেছেন 'কোথায় ছিলেন!'

—আপত্তি গ্রাহ্য হল।

মাইতি হেসে বলেন, গত সাতই নভেম্বর সন্ধ্যার পর আপনি আপনার নিয়োগকর্তার আদেশে বাগানবাড়ী থেকে এক বোতল মদ কিনতে শহরে আসেন, এ কথা কি সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি মদের বোতল কিনে নিয়ে আবার বাগানবাড়িতে যখন ফিরে যান তখন কত রাত্রি?

—আমি ঠিক নয়টা বারো মিনিটে বাগানবাড়িতে ফিরে যাই।

—রাত ঠিক নয়টা বারো মিনিট তা কেমন করে জানলেন?

—আজ্ঞে আমার সাইকেলটা পাঙ্কার হয়ে যাওয়ায় ফিরতে বেশ দেরী হয়েছিল। আমার মালিক ছিলেন রাগি মানুষ, তাই কত দেরী হয়েছে দেখবার জন্য সাইকেল থেকে নেমেই আমি ঘড়ি দেখি।

—তারপর কি হল বলে যান।

—সাইকেলটা গাছের গায়ে রাখতে গিয়ে দেখি সেখানে আর একখানা সাইকেল রয়েছে। কার তা জানবার জন্য আমি চৌকিদার কাদের আলির ঘরের দিকে যাই। কিন্তু অতদূর পৌছানোর আগেই বাঙলোর দিক থেকে সুজাতা দেবী চিৎকার করে ওঠেন। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। পিছন ফিরে দেখতে পেলাম আসামী বিশ্বনাথ দাস, ওরফে কৌশিক মিত্র একটা রিভলভার আমার মালিকের দিকে উদ্যত করে তুলেছে, আর মালিক ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছেন। তখনই বুঝতে পারলাম ঐ নৃশংস দৃশ্য দেখেই সুজাতা দেবী চিৎকার করে উঠেছিলেন—

—আপনি কি বুঝতে পারলেন তা আমরা শুনতে চাই না, আপনি কি দেখলেন, কি শুনলেন শুধু তাই বলুন।

—আমি দেখলাম হুজুর, প্রাণভয়ে আগরওয়াল সাহেব ঘর ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছেন, কিন্তু তিনি চৌকাঠ পর্যন্ত পৌছাবার আগেই শুনলাম একটা গর্জন। মালিক চৌকাঠের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন—

—লায়ার !

সমস্ত আদালত চমকে ওঠে এ গর্জনে। সকলের দৃষ্টি চলে যায় আসামীর কাঠগড়ার দিকে। আসামী কাঠগড়ার কাঠখানা দুহাতে চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। একজন কন্স্টেবল ছুটে এগিয়ে যায় তার দিকে।

আদালতে যে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল তা হয়তো অচিরেই মিলিয়ে যেত, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই সাক্ষীদের কক্ষে একজন মহিলা মূর্ছিতা হয়ে পড়েছেন এ খবর বিদ্যুৎগতিতে প্রচারিত হওয়ায় আদালত কক্ষে কলগুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে চায়। কী ব্যাপার।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, আপনারা যে যার আসনে বসে পড়ুন। একটি মহিলা মূর্ছিতা হয়ে পড়েছেন।

মূর্ছিতা সুজাতাকে ধরাধরি করে দুজন স্বেচ্ছাসেবক আদালত কক্ষ থেকে বার করে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচারক ঘোষণা করলেন—আদালতের বিরতি হল।

॥ একুশ ॥

আদালত থেকে বাইরে এসে অরূপরতন বললে, আপনি আমাদের বাড়িতেই চলুন, আমাদের ওখানেই কিছু বিশ্রাম করে বাড়ি যাবেন। গাড়িতে যেতে মিনিট পাঁচেকও লাগবেনা। বাবাও তাই বলে পাঠিয়েছেন।

—সুজাতা কোথায় ?

—আমাদের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তার জ্ঞান হয়েছে।

—চল তবে।

গাড়িটা আদালতের অনতিদূরে জীমূতবাহন মহাপাত্রের বাড়িরসামনে এসে দাঁড়ায়। গৃহস্বামী এগিয়ে এসে বলেন, আসুন, আসুন।

লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে জীমূতবাহনের বৈঠকখানায় এসে বায়সাহেব দেখতে পেলেন একটা ইজি চেয়ারে অর্ধ মূর্ছিতার মত সুজাতা বসে আছে। বায়সাহেব গাউনটা খুলে একটা সোফার উপর রাখলেন।

—কি খাবেন বলুন? প্রশ্ন করে অরূপরতন।

—খাবার আমার গাড়িতে আছে, ড্রাইভারকে বল।

—সে কি হয়?

—উপায় নেই ভায়া। যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বাঁধা ডায়েটে আছি। তবে কিছু না খাওয়ালে তোমারও হয়তো খারাপ লাগবে। এক কাপ ব্ল্যাক-কফি খাওয়াও। দুধ-চিনি ছাড়া।

জীমূতবাহন হাত দুটি জোড় করে অতি বিনয়ের একটা অভিব্যক্তি করে বলেন, বাসুসাহেব, আমি শুনেছি আদালতে একেবারে শেষ পর্যায়ে নাটকীয় কিছু ঘটেছে। আপনি নিশ্চয় এখন আপনার মক্কেলের সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা বলতে চান। তাই আপনাদের একা রেখে আমি চলে যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না।

জীমূতবাহন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন।

অরূপরতন তৎক্ষণাৎ বলে, বলুন স্যার, এখন কি কর্তব্য? নকুল হঠাৎ একেবারে অন্য সুরে কথা বলছে কেন?

বাসুসাহেব ম্লান হেসে বলেন, তুমি সবে প্র্যাকটিশ শুরু করেছ, আর আমি প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছি! এ বুড়োর অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা শুনবে অরূপ?

—বলুন বলুন?

—এটাই এ জীবিকার ট্রাজেডি!

—কোনটা?

—আমার আটাত্তর বছর বয়স হল। এ জীবনে অসংখ্য ডাক্তারকে আমি বলতে শুনেছি, 'আহা রুগী যদি এই উপসর্গগুলো আমার কাছে গোপন না করত!' অসংখ্য এঞ্জিনিয়ারকে আমি বলতে শুনেছি 'কী দুঃখের কথা, ক্লায়েন্ট যদি ঘুণাক্ষরেও জানাতো যে সে এতটাকা এ বাড়িতে ঢালবে, তাহলে এভাবে প্ল্যানই করতাম না আমি।' আর অসংখ্যবার আদালত থেকে ফিরে এসে নিজের মনে বলেছি, 'আমার মক্কেল যদি প্রথমেই আমাকে আদ্যপ্রান্ত সমস্ত সত্যকথা বলত, তাহলে এ কেস আমি হারতাম না।'

অরূপ কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। আড়চোখে সে একবার সুজাতার দিকে তাকায়। আচ্ছন্নের মত পড়েছিল সে, কিন্তু এর পর সে উঠে বসে। রুক্ষ চুলগুলো চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, আপনি এ অভিযোগ

করতে পারেন। হ্যাঁ, আমি সত্য গোপন করেছিলাম। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম, তা হল না! আপনি কি এরপর আমার কথা শুনবেন, না এখানেই ত্যাগ করবেন আমাকে?

বাসুসাহেব বলেন, এ পর্যন্ত নতুন কথা তুমি কিছুই বলনি সুজাতা। তুমি সত্য গোপন করছ একথা জেনেই তোমার কেস হাতে নিয়েছি। পনের বছর পরে ঐ জামাটা আজ আবার গায়ে চড়িয়েছি। তুমি যদি এখনও সব কথা খুলে বল, আমার খুব সুবিধা হয়। আমি নতুন করে চেষ্টা করতে পারি।

নতুন করে চেষ্টা করার আর কিছু নেই দাদু। যা হবার তা সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করা যাবে না। তবু সব কথাই আপনাকে বলব আমি—

—বল!

—কী ভাবে বল্‌ব বুঝতে পারছি না।

—আমি প্রশ্ন করছি, তুমি উত্তর দিয়ে যাও। কৌশিকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময় আচম্‌কা গুলি ছুটে যায় নি, তাইত?

মুখটা নিচু করে সুজাতা বলে, হ্যাঁ।

—এবং রিভলভারটা মৃত আগরওয়ালের হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল, কৌশিকই দিয়েছে ফিঙ্গার প্রিণ্ট মুছে নিয়ে। ঠিক বলেছি?

—বলছেন। বললে সুজাতা!

কৌশিককে বাঁচাবার জন্যই মিথ্যা এজাহার দিয়েছিলে তুমি, নয়?

এবার মুখ তুলে সুজাতা বলে, না।

—না? তাহলে?

আমাকে বাঁচাবার জন্য কৌশিকই মিথ্যা এজাহার দিয়েছে!

—তার মানে?

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে সুজাতা!

অরূপরতন বলে ওঠে, তার মানে—, তার মানে কি?

মুখ থেকে হাত দুটি সরিয়ে নেয় সুজাতা। স্থির দৃষ্টিতে তাকায় বাসুসাহেবের দিকে। তার চোখ দুটো জ্বলছে। প্রতিটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে হ্যাঁ তাই! কৌশিক নয়, আমিই গুলি করেছিলাম!

কী বলছেন আপনি? উঠে দাঁড়ায় অরূপরতন।

বাসুসাহেব ইজি চেয়ারে এলিয়ে পড়েন। চোখ দুটি বোজা।

মিনিটখানেক কেউ কোন কথা বলে না। তারপর শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বাসুসাহেব বলেন, সময় খুব কম সুজাতা, এখনই গিয়ে নকুলকে ক্রশ-এগজামিন করতে হবে। সংক্ষেপে সব কথা বলে যাও।

—বলার তো আর বাকি নেই কিছু। প্রায় সমস্তটাই আপনাকে ঠিক বলেছিলাম। শেষের দিকে আমার চড় খেয়ে আগরওয়াল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার তখন খেয়াল হয় দরজাটা হাট করে খোলা। দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে সেদিকে এগিয়ে যেতেই আমি টেবিলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তুলে নিই রিভলভারটা। দরজাটা আর সে বন্ধ করতে পারে না। আগরওয়াল চৌকাঠের কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই বলে, ছেলেমানুষী কর না সুজাতা, ওটা লোডেড।

ততক্ষণে আমি যন্ত্রটা উদ্যত করে তুলে ধরেছি। বললাম, দরজা থেকে সরে দাঁড়ান, আমাকে ধরবার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব। আগরওয়াল তখন বলে, তোমার হাত কাঁপছে। তুমি আমায় গুলি করতে পার না, পারবে না। একটা মানুষকে তুমি কিছুতেই খুন করতে পার না, সুজাতা! খুন—ফাঁসি, —তুমি মায়ের জাত!

আমি লক্ষ্য করতে থাকি, কথা বলতে বলতে ময়ূরকেতন পায়ে পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বেশ বুঝতে পারি তার উদ্দেশ্য! তাই চীৎকার করে উঠি—সরে দাঁড়ান, আর এগিয়ে আসবেন না, আমি—আমি কিন্তু এবার গুলি করব!

কিন্তু আমার সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে সে আরও এগিয়ে এল। সত্যই তখন আমার হাত থরথর করে কাঁপছিল। আমার মনে হল, পরমুহূর্তেই সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মরিয়া হয়ে আমি ট্রিগার টিপে দিয়েছিলাম!

দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে সুজাতা! অঝোর ধারায়!

বাসু-সাহেব এগিয়ে আসেন। একটা হাত রাখেন তার মাথার উপর। বলেন, আত্মরক্ষার জন্য তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ সুজাতা! কিন্তু তারপর? তারপর কি হল, বল আমাকে।

অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলে সুজাতা বলে, ট্রিগার টিপবার পরেই আমার বোধহয় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল। প্রচণ্ড শব্দ হল একটা! না, একটা নয় দুটো! আমার আঙুলগুলো এমন থর থর করে কাঁপছিল যে দ্বিতীয়বার আপনা থেকেই ফায়ার হয়ে গেল! আমি সজ্ঞানে দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িনি।

—জাস্ট এ মিনিট। দুবার ফায়ার হয়েছে কেমন করে বুঝলে? মৃতের দেহে তো একটিই আঘাত চিহ্ন পাওয়া গেছে!

দ্বিতীয়বার ফায়ার হতে আমি নিজের কানে শুনলাম। তাছাড়া রিভলবারেও দু-দুটো ডিসচার্জড বুলেট! দ্বিতীয় গুলিটি বোধহয় খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

—বুঝলাম। তারপর?

মিনিটখানেক থরথর ক'রে কেঁপেছিলাম আমি। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি, চৌকাঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আগরওয়াল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরটা। মৃতের দেহের পাশে একটা মদের বোতল নামানো আছে, আর নকুল হুই ঝুঁকে ওঁকে পরীক্ষা করছে।

অরূপ বলে ওঠে, সেকি তখনও কৌশিকবাবু আসেনই নি?

—না, নকুল ওঁকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালো। আমার দিকে ফিরে বললে, একেবারে খুন করে ফেললেন? খুন! আমি মরিয়া হয়ে বললাম, দরজা থেকে সরে দাঁড়ান। না হলে আবার গুলি করব আমি। নকুল উন্মত্তের মত ছুটে এল আমার দিকে; হ্যাঁ, আমি তাকেও গুলি করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার আগেই সে আমার হাত চেপে ধরল!

বাসু সাহেব উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠেন, বলেন—স্ট্রেঞ্জ!

অরূপ সে কথায় কান না দিয়ে বলে, তারপর?

সুজাতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বললে—আমার হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিল সে। আমি দু-হাতে মুখ ঢেকে খাটের উপর বসে পড়লাম। তার পর আমাদের কী কী কথা হয়েছিল ঠিক মনে নেই। আমি একেবারে নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। একবার বোধহয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আগরওয়াল বেঁচে আছে কিনা। ও বলেছিল, না। ঠিক এই সময়েই এসে পড়ে কৌশিক। সেও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। নকুল সমস্ত সত্য ঘটনা কৌশিককে খুলে বলে। কৌশিকই তখন উপায় বাতলায়। বলে, আমার পক্ষে আগরওয়ালের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময় গুলি ছুটে যাওয়ার কাহিনীটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। সেই ঐ মনগড়া কাহিনীটা তৈরী করে। নকুল প্রথমটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় নি। শেষ পর্যন্ত এই সর্তে রাজি হয় যে, তাকে নগদে দশ হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে। স্থির হয় নকুল বলবে যে, সে স্বচক্ষে দেখেছে যে মারামারি হওয়ার সময় রিভলভারটা আগরওয়ালের হাতে ছিল।

এর কিছু পরে কাদেরআলি এসে উপস্থিত হয়। সর্ত অনুযায়ী নকুল তাকেও বলে মারামারির সময় আচমকা গুলি ছুটে যায়। এরপর কাদেরআলি সাইকেলে করে থানায় যায়। পুলিসের সামনেও নকুল সর্ত অনুযায়ীই তার এজাহার দিয়েছিল। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এমন মনগড়া কাহিনী সে কেন বলল, তা আমি বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারিনি।

অরূপ বলে, আমার মনে হয়—

বাধা দিয়ে বাসুসাহেব বলেন, না আর নয়, এবার আমাদের উঠতে হবে। তোমার বাবাকে একবার ডাক তো অরূপ।

জীমূতবাহন এলে বাসুসাহেব বলেন, আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।

—বলুন বলুন।

—আগরওয়ালের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কাল মিউনিসিপ্যালিটিতে যে শোকসভা হয়েছিল, তাতে আপনি সভাপতি ছিলেন, নয়?

—হ্যাঁ।

—টেবিলের উপর আগরওয়ালের যে প্রমাণ-সাইজ ফটোখানা ছিল, ওটা আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিস থেকে আনানো হয়েছিল নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আপনি আজ সন্ধ্যার পর নকুলকে ফোন করে সেই ছবিখানা আর একবার আনিয়ে নেবেন। আমি চেয়েছি তখন তা বলবেন না। এনে ছবিটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন; এবং তারপর নকুলকে আবার ফোন করে জানাবেন যে ছবিটা আমি আপনার কাছে চাওয়াতে ওটা আপনি আমাকে দিয়েছেন; বলবেন, আগামী কাল আদালতে সেটা আমি ফেরত দেব, কেমন?

—হঠাৎ এ অদ্ভুত আদেশ?

—আদেশ নয়, অনুরোধ। আপনি সুজাতাকে স্নেহ করেন, সেই দাবীতে।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

—ধন্যবাদ!

॥ বাইশ ॥

পরদিন আদালত শুরু হতেই অসমাপ্ত সাক্ষ্য দিতে নকুল হুই কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ায়। পাবলিক প্রসিকিউটার সাক্ষীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, পূর্বদিন শপথ নেওয়া আছে বলে তাকে আর নতুন করে শপথ নিতে হচ্ছে না। কিন্তু সে যা এখন বলবে তা সে হলফ নিয়েই বলবে।

নকুল মাথা নেড়ে বলে, বুঝেছি হুজুর, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না।

—বেশ, এখন বলুন, কাল আপনি বলেছিলেন—খোলা দরজা দিয়ে আপনি দেখতে পেলেন যে আসামী বিশ্বনাথ দাস ওরফে কৌশিক মিত্র একটি রিভলভার উদ্যত করে আছে, আর প্রাণভয়ে আগরওয়াল ছুটে পালাচ্ছে; কিন্তু চৌকাঠের কাছে পৌছবার আগেই কৌশিক তাকে গুলিবিদ্ধ করে।

—অবজেকৃসন য়োর অনার। উঠে দাঁড়ায় অরূপ, বলে, সাক্ষী গতকাল এ কথা বলেন নি। আমি অনুরোধ করি গতকাল তাঁর সাক্ষ্যের ঐ অংশটা যেভাবে নথীবদ্ধ হয়েছে তা পড়ে শোনানো হক।

বিচারকের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নথীপত্র দেখে পড়ে যায়:

"প্রশ্ন: আপনি কি বুঝতে পারলেন তা আমরা শুনতে চাই না। আপনি কি দেখলেন, কি শুনলেন তাই বলুন।

'উত্তর: আমি দেখলাম, হুজুর, প্রাণভয়ে আগরওয়ালসাহেব ঘর ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছেন, কিন্তু তিনি চৌকাঠ পর্যন্ত পৌছবার আগেই শুনলাম একটা পিস্তলের গর্জন। মালিক চৌকাঠের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন—"

মাইতি বলেন, ঠিক কথা। আপনি আসামীর হাতের পিস্তলটা গর্জন করে উঠ্‌তে শুনেছেন, সেই সঙ্গে—

—অবজেকৃসন য়োর অনার। আবার উঠে দাঁড়ায় অরূপ। বলে, সাক্ষী বলেছেন 'একটা পিস্তলের গর্জন'; মাননীয় সহযোগী সেটাকে 'আসামীর হাতের পিস্তলের গর্জন' নামে উল্লেখ করে লীডিং কোশ্চেন করছেন।

—অবজেকৃসন সাসটেণ্ড!

মাইতি হেসে বলেন, বেশ, আপনি 'একটা' পিস্তলের গর্জন শুনতে

পেলেন। সেইসঙ্গে কি আসামীর হাতের পিস্তল থেকে আগুন বা ধোঁয়া বের হতে দেখেছিলেন ?

—আজ্ঞে না হুজুর। অতদূর থেকে তা আমি দেখিনি।

—কতদূর হবে সেটা? আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ?

—তা বিশ-পঁচিশ হাত হবে হুজুর।

—ঘরে তখন আলো কি ছিল ?

—পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল।

—তবু আপনি আগুন বা ধোঁয়া দেখেন নি ?

—আজ্ঞে না। যা দেখিনি তা বলব কেন ?

—ঠিকই তো। কৌশিকের রিভলভার থেকে আগরওয়ালের দূরত্ব তখন কতটা হবে ?

—হাত চারেক হবে হুজুর।

—গুলির শব্দটা যখন শোনেন তখন কি আগরওয়াল পিছন ফিরে ছিল ?

—আমার দিকে সমুখ ফিরে ছিল হুজুর, আসামীর দিকে পিছন ফিরে তখন তিনি ছুটে পালাচ্ছিলেন যে।

—আচ্ছা নকুলবাবু, যে কথা আপনি আদালতকে এইমাত্র বললেন, ঠিক এই কথাই কি আপনি তদন্তকারী অফিসার রমেন গুহকে ঘটনার রাত্রে বলেছিলেন ?

—অবজেকসন, য়োর অনার! আসন ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে গণপতি জানা। বলে, তদন্তকারী অফিসার রমেন গুহের সমুখে আমার মক্কেল ঘটনার রাত্রে যে এজাহার দিয়েছিলেন, এ মামলায় তা গ্রাহ্য হতে পারে না। এ প্রশ্ন ইনকম্পিটান্ট, ইরেলিভ্যান্ট এবং ইম্মেটিরিয়াল!

জাষ্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, কেন? তদন্তকারী অফিসার কি সাক্ষীকে সে রাত্রে জানাননি যে তাঁর জবানবন্দী প্রয়োজনবোধে কোন আদালতে এভিডেন্স হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে ?

গণপতি বলে, এ প্রশ্ন আমার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করুন ধর্মাবতার!

নকুল হাত দুটি জোড় করে বলে, না ধর্মাবতার। তিনি সুজাতা দেবীকে এবং আসামীকে ঐ কথা বলেছিলেন, আমার বক্তব্য শোনার আগে সেকথা তিনি বলেন নি।

—কিন্তু আপনার সামনেই তো তিনি ওদের দুজনকে সাবধান করেছিলেন এ থেকে আপনার বোঝা উচিত ছিল, যে আপনার জবানবন্দীও প্রয়োজন বোধে মামলায় ব্যবহৃত হতে পারে।

—মাপ করবেন ধর্মাবতার, তা ঠিক ঘটেনি। দারোগাবাবু সবার আগে আমাকে প্রশ্ন করেন। তারপরে ওদের বলেন, 'আপনারা যা বলবেন, তা প্রয়োজনবোধে আদালতে পেশ করা হবে।' আমাকে উনি কোনভাবেই সাবধান করে দেননি ধর্মাবতার। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

জাস্টিস ভাদুড়ী রুলিং দেন : এ ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তদন্তকারী অফিসারের সাক্ষ্যে অথবা ঘটনাস্থলে উপস্থিত অপর দুজনের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হচ্ছে যে তদন্তকারী অফিসার বর্তমান সাক্ষীকে তাঁর সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে পূর্বেই অবহিত করেছিলেন ততক্ষণ এ প্রশ্ন অবৈধ! অবজেকসন সাস্‌টেইনড!

মাইতি বাসুসাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, অগত্যা এ প্রশ্ন আর এ আদালতে উঠ্‌তে পারে না! আচ্ছা নকুলবাবু, সুজাতাদেবী কি তদন্তকারী অফিসারকে কি ঘটেছিল তা বলতে প্রথমে অস্বীকার করেন?

আবার অরূপ উঠে দাঁড়ায়, অবজেক্‌সান য়োর অনার! এ প্রশ্ন 'হেয়ার সে'। তদন্তকারী অফিসার এবং সুজাতাদেবী উভয়েই আদালতে উপস্থিত। এ প্রশ্নের জবাব তাঁরাই দেবেন।

—অবজেক্‌সান সাস্‌টেইন্‌ড!

মাইতি একটি অভিবাদন করে বলেন, ধর্মাবতার, আদালত যদি অনুমতি করেন, তাহলে এক্ষেত্রে বর্তমান সাক্ষীকে সাময়িকভাবে অপসারণ করে আমি তদন্তকারী অফিসারের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাহলে ঘটনার পারম্পর্য বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

বিচারক বলেন, আদালতের এতে আপত্তি নেই, প্রতিবাদী অবশ্য ইচ্ছা করলে এই পর্যায়ে বর্তমান সাক্ষী এ পর্যন্ত যেসব ডাইরেক্ট এভিডেন্স দিয়েছেন তার উপর জেরা করতে পারেন।

বাসুসাহেব বলে ওঠেন—আমরা বর্তমান সাক্ষীকে বর্তমানে জেরা করছি না। সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষ হলেই আমরা জেরা করব। যদি বাদীপক্ষ বর্তমান সাক্ষীকে পুনরায় না আহ্বান করেন, তাহলেও তাঁকে জেরা করবার অধিকার আমরা মজুত রাখছি।

তদন্তকারী অফিসার রমেন দারোগা অতঃপর সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে শপথ গ্রহণ করেন। নকুল হুইয়ের সঙ্গে তার উকিল গণপতি নিম্নস্বরে কি যেন আলোচনা করতে থাকে। অরূপরতন খবরের কাগজে জড়ানো একখানা প্রকাণ্ড ছবি হাতে এগিয়ে আসে। নকুলের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে কিছু বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই বাসুসাহেব তাকে ধমক দিয়ে ওঠেন, ও কি? ফটোটার কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। আমাকে না বলে ওটা ফেরত দিচ্ছ কেন?

অরূপ ফিরে আসে আবার।

গণপতি বলে, কার ফটো ওখানা?

অরূপ জবাব দেয় না। নকুল নিম্নস্বরে তাকে কি যেন বলে।

এদিকে মাইতি মশাই ততক্ষণে রমেন গুহের পরিচয় ও ঘটনার রাত্রে তার তদন্তের বিষয়ে প্রাথমিক প্রশ্নাদি শেষ করে জিজ্ঞাসা করেন, এ কথা কি ঠিক যে অকুস্থলে কি ঘটেছিল তা জানবার জন্য আপনি উপস্থিত তিনজনের মধ্যে নকুলবাবুকেই প্রথম প্রশ্ন করেন?

—না, তা ঠিক নয়। আমি তিনজনকেই সাধারণ ভাবে প্রশ্ন করি নকুলবাবুই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রথমে জবাব দেন।

—আপনি কি তার পূর্বে তাঁর সাংবিধানিক অধিকারের কথা জানিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর এজাহার আদালতে উত্থাপিত হতে পারে?

—না।

—আসামী এবং সুজাতা দেবীকে সে কথা জানিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আসামী প্রাথমিক এজাহারে কি বলেছিলেন?

—ঠিক যে কথা তিনি থানায় ফিরে এসে লিখিত জবানবন্দীতে বলেছেন।

—সুজাতা দেবী কি বলেন?

—প্রথমতঃ তিনি তাঁর সলিসিটারের উপস্থিতি ছাড়া কোন কথা বলতে অস্বীকার করেন। পরে আসামীর অনুরোধে তিনি নকুলবাবুর স্টেটমেণ্ট করোবরেট করেন।

—নকুলবাবুর স্টেটমেণ্ট না আসামীর?

বাসুসাহেব তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানান, বলেন, সহযোগী লীডিং কোশ্চেন

করেছে, অনর্থাৎ সাক্ষীর মুখে নিজ প্রয়োজন অনুসারে উত্তর বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

—আপত্তি গ্রাহ্য হল।

রমেনবাবু নিজের ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

মাইতি বলেন, সুজাতা দেবী কি বলেন, তাই বলুন।

—সুজাতা দেবী বলেন, কৌশিকবাবু যা বলছেন তা সব সত্যি।

—আচ্ছা মিঃ গুহ, আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন আসামীর জামা কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল, তা আপনি দেখেছেন, কিন্তু আগরওয়ালের পোষাকের কোথাও ছেঁড়া ছিল?

—না।

আগরওয়ালের মাথায় চুল কি অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল? মারামারি করতে গেলে যেমন হওয়া স্বাভাবিক?

—না।

—আসামীর মাথার চুল ঠিক ছিল?

—না, অবিন্যস্ত ছিল।

—ক্রশ এগজামিন, বলে আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসুসাহেব এগিয়ে আসেন, বলেন—মিস্টার গুহ, আপনি কত বছর পুলিসে চাকরি করছেন, এবং কত বছরই বা দারোগাগিরি করছেন?

—আমি ষোলো বছর পুলিসে চাকরি করছি। থানার চার্জে আছি আট বছর।

—একটু আগে আপনি বলেছেন যে সুজাতা দেবী নকুলবাবুর স্টেটমেণ্ট করোবরেট করেন। নকুলবাবু কী স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন?

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে গণপতি জানা: অবজেক্‌সান য়োর অনার! এতে আমি আগেই আপত্তি জানিয়েছি এবং ধর্মাবতার আমার আপত্তি গ্রাহ্য করেছেন।

বাসুসাহেব ঘুরে দাঁড়ান, বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, আমি মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন করবার অধিকার প্রতিবাদীপক্ষ অর্জন করেছেন। সংবিধান যে অধিকার নকুল হুই মশাইকে দিয়েছে তা রক্ষা করবার দায় ছিল সাক্ষী রমেনবাবুর। কিন্তু সাক্ষী ডাইরেক্ট এভিডেন্সে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বলেছেন 'সুজাতা দেবী নকুলবাবুর স্টেটমেণ্ট করোবরেট করেন।' এ সাক্ষ্য

নথীভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং জেরায় এ প্রশ্ন করা চলতে পারে এই আমার বক্তব্য। এ বিষয়ে আদালতের রুলিং প্রার্থনা করছি।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, অবজেক্‌শান ওভাররুল্‌ড্‌!

এবার মাইতি লাফিয়ে ওঠেন, ধর্মাবতার, নকুলবাবুর স্টেটমেন্ট আদালতে পেশ করবার অধিকার সাক্ষীর নেই!

জাস্টিস্ ভাদুড়ী গম্ভীরভাবে বলেন, সে ক্ষেত্রে অমন অসংলগ্ন কথাটা ডাইরেক্ট এভিডেন্সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষীর বলা উচিত ছিল না। সাক্ষী সাধারণ গ্রামের মানুষ নন, তিনি ষোলো বছর পুলিশে চাকরি করছেন, আট বছর দারোগাগিরি করছেন। ডাইরেক্ট এভিডেন্সে যে সাক্ষ্য তিনি দিয়েছেন, জেরায় তার জবাব দিতে তিনি বাধ্য। এতে যদি নকুলবাবুর উকিল মনে করেন সাক্ষী রমেন গুহ নকুলবাবুর সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন তাহলে তিনি সাক্ষীর বিরুদ্ধে পৃথক মামলা আনতে পারেন। কিন্তু সাক্ষীকে জেরার জবাব দিতেই হবে। নাউ আনসার দ্যাট কোশ্চেন!

বাসুসাহেব পুনরায় প্রশ্ন করেন, নকুলবাবু কি এজাহার দিয়েছিলেন?

রমেন গুহ অতঃপর বাধ্য হয়ে বলেন, নকুলবাবু সে রাত্রে বলেছিলেন যে খোলা দরজা দিয়ে তিনি দেখতে পান আসামী কৌশিক মিত্র এবং মৃত আগরওয়াল ধস্তাধস্তি করছেন এবং আচমকা দুজনেই চৌকাঠের উপরে পড়ে যান। তখনই গুলি ছুটে যায়।

—নকুলবাবু কি একথাও বলেননি যে রিভলভারটি মৃত আগরওয়ালের হাতেই বরাবর ছিল?

—হ্যাঁ। তাই বলেছিলেন।

—আচ্ছা রমেনবাবু, সুজাতা দেবী কি আপনাকে একখানি মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স এনে দিয়ে তদন্ত করে দেখতে বলেছিলেন সেটা জাল কিনা?

রমেনবাবু স্বীকার করেন। সুজাতার সঙ্গে থানায় তাঁর যেসব কথা হয় এবং পরে সুজাতার বাড়িতে এসে তিনি যেসব কথা বলেন সবই তাঁর সাক্ষ্যে একে একে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারপর বাসুসাহেব বলেন, একথা কি সত্য যে আসামীর গোঁফ লাগিয়ে, চশমা এঁটে কনভোকেসান গাউন পরিয়ে তাকে কৌশিক মিত্র সাজিয়ে এবং গোঁফ চশমা গাউন খুলে তাকে বিশুদাস সাজিয়ে যে দুটি ফটো তোলা হয় তা আপনি আপনার ক্যামেরায় স্বহস্তে তুলেছিলেন?

আদালত ঘরে মৃদু গুঞ্জন ওঠে।

রমেন গুহের উত্তর শুরু হতেই ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা ফিরে আসে।

—এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে সরকারী গোপন তথ্য, যা নাকি আমি পদাধিকার বলে জানি, তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

—আপনি কি আমার এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেন?

—আমি আমার উপরওয়ালার নির্দেশ ছাড়া ঐ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারি না।

বাসুসাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, বাদীপক্ষ ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের চার্জ এনেছেন। সাক্ষীর উপরওয়ালার কাছ থেকে অনুমতি আনবার ব্যবস্থা করার আর্জি আমি আদালতে পেশ করছি।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী তখন সাক্ষীকে বলেন, কার অনুমতি পেলে আপনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?

—ভিজিলেন্স বিভাগের অফিসার শ্রীসুকুমার গুপ্ত, আই-পি-র।

বিচারক বাসুসাহেবকে আশ্বস্ত করেন, আদালত এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করবেন; আপনি জেরা চালিয়ে যান।

—আমি যদি বলি ঘটনার অন্তত এক পক্ষকাল আগে থেকেই আপনি জানেন যে কৌশিক মিত্র বিশ্বনাথ দাসের জাল লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, সে অভিযোগ আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

—আমি এ বিষয়েও কোন জবাব দেব না ঐ একই কারণে।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, জাস্ট এ মিনিট, আপনি এ অভিযোগ অস্বীকারও করছেন না?

—আজ্ঞে না, এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে পারি না, আমার উপরওয়ালার নির্দেশ ছাড়া।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী চোখ থেকে চশমাটা খুলে বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, দিস্ ইস্ সামথিং স্ট্রেঞ্জ। আপনি কি জেরা চালিয়ে যেতে চান, না যতদিন না এ অনুমতি আনানো যায় ততদিন এ মামলা মুলতুবি রাখতে চান?

বাসুসাহেব একটা অভিবাদন করে বলেন, আমার মক্কেল জামিন পায়নি, সুতরাং মামলা আমি মুলতুবি রাখতে চাইনা। আদালত অনুমতি করলে আমি জেরা চালিয়ে যেতেই চাই।

—দেন প্রসিড!

বাসুসাহেব প্রশ্ন করেন, একথা কি সত্য যে বন্যাত্রাণের জন্য এই শহরে

'অকালবসন্ত' নামে যে নাটক অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল আপনি তার পরিচালক ছিলেন ?

মাইতি এ প্রশ্নে আপত্তি জানান। প্রশ্ন অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক এই অজুহাতে। কিন্তু বাসুসাহেব এ প্রশ্নের উত্তরের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সাক্ষী মেনে নিলেন যে তিনি ঐ নাটকের পরিচালক ছিলেন।

—নাটকটার এক কপি কি সুজাতা দেবী অনুলিপি করে দেন ? এবং সেই কপিটি কি আপনি নকুল হুই মশায়ের কাছে জমা রাখেন ?

—আপনার উভয় প্রশ্নের উত্তরই—হ্যাঁ।

—এইটি কি সেই কপি ?

সাক্ষী পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষা করে সে কথা স্বীকার করেন।

—নাটকের ১০৩ পৃষ্ঠায় লাল কালি চিহ্নিত অংশটুকু আপনি আদালতকে পাঠ করে শোনাবেন কি ?

রমেনবাবু পড়ে যান : পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ হয় না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। তোমরা সুখে থাক এই কামনা জানাইয়া গেলাম। আমার এই মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেছি। ইতি—সুজাতা।"

—এবার আপনি পাণ্ডুলিপিটা পরীক্ষা করে বলবেন কি যে ঐ ১০৩ পৃষ্ঠার হস্তাক্ষর সমস্ত পাণ্ডুলিপিটার অন্যান্য পৃষ্ঠার হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলছে কিনা ?

—আমি হস্তরেখাবিদ নই।

—আমি জানি ; কিন্তু আপনি ষোলো বছর পুলিসে আছেন, আট বছর থানার চার্জে আছেন। আপনার সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—না মিল্‌ছে না।

—ঐ ১০৩নং পৃষ্ঠাটি আঠা দিয়ে বাঁধানো খাতাটায় আটকানো আছে কি ?

—হ্যাঁ।

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

রমেন গুহ সাক্ষীর মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর নকুল হুইকে আবার উঠে দাঁড়াতে হল। মাইতি এবার প্রশ্ন করেন, আপনি বলছেন যে খোলা দরজা

দিয়ে দেখতে পেলেন যে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হয়ে চৌকাঠের উপর পড়ে আছে। তারপর কি হল?

নকুলবাবু বলতে থাকেন, তিনি অকুস্থলে ছুটে যান। প্রথমটা সকলেই হতচকিত হয়ে যায়। তারপর আসামী কৌশিক সাক্ষীর হাতে পায়ে ধরতে থাকে, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য। সুজাতা দেবীও সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে থাকেন। নকুল বিচলিত হয়ে পড়ে। সে ভেবে দেখে যে তার মালিক আগরওয়াল সুজাতা দেবীকে অসৎ-উদ্দেশ্যেই ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে ছিল হুকুমের চাকর, ফলে সে প্রতিবাদ করতে পারেনি। এ জন্যে মনে মনে সে সুজাতা ও কৌশিকের প্রতি একটা করুণা বোধ করেছিল। তাই শেষ পর্যন্ত সে ওদের কথা দেয় যে, সে বলবে ধস্তাধস্তি করার সময় আচমকা গুলি ছুটে যেতে সে স্বচক্ষে দেখেছে। রমেনবাবু তাই যখন ঘটনার রাত্রে তাকে প্রশ্ন করেন, তখন সে ঐ কথাই বলেছিল। কিন্তু পরে তার মনে হয় কাণ্ডটা তার পক্ষে ঠিক হয়নি। মিথ্যা কথা বলা তার স্বভাব নয়। তাই পরদিন সে একজন উকিলের কাছে সব কথা খুলে বলে এবং পরামর্শ চায়। উকিল গণপতি জানা তখন তাকে বলে যে, এভাবে মিথ্যা কথা বলে আইনের উপর তার হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। সুজাতা এবং কৌশিকের উপর তার যত করুণাই হ'ক না কেন, সে মিথ্যা এজাহার দিতে পারে না। ফলে উকিলের পরামর্শ মত সে থানায় আসে এবং নূতন করে এজাহার দেয়।

অরূপ বাসুসাহেবের কানে জনান্তিকে বলে, বেটা এমনভাবে সাক্ষী দিচ্ছে যে জুরিদের অবিশ্বাস করার কিছু থাকবে না। জেরায় যদি কাবু না করা যায়—

বাসুসাহেব হেসে বলেন, ওর সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট মুভ হয়েছে একথা বলা যে সে শুধু গুলির আওয়াজই শুনেছে, পিস্তলের মুখ থেকে আগুন বা ধোঁয়া বার হতে দেখিনি—

অরূপ বলে—সেটা সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে কেন?

—ও একটা পরিবেশ এভাবে সৃষ্টি করেছে যে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না। যেটুকু দেখেছে বা শুনেছে শুধু তাই বলছে। মিথ্যা সাক্ষী দিলে সে অনায়াসে বলতে পারত যে সে আগুন ও ধোঁয়াও দেখেছে!

মাইতি তাঁর সওয়াল শেষ করে বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি এবার জেরা করতে পারেন।

বাসুসাহেব ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বলেন, আচ্ছা ঐ বাগানবাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে শহরে আসতে আপনার কতক্ষণ লাগবে নকুলবাবু ?

—আজ্ঞে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে হুজুর।

—আপনি ময়ূরবাহনের আদেশে ঘটনার রাত্রে এক বোতল মদ কিনতে শহরে এসেছিলেন বলেছেন, কার দোকানে মদ কিনেছিলেন ?

মাইতি উঠে দাঁড়ান, বলেন : অবজেকসান য়োর অনার, এ প্রশ্ন অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক এবং ভিত্তিহীন। ময়ূরবাহন নামে কাউকে আমরা এখনও চিনি না।

অরূপ বাসুসাহেবের কানে কনে বলে, ময়ূরবাহন নয়, ময়ূরকেতন !

বাসুসাহেব হেসে উচ্চকণ্ঠেই বলেন, এইজন্যেই প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছি ! আই বেগ য়োর পার্ডন, ময়ূরকেতনের আদেশে ঘটনার রাত্রে এক বোতল মদ কিনতে শহরে এসে কার দোকানে মদ কিনেছিলেন ?

—লক্ষ্মী সাহার দোকানে হুজুর।

—মদের বোতলটা কিনে সোজা বাগান বাড়িতে ফিরে যান ?

—আজ্ঞে না। দোকান থেকে বেরিয়েই আমার সাইকেলটা পাঙ্কার হয়ে যায়। সাইকেলটা গোকুল বাড়ুইয়ের দোকানে মেরামত করিয়ে নিতে আমার আধঘণ্টাখানেক দেরি হয়েছিল।

—লক্ষ্মী সাহার দোকান থেকে কখন বার হয়েছিলেন ?

—সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে হুজুর।

—আপনি বারে বারেই ঘড়ি দেখেন ?

—আজ্ঞে না। মাঝে মাঝে দেখি। দোকান থেকে বেরিয়েই দেখেছিলাম।

—লক্ষ্মী সাহার দোকান থেকে আপনি ক্যাসমেমো নিয়েছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই আছে, এই দেখুন।

—না দেখবার দরকার নেই। আমি লক্ষ্মী সাহার দোকানে কাউন্টার-ফয়েল আগেই দেখেছি। দিনের শেষবিক্রি আপনার হাতেই হয়েছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, যে ভাউচারটা আপনি পকেটে করে সাক্ষী দিতে এসেছেন কিনা। ভাল কথা, ঐ দিন সন্ধ্যায় মেল ট্রেনটা এ্যাটেণ্ড করতে আপনি স্টেশনে গিয়েছিলেন, তাই নয় ?

—গিয়েছিলাম হুজুর।

—মটোরে স্টেশন থেকে বাগানবাড়িতে যেতে কতক্ষণ লাগার কথা ?

—মিনিট পনের লাগবে।

—খুব জোরে গেলে দশ মিনিট?

—না হুজুর। বার থেকে পনের মিনিট।

—কয়টার সময় স্টেশান থেকে আপনারা রওনা হন?

—তা ঠিক বলতে পারিনা। আমি ঘড়ি দেখিনি।

—ও এবার বুঝি ঘড়িটা দেখেননি? কিন্তু আপনার মনে আছে নিশ্চয় যে স্টেশনে মেল ট্রেনটা আসার পর আপনারা রওনা হয়েছিলেন?

—না হুজুর, তাও ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

—হচ্ছে না? কিন্তু একথাও কি স্মরণ হচ্ছে না যে স্টেশনের গেটে টিকিট কালেক্টার অনাদি দত্ত আপনাকে আটকে বলেছিল, আপনি যে এই মেল ট্রেনে নামেননি তার প্রমাণ কি?

—আজ্ঞে অনাদি দত্ত নামে আমি কাউকে চিনি না।

—নকুলবাবু, এভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমি বল্‌ছি স্টেশান গেটে টি. সি. অনাদি দত্ত আপনাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে আপনি মেল ট্রেনে নেমেছেন, আপনি বিনা টিকিটের যাত্রী। তখন টি. টি. আই সতীশ সামন্ত এবং সুবল বসু আপনাকে জি. আর. পি-তে দেবার পরামর্শ করে। এই সময় আগরওয়াল আপনাকে উদ্ধার করতে আসে। ওর মধ্যে টি. টি. আই সতীশ সামন্ত আগরওয়ালকে চিনতে পারে এবং আগরওয়ালের অনুরোধে আপনাকে ছেড়ে দেয়। আপনি অনাদি দত্ত, সুবল বসু এবং সামন্তকে চেনেন বা না চেনেন এ ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন কি?

—আজ্ঞে না। আমাকে ঐভাবে গেটে আটকেছিল মনে পড়ছে।

—তাহলে মেল ট্রেনটা স্টেশানে আসার পরেই আপনারা বাগানবাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলেন, কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! এবার মনে পড়ছে, সাড়ে ছয়টার মেল ট্রেনটা আসার পরেই আমরা মটোরে বাগানবাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলাম।

—কিন্তু স্টেশন মাস্টার মশাই জানাচ্ছেন ঘটনার দিন মেল ট্রেনটা সত্তর মিনিট লেটে এসেছিল। অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটা আঠাশ মিনিটে সেটা প্ল্যাটফর্মে আসে। এক্ষেত্রে ঘড়ি না দেখেও আপনি কি বলতে পারেন না যে সাড়ে সাতটার আগে আপনারা মটোরে করে রওনা হন নি?

—আজ্ঞে, তাই তো হিসাব দাঁড়াচ্ছে।

—এবং যেহেতু যেতে আপনাদের অন্ততঃ বারো মিনিট লেগেছে তাই ধরা যায় যে সন্ধ্যা সাতটা বেয়াল্লিশ মিনিটের আগে আপনারা বাগানবাড়িতে পৌঁছাননি! কেমন?

—আজ্ঞে তাই হবে।

—যদি ধরা যায় পৌঁছান মাত্রেই আপনি সাইকেলে করে মদ কিনতে আবার শহরে আসেন তাহলে আপনার হিসাব মত রাত আটটা বেজে বারো মিনিটের আগে আপনি লক্ষ্মী সাহার দোকানে কিছুতেই পৌঁছাতে পারেন না। তাই নয়?

—ঐ বারো মিনিট হিসাবে ধর্তব্য নয়। হাজার হোক আমরা আন্দাজে হিসাব করছি।

—তা করছি। কিন্তু পৌঁছানো মাত্রেই তো আপনি রওনা হননি। পৌঁছানোর পর তো অনেক কাণ্ড ঘটেছিল, যার ফলে আপনার চশমা ভেঙ্গে যায়, তাই নয়?

—হুজুর, আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।

বাগানবাড়িতে পৌঁছানোর পরে কোন দুর্ঘটনায় আপনার চশমাটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, একথা কি সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—এবার বলুন, পৌঁছানোর কত পরে আপনি সাইকেলে করে মদ কিনতে আবার রওনা হন?

—তা মিনিট দশেক হবে।

—সে ক্ষেত্রে রাত আটটা বারো মিনিটের আগে আপনি কিছুতেই লক্ষ্মী-সাহার দোকানে পৌঁছাতে পারেন না। ঠিক কিনা?

—তাই হবে বোধ হয়।

—আবার বোধহয় কেন? এ তো অঙ্কের হিসাব।

—আজ্ঞে তাই।

—অথচ আপনি বলেছেন, লক্ষ্মী সাহার দোকান থেকে বেরিয়েই আপনি আপনার ঘড়িতে দেখেন তখন সময় সাতটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট!

—তাই দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে।

—এখন কি মনে হচ্ছে যে ঘড়িটা অন্তত মিনিট কুড়ি লেটে চলছিল?

—তাই বোধহয়।

—এবার বলুন, লক্ষ্মী সাহা, যার আবগারি লাইসেন্সে বলা আছে যে সে রাত আটটার পরে কোন মাদক দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবে না, সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে স্বীকার করবে তো যে সে রাত সাতটা পঞ্চান্নে আপনাকে এক বোতল মদ বিক্রয় করেছিল?

গণপতি লাফিয়ে ওঠে, অবজেকশান য়োর অনার! এ প্রশ্ন অবৈধ! সাক্ষী কেমন করে জানাবেন লক্ষ্মী সাহা কি সাক্ষ্য দেবেন?

—আপত্তি গ্রাহ্য হল।

বাসুসাহেব তখন অন্য প্রশ্ন পেশ করেন: আচ্ছা হুই-মশাই, আপনি বলেছেন যে আপনার মালিক ময়ূরবাহন, আই মীন ময়ূরকেতন প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন আর আসামী একটি রিভলভার তার দিকে উদ্যত করে আছে। এদের দুজনের দূরত্বটা কত হবে?

আজ্ঞে আমি তা আগেই বলেছি, হাত চারেক হবে হুজুর।

—আর আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেখান থেকে আপনার মালিক কি যেন নাম আমার মনে থাকে না, তাঁর দূরত্ব কত হবে?

—তাও আমি আগে বলেছি, বিশ-পঁচিশ হাত দূরে।

—ঘরে তখন আলো কেমন ছিল?

—এসব কথা আগেই হয়ে গেছে হুজুর, পেট্রোম্যাক্সের জোরালো আলো ছিল।

—এই কোর্টঘরে এখন যেমন আলো আছে?

—আজ্ঞে না। এখন তো দিনের বেলা। রাত্রে পেট্রোম্যাক্সের আলোর কি আর এত জোর হয়? তবে দেখতে আমার কোন ভুল হয়নি হুজুর।

—আপনি সিদ্ধান্তে আসবেন না। যা প্রশ্ন করি শুধু তার জবাব দিন। এত আলো ছিল না?

—আজ্ঞে না।

—আপনি আসামীকে স্পষ্ট চিনতে পারলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার মালিক, কি যেন নাম তাঁর, আমার মনে থাকে না, তাঁকেও স্পষ্ট চিনতে পারলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

—আপনার চশমাটা দিন তো ?

—চশমা ? কেন ?

গণপতি ভানা আপত্তি জানায়। বাসুসাহেব তখন বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, ঘটনার রাত্রে সাক্ষীর চোখে চশমা ছিলনা। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। আমি দেখতে চাই, বিনা চশমায় তিনি কতদূর দেখতে পান।

বিচারক বললেন. আপনার চশমাটা ওঁকে দিন।

নকুলের চশমাটা নিয়ে বাসুসাহেব অরূপের হাতে দিলেন এবং তার হাত থেকে কাগজে জড়ানো একখানা বড় বাঁধানো ফটো নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। সেখান থেকে বলেন, আপনি বলেছেন দূরত্ব আন্দাজ বিশ হাত ছিল। এই এতদূর হবে কি ?

—আজ্ঞে না, এর চেয়ে অনেক বেশী।

বেশ, এবার দেখুন তো, এই ছবিটা কার ? নামটা আমার মনে থাকে না, আপনি নিশ্চয় চেনেন এঁকে !

খবরের কাগজের মোড়ক খুলে ছবিটা উনি নকুলের দিকে মেলে ধরেন।

নকুল একটু শ্লেষের সুরে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ চিনি। ময়ূরবাহন নয় হুজুর ছবিটা স্বর্গতঃ ময়ূরকেতন আগরওয়ালের।

—এঁকেই সেদিন চৌকাঠের উপর পড়ে যেতে দেখেছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, যার হাতে সেদিন রিভলভারটা দেখেছিলেন তিনি আসামী নন. তাঁর নাম নাথুরাম গড্‌সে ?

মাইতি সহকারীর সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে কি একটা আলোচনা করছিলেন। এ কথায় হঠাৎ চমকে ছবিটির দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে ওঠেন,— অবজেকসান !

জাষ্টিস ভাদুড়ী এতক্ষণ ছবিটার পিছন দিক দেখতে পাচ্ছিলেন। বাসু-সাহেব ছবিটা এবার উঁচু করে ধরেন। চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখান। বারম্বার হাতুড়ির শব্দ অগ্রাহ্য করে বিচারালয় উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়তে চায়।

—বৃহদায়তন চিত্রটি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর !

—বাসুসাহেব বিচারকের দিকে ফিরে একটি অভিবাদন করে বলেন, মি লর্ড। সাক্ষীর নিজের স্বীকৃতি মত অকুস্থলে এর চেয়ে আলো কম ছিল, এর

চেয়ে দূরত্ব বেশী ছিল। এখন এই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীর উপর জুরিমহোদয়গণ কতটা গুরুত্ব দেবেন সেকথা তাঁদের বিচার্য, কিন্তু—

মাইতি সাহেব তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বলে ওঠেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ধর্মাবতার. যে মাননীয় সহযোগী একটা অত্যন্ত হীন চক্রান্তের সাহায্য নিয়েছেন। প্রবীন আইনজীবীর পক্ষে এ ধরনের 'আনফেয়ার মীনস্' নেওয়া অবিশ্বাস্য! গতকাল রাত্রে তিনি মৃত আগরওয়ালের একখানি ঠিক ঐ সাইজের বাঁধানো ফটো সাক্ষীর কাছ থেকে নিয়ে যান, এবং আজ আদালতে সেটা ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দেন—

—সো হোয়াট? প্রশ্ন করেন সহাস্য বিচারক।

—ধর্মাবতার, উনি প্রশ্নের মাধ্যমে সাজেস্ট করেছেন 'আপনার চেনা লোক, কি যেন নাম আমার মনে থাকেনা' এ থেকে সাক্ষীর মনে হয়েছে যে ছবিটি আগরওয়ালের।

—আপনি কি বলতে চান, মহাত্মা গান্ধী নকুল হুইয়ের অচেনা লোক?

—না, তা ঠিক নয়। মানে, আমি বলতে চাই 'কি যেন নাম মনে থাকেনা' কথাগুলো বারবার ব্যবহার করে সহযোগী একটা ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন, অত্যন্ত আনফেয়ার ভ্রান্তি।

জাস্টিস ভাদুড়ী হেসে বলেন, সে তো বটেই, পি. কে. বাসুর যে কীর্তি কাহিনী আমার জানা আছে তাতে 'ময়ূরকেতন' নামটা তিনি কেন মনে রাখতে পারছেন না, তা আমিও বুঝে উঠ্‌তে পারিনি!

—সাক্ষীও সেই ভুল করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, আগরওয়ালের সেই ছবিটিই তাঁকে দেখানো হচ্ছে। এতদূর থেকে বিনা চশমায় এ ভুল হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় মোটেই—

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, আপনার সহযোগীও তো ঠিক তাই বলছেন, বিনা চশমায় দূর থেকে সাক্ষী ধরে নিয়েছিলেন, যে, তিনি আসামীর হাতেই আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখেছিলেন, এ ভুল হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয় মোটেই—

মাইতি কি জবাব দেবেন ভেবে পান না।

ভাদুড়ী বলেন, প্রসীড উইথ য়োর ক্রশ এগ্‌জামিনেসন্স প্লিজ!

নকুল হুইয়ের চশমাটা ফেরত দিয়ে বাসুসাহেব বলেন, এই নাটকের পাণ্ডুলিপিটা দেখুন তো, এটা কার হাতের লেখা?

নকুল তখনও স্বাভাবিক হতে পারিনি। তার মুখ চোখ লাল হয়ে আছে, কোনক্রমে বলে, সুজাতা দেবীর।

—এইবার ১০৩ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন তো। ওটা কার হাতের লেখা?

—আমার।

—ঐ একটা পাতা আপনি নিজে হাতে লিখেছিলেন কেন?

—পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে ছিল। অসাবধানে ঐ পাতাটায় কালি পড়ে যায়।

—কালি পড়ে যায় মানে? কি ভাবে কালি পড়ে যায়?

—আজ্ঞে ঐ পাতাটা সামনে খোলা ছিল, আমি তখন কলমে কালি ভরছিলাম। হঠাৎ কয়েক ফোঁটা কালি ঐ পাতাটায় পড়ে যায়। তাই ও পাতা আমি নতুন করে লিখি।

—কিন্তু খোলা খাতার পাতায় কালি পড়ে গেলে, তার চিহ্ন তো পরের পাতাগুলোতেও থাকবে। তা নেই কেন?

—খুব অল্প কালি পড়েছিল।

—কালি পড়ার পরেও লেখা পড়া যাচ্ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আপনি ও পাতাটা আবার নতুন করে লিখলেন কেন?

—আমি অপরিষ্কার জিনিস দেখতে পারি না বলে।

—সুজাতা দেবীর হস্তাক্ষরে লেখা সেই পাতাটা কোথায়?

—আমি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

জজ-সাহেব এখানে বাসুসাহেবকে বলেন, আমি কিন্তু ঐ নাটকের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এ মামলার পারম্পর্যটা বুঝতে পারছি না।

বাসুসাহেব একটি 'বাও' করে বলেন, সে দায়িত্ব আমার মিলর্ড! আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এর রেলিভেন্সি যথাসময়ে প্রতিষ্ঠা করব। আমার জেরা শেষ হয়েছে।

এখানেই জজ-সাহেব মধ্যাহ্ন বিরতি ঘোষণা করলেন।

জুনিয়ার উকিলের দল ছুটে এসে ঘিরে ধরে বাসুসাহেবকে। পনের বছর পর বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু একটি কেসে সওয়াল করছেন খবর পেয়ে সমস্ত বার এ্যাসোসিয়েসান ভীড় করে এসেছে এ মামলা দেখতে। একজন উকিল বলে, এ মামলার বনিয়াদটাই আজ ধ্বসিয়ে দিয়েছেন আপনি।

একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য যে কতদূর নির্ভরযোগ্য তা সবাই বুঝে নিয়েছে।

চশমার কাচটা মুছতে মুছতে বাসুসাহেব হেসে বলেন, নকুলই যে একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সে কথা কে বলল আপনাদের? এরপর দেখবেন হয়তো প্রসিকিউসান কাদের আলিকেও হাজির করেছে। সেও হলপ খেয়ে বলবে যে সে স্বচক্ষে দেখেছে হত্যাকাণ্ডটা।

অরূপরতন বলে, সে ভয় নেই স্যার, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, সেই রাত্রি থেকেই কাদেরআলি নিরুদ্দেশ।

—নিরুদ্দেশ? তাকে 'সমন' করা হয়নি?

—না! লোকটার পাত্তাই নেই, সমন জারি করবে কার উপর?

একজন নবীন উকিল বলেন, অনাদি দত্ত, সুবল বসু আর সতীশ সামন্ত কি ডিফেন্স উইটনেস হিসাবে সমন পেয়েছে?

বাসু হেসে বলেন, না ভাই ও তিনটে নামই আমার মনগড়া। আমি সুজাতার কাছে শুনেছিলাম, নকুলকে গেটে কয়েকজন রেল কর্মচারী আটকে বলেছিল 'আপনি এই মেলট্রেনে নামেন নি তার প্রমাণ কি। এবং তারপর আগরওয়াল তাকে উদ্ধার করে আনে।

—কী আশ্চর্য! তাহলে ঐ তিনটে 'ফিকৃটিসাস্' নাম বললেন কেন?

—না হলে নকুল কিছুতেই স্বীকার করত না। তিন তিনটে সাক্ষী আমার হাতে আছে জানার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বীকার করল যে ট্রেন আসার পর তারা মটোরে করে রওনা হয়। তা থেকে প্রমাণ হল ও মদ কিনতে শহরে আসেনি আদৌ! ওর এই সাক্ষ্যের কথা জানার পর লক্ষ্মীসাহা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ঐ মদের বোতলটা সন্ধ্যার পর বিক্রি হয়েছে। তাহলে তাকে স্বীকার করতে হবে রাত আটটার পরে সে মদ বিক্রি করেছে।

আগের দিনের মত এদিনও ওঁরা মধ্যাহ্ন বিরতিতে এসে আশ্রয় নিলেন জীমূতবাহনের ড্রইংরুমে। সুজাতা এবং বাসুসাহেবকে আপ্যায়ন করে বসিয়ে জীমূতবাহন বললেন, বাসু-সাহেব এ কেসে আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমি কিছু কনফেস করতে চাই।

—বলুন।

—কৌশিক মিত্রকে আমিই নিয়োগ করেছিলাম ভিজিলেন্সের সহায়তায়।

আমিই সন্দেহ করেছিলাম, আগরওয়াল সিমেণ্টে গঙ্গামাটির ভেজাল মেশাচ্ছে। একজন দক্ষ এঞ্জিনিয়ারকে তাই গোপনে পাঠিয়ে ছিলাম ব্যাপারটার তদন্ত করতে। আপনি আজ রমেন গুহকে যে প্রশ্ন করেছেন, তা থেকেই বুঝতে পারছি যে আপনি সেটা জানেন। আমি জানাতে চাই যে কৌশিক এ কাজে সাফল্যলাভ করেছিল; কিন্তু আগরওয়ালের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তবু আমি কোন করে ভিজিলেন্স অফিসার মিস্টার সুকুমার গুপ্ত আই. পি. কে আনিয়েছি। সরকারী তথ্যের গোপনীয়তা যতদূর সম্ভব রক্ষা করে তিনি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি অনুমতি করলে মিঃ গুপ্তকে এখানে আনতে পারি।

—সিওর।

অনতিবিলম্বে ভিজিলেন্স অফিসার সুকুমার গুপ্তের সঙ্গে বাসুসাহেবের পরিচয় হয়ে গেল। গুপ্তসাহেব উঠেছেন সার্কিট-হাউসে। প্রয়োজন হলে দু-চারদিন থাকবার জন্তে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। বাসুসাহেব বলেন, প্রয়োজন হবে। বাদীপক্ষের সব সাক্ষী শেষ হলে আপনাকে আমি ডাকব। সম্ভবত কাল। সমন এখনই জারি করব আমি। আজ রাত্রে যদি দয়া করে আমার সঙ্গে ডিনার করেন তবে ঘটনাগুলি জেনে নিতে পারি। ঘোষের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে তো?

—যথেষ্ট আলাপ আছে। আমি আসব। ধরুন রাত আটটা।

গুপ্তসাহেব বিদায় নেবার পর সুজাতা বলে, নকুল হুইয়ের সাক্ষ্য খুব জোরদার হবে না। কিন্তু কাদের আলিকে ওরা লুকিয়ে রেখে তালিম দিচ্ছে না তো?

অরূপ বলে, তা বলা মুশকিল। বাজারে গুজব সে এক্স-কনভিক্ট। সে আত্মগোপন করে আছে।

সুজাতা বলে, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে যে গুলি ছুটে যায়নি তা তো আগেই প্রমাণ হয়েছে! গুলিবিদ্ধ অঙ্গে 'চার্ড' হয়ে যাবার চিহ্ন নেই। তাছাড়া গুলি পিছন থেকে দেহে প্রবেশ করেছে—

অরূপ মাথা নেড়ে বলে—এই 'চার্ড' না হওয়ার প্রসঙ্গটা তোলা আমাদের ভুল হয়েছিল। ও প্রসঙ্গটা না উঠলে হয় তো অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর একটা যুক্তি খাড়া করতে পারতাম। এ থেকে আশঙ্কা হয় একেবারে বেকসুর খালাস করানো যাবে না। অবশ্য ক্যাপিটাল পানিশমেণ্ট হতে পারে না—

আচ্ছন্নের মত সুজাতা বলে—কত দিনের মেয়াদ হবে বলে মনে হয়?

অরূপ বলে আইনে তো বলে—

বাসুসাহেব সামনের দিকে ফিরে বলেন, আমার পরামর্শ শুনবে সুজাতা?

সুজাতা চমকে ওঠে সে কণ্ঠ স্বরে, বলে, বলুন। আপনার পরামর্শই তো শুনছি।

—তুমি আদ্যপ্রান্ত সত্য কথা স্বীকার করে যাও!

অরূপ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, বলে—কী বলছেন আপনি? অসম্ভব!

বাসুসাহেব জানালা দিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দেন। দূরে বহু উঁচুতে একটা নিঃসঙ্গ চিল পাক খাচ্ছে। সূর্য সাক্ষী সেই চিলটার দিকে তাকিয়েই বাসুসাহেব বলেন, আমার মনে হয় সেইটাই সব চেয়ে ভাল হবে এক্ষেত্রে!

অরূপ রাগতভাবে বলে ওঠে, সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে! এখন আর তা কি করে সম্ভব?

—কেন নয়? সুজাতা তো তার এভিডেন্স দেয়নি। যে মুহূর্তে সুজাতা স্বীকার করে নেবে যে সে নিজেই আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছিল সেই মুহূর্তেই এ কেস একেবারে ধ্বসে যাবে।

—তা তো যাবে! কিন্তু সুজাতাই যে তখন নূতন কেসে জড়িয়ে পড়বে? সুজাতাই হবে আসামী।

—তাই চাই আমি। কৌশিকের বিরুদ্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আছে। তার দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আমি অতি নাটকীয়ভাবে আজ যেটা করেছি তার ফলাফল জুরিদের উপর কি হবে তা বলা যায় না। তাঁরা মনে করতে পারেন, হতে পারে বিনা চশমায় নকুল মানুষজন ঠিকমত চিনতে পারেনি। কিন্তু ঘরে তিনজন মাত্র মানুষ ছিল। একজন খুন হল, বাকি দুজনের একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। দৃষ্টিশক্তির বিষয়ে সন্দেহ হলেও সাক্ষী একজন পুরুষমানুষকে পিস্তল হাতে দেখেছিল এটুকু যদি জুরি মেনে নেয় তাহলেই গিল্টি ভার্ডিক্ট হয়ে যাবে। নকুল তার স্বচক্ষে যে ভাবে রিভলভারের আগুন ও ধোঁয়া দেখতে পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছে তাতে সত্যই মনে হয়েছে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না। কিন্তু সুজাতা যদি এখন স্বীকার করে ফাঁকা ঘরে সে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছিল, তাহলে তার কোন সাক্ষী নেই, কোন প্রমাণ নেই! শুধু সুজাতার এজাহারের ভিত্তিতে 'গিল্টি' ভার্ডিক্ট হতে পারে না।

অরূপ বলে—আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।

সুজাতা একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখে, তারপর বাসুসাহেবের দিকে ফিরে শান্তভাবে বলে—আমি রাজি।

—কী বলছ সুজাতা! ধমকে ওঠে অরূপরতন—নিশ্চিত জেল হয়ে যাবে তোমার!

সুজাতা বলে, কিন্তু আমার বদলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ কৌশিক যদি জেল খাটে তাহলেই কি শান্তি পাব আমি?

—সেই কথাটাই ভাবছিলাম আমি! বললেন বাসুসাহেব সুজাতার পিঠে একখানা হাত রাখে।

অরূপ একই সুরে বলে, সেন্টিমেন্টালিটির জায়গা আদালত নয়। তুমি ইমোসানের বশবর্তী হয়ে এ প্রস্তাবে রাজি হচ্ছ!

—আমি তো তা অস্বীকার করছি না অরূপবাবু। আমার বদলে কৌশিক জেল খাটলে আপনার কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমার যায় আসে।

—জানি! তুমি কৌশিককে ভালবাস! একথা তুমি অস্বীকার কর?

—অস্বীকার করব কেন? আমি তো এও জানি যে, আপনি আমাকে ভালবাসেন। আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

—না আমি অস্বীকার করিনা। সো হোয়াট?

—তাই কি 'জেলাস্' হয়ে আপনি বাধা দিচ্ছেন?

অরূপ উঠে দাঁড়ায়, বলে, এরপর এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তাছাড়া বাসুসাহেব সিনিয়ার। তাঁর মতের সঙ্গেও আমি একমত নই। ফলে আমাকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। এ কেসে আমি আর অংশগ্রহণ করব না।

সুজাতা বলে—কিসের থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন অরূপবাবু?

আপনার মক্কেল কে? কার স্বার্থ আপনার দেখবার কথা? আমার? আপনার মক্কেল তো আসামী কৌশিক মিত্র! তার তরফে আমি আপনাকে উকিল হিসাবে নিয়োগ করেছি:

—বিনা পারিশ্রমিকে! বলে অরূপ তিক্ত স্বরে!

—না বিনা পারিশ্রমিকে নয়। আপনি ফি নিতে অস্বীকার করেছিলেন, বলেছিলেন, সে সব কথা পরে হবে, আগে কৌশিকবাবুকে ছাড়িয়ে তো আনি!

যাক্ আপনার যদি মনে হয় এরপর আপনি এ কেসে অংশগ্রহণ করতে অপারক তাহলে তাই হবে। যে কদিন কোর্ট এ্যাটেণ্ড করেছেন তার বিল পাঠিয়ে দেবেন!

বাসুসাহেব বলেন, আহা এসব কথা উঠ্‌ছে কেন? শোন—

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অরূপ বেগে বেরিয়ে যায়—

॥ তেইশ ॥

ডিনার টেবিলে নৈশ আহারে বসেছিলেন সকলে।

ঘোষ সাহেবের বাড়িতে এই একটি সময় যখন সকলে এক হয়ে নিশ্চিন্তে দুটো গল্প করতে পারেন। মধ্যাহ্নে সকলের একসঙ্গে আহার হয় না। ঘোষ সাহেব সকালেই দুটো নাকে মুখে গুঁজে ছোটেন, কখনও অফিস থেকে আর্দালিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন হট-কেসে খাবার নিয়ে আসতে। কাজের চাপ কম থাকলে মধ্যাহ্নে মাঝে মধ্যে বাড়ি এসেও আহারাদি সারেন। মেয়ে প্রণতি সাড়ে নয়টার মধ্যে খেয়ে কলেজে ছোটে। আর মিসেস্ ঘোষের খাওয়ার তো কোন সময়ই নেই। তাই নৈশ আহারের এই পরিবেশে সারাদিনের ঘরোয়া কথার রোমন্থন হয়। প্রণতির ক্লাশে প্রক্সি দিতে গিয়ে কোন মেয়ে ধরা পড়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে কী জাতীয় হাস্যকর বেনামী দরখাস্ত এসেছে অথবা মিসেস্ ঘোষের বাগানে নূতন ফুলের চারাগুলো কিভাবে ছাগলের পেটে গেছে তার আলোচনায় আর কোন বাধা থাকে না। কখনও বা বাসুসাহেব তাঁর বিস্মৃতপ্রায় ব্যারিস্টারী জীবনের জটিল কেসের অবতারণা করেন। সেদিন ডিনার টেবিল থেকে উঠতে ওঁদের রাত হয়ে যায়। অজানা অচেনা আসামীর ভাগ্য দুলতে থাকে সওয়াল-জবাবের সরু সুতোয়। বাসুসাহেবের কাহিনীর সমাপ্তি হত নাটকীয় ভাবে। উপকথার গল্পের শেষে যেমন নটেগাছটির মৃত্যুসংবাদ অবধারিতভাবে এসে পড়ে, বাসুসাহেবও তেমনি গল্পের শেষে বলতেন, এরপর জুরিমহোদয়গণ পাশের ঘরে উঠে গেলেন। নাউ, আজ ছোট খুকি বলবে, বলেই মণিব্যাগ থেকে একটা নোট বার করে গ্লাস চাপা দিয়ে বলেন, বল ছোটখুকি, কী ভার্ডিক্ট হল? গিল্‌টি না নট-গিল্‌টি?

উত্তর সন্তোষজনক হলে বাসুসাহেব হেসে বলতেন—রাইট! তুমিই বাজি জিতেছ। এ নোটটা তোমার। তারপর মিসেস্ ঘোষের দিকে বলতেন মেয়েকে তুমি সায়েন্স পড়ালে খুকি, ওকে আইন পড়ানো উচিত ছিল।

আর উত্তর ভুল হলেই নোটখানা টেনে নিয়ে বলতেন, মেয়েটার মাথায় গোবর!

আজ আর সেসব কিছু হল না। আজ একজন বিশিষ্ট অতিথিও উপস্থিত ছিলেন খাবার টেবিলে। মিস্টার সুকুমার গুপ্ত আই-পি।

কথা প্রসঙ্গে ঘোষসাহেব বলেন, এটা কিন্তু আপনি ঠিক করলেন না, দাদু! আপনার এক মক্কেল বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু আর এক মক্কেল তার স্থলাভিষিক্ত হল!

বাসুসাহেব স্যুপের বৌলটা টেনে নিয়ে বলেন, মক্কেলকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলাই আমার উচিত ছিল বল্‌তে চাও?

—মিথ্যা ঠিক নয়, তবে—

—সত্য গোপন? হেসে পাদ পূরণ করেন বাসুসাহেব।

তা কি জীবনে কখনও করেননি আপনার ব্যারিস্টারী জীবনে?

প্রতি প্রশ্ন করেন এবার সুকুমার গুপ্ত।

—না! সত্য গোপন করিনি গুপ্তসাহেব। তথ্য গোপন করেছি। এবং তাও করেছি শুধু একটি উদ্দেশ্যকে—সত্যকে প্রকাশ করতে! জবাব দিলেন বৃদ্ধ।

ঠিক বুঝলাম না।

—সত্য জিনিসটি এমন বিরাট আর ব্যাপক যে আপনাদের তৈরী পিনাল কোডের ধারায় সে সব সময় আবদ্ধ হয় না। এ যেন জাল দিয়ে সূর্যের আলোক ধরবার চেষ্টা! কিম্বা বলতে পারেন আইনের ক্যামেরায় মধ্যাহ্ন সূর্যের ফটো তোলার চেষ্টা! আলো ছাড়া আলোকচিত্র হয় না। কিন্তু নেগটিভে আলো লাগলে সব সাদা হয়ে যায়। আইনও তেমনি সত্যকে ছাড়া বাঁচেনা; কিন্তু প্রখর সত্যের মধ্যাহ্ন তেজে আইনের ধারাগুলো অনেক সময় অকেজো হয়ে যায়! তাই তথ্যের ছাতাটা ইচ্ছামত বাঁকিয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয় আইনের লেন্সে যেন সরাসরি সত্যের প্রখর আলো না পড়ে। জীবনে তাই অনেকবার তথ্যকে সাজিয়েছি, বানিয়েছি, লুকিয়েছি,—ছায়া ফেলে যেমন আলোক ফোটায় চিত্রকর, তেমনি করে

বিকৃতি তথ্যের সাহায্যে সত্যকে প্রকট করেছি! একটা কথা বলতে পারি, যে মক্কেলের কাহিনী শুনে মনে হয়েছে সে নিরপরাধ নয়, তার কেস আমি হাতে নিতাম না!

মিসেস্ ঘোষ বলেন, আজ কোর্টে কি হল তাই বলুন!

—আজ সুজাতা তার এভিডেন্সে স্বীকার করে নিল যে, আত্মরক্ষার্থে সে নিজেই গুলি করেছে, আর তাঁকে বাঁচাবার জন্যই কৌশিক মিথ্যা এজাহার দিয়েছে, এবং সেই জন্যই সে তদন্তকারী অফিসারের কাছে প্রথমটায় কিছু বলতে চায়নি।

—বলেন কি! তারপর?

কোর্ট এ্যাডজর্ণড হয়ে গেল। মামলা ডিস্‌মিস হয়নি, মুলতুবি হল। কিন্তু আমার আবেদনে কৌশিককে 'বেল' দেওয়া হয়েছে। জাস্টিস্ ভাদুড়ী সু-মোটো অর্ডার দিয়ে আদালতের ভিতরই সুজাতাকে গ্রেপ্তার করালেন, এবং যতদিন না চার্জ তৈরী হচ্ছে ততদিন তাকে জেল-হাজতে রাখবার আদেশ দিলেন। কাল সকালে সুজাতাকে আবার একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এজাহার দিতে হবে।

প্রণতি আর নিজেকে সামলাতে পারে না বলে—আপনি সুজাতাদিকে বলেছিলেন এ-কথা স্বীকার করে নিতে?

—হ্যাঁ তাই বলেছিলাম। কারণ এই হচ্ছে ট্রুথ, দ্য হোল ট্রুথ এ্যাণ্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ!

সুকুমার গুপ্ত মাথা নেড়ে বলেন, মাপ করবেন বাসুসাহেব, আমারও মনে হচ্ছে না আপনি ঠিক করলেন।

বাসু হেসে বলেন—দাউ টু ব্রুটাস?

—তার মানে?

—তার মানে, আমার তো ধারণা ছিল কাশীবাসী জগদানন্দ মিত্র ছাড়া আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে এতে খুশী হবে। আপনি চেয়েছিলেন কৌশিক মিত্র এ মামলা থেকে বেকসুর হয়ে বেরিয়ে আসুক। সুজাতাকে আপনি চিনতেন না; কিন্তু কৌশিকের কোন সাজা হলে আপনার মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে থাকত। তাই নয়?

গুপ্তসাহেব বাঁহাতের কর্কটার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি ঠিকই বলছেন, কৌশিকের কোন সাজা হলে আমি অত্যন্ত আহত হতাম। ছেলেটা হাণ্ড্রেড

পার্সেন্ট অনেস্ট! এ কেসে তার জড়িয়ে পড়ার পিছনে আমারও হাত ছিল। পরোক্ষভাবে আমিও দায়ী, কিন্তু সে কথা যাক। আপনি কিন্তু একটা কথা ভুল বলেছেন। কৌশিক বেরিয়ে আসায় আমি এবং তার বাবা ছাড়া আরও একটি লোক আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। সেও অত্যন্ত খুশী হয়েছে।

—জানি! কিশোর ডালমিয়া! তাই নয়?

—আপনি কেমন করে জানলেন?

—ছেলেটি আমার কাছেও এসেছিল। বললে, আমি স্যার পুলিশের সমন্ পেয়েছি, সাক্ষী দেব। আপনি জেরায় আমাকে যা বলতে বলবেন, আমি তাই বলতেই রাজি আছি। আপনি আমার মুখ দিয়ে যা খুশী বলিয়ে নিন। কৌশিককে বাঁচাতেই হবে।

প্রণতি বলে, কিশোর ডালমিয়া কে দাদু?

—কৌশিকের ক্লাস ফ্রেণ্ড। বড়লোকের ছেলে। বড় অদ্ভুত ছেলে, তার সঙ্গেও আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল—ঐ তথ্য আর সত্য নিয়ে—

—তাই নাকি? শুনি ব্যাপারটা।

বাসুসাহেব তখন বলতে থাকেন কিশোর ডালমিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত-কারের কথা।

কিশোর তার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, প্রয়োজনে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও রাজি আছে, সর্ত শুধু একটি, কৌশিককে বাঁচাতে হবে।

বাসুসাহেব প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি মনে কর কৌশিক এ অপরাধ করেনি? সে মানুষ খুন করতে পারে না?

কিশোর বলেছিল—না স্যার তা আমি বলছি না। কৌশিক একটা হীরের টুকরো ছেলে! সে যদি গুলি করে আগরওয়ালকে হত্যা করে থাকে তবে আমি নিশ্চিন্ত যে সেজন্য যথেষ্ট 'প্রভোকেসন' ছিল! আমি বিশ্বাস করি আজকের ভারতবর্ষে একশটা আগরওয়ালের মতো ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারের বদলে একটা কৌশিক মিত্রের বেঁচে থাকা দরকার!

বাসুসাহেব বলেন, কিন্তু দেশের আইন তো সে কথা বলে না!

কিশোর বলেছিল, আইন নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার শোভা পায়না; কিন্তু যে আইনে আপনারা শেয়ালদ' আর হাওড়া স্টেশান থেকে ঝাঁক বেঁধে উদ্বাস্তু বিধবা বুড়ির দলকে ধরে আনেন তাদের কোঁচড়ে চালের

পুঁটুলি বাঁধা আছে বলে, এবং যে আইনের বলে ময়ূরকেতন আগরওয়ালের গঙ্গামাটির ভেজালের তদন্তটা আপনারা চাপা দিতে পারেন, সে আইনকে ঠিক অতটা শ্রদ্ধা করিনা আমি।

বাসুসাহেব বলেছিলেন, সেটা কি আইনের অপরাধ না আইন প্রয়োগ-কারীর অপরাধ ?

—তা আমি জানিনা, তবে এটুকু জানি যে আইনের বেড়াজালে আপনারা আমাদের বেঁধে ফেলেছেন। আমার এক বন্ধু আইনকে অস্বীকার করে ডাকাতি কেসে আজ জেল খাটছে, আর এক বন্ধু আইনকে স্বীকার করে আত্মহত্যা করেছে। আমাদের একমাত্র অপরাধ আমরা প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশক্রমে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দেশের কারিগরী কাজ জানা মানুষের অভাব মেটাতে চেয়েছিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশের ঘরে ঝন্‌ঝনিয়ে টেলিফোনটা বেজে উঠ্‌ল।

একজন চাপরাশি ছুটে গেল, একটু পরে ফিরে এসে বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে—থানা থেকে বড় দারোগা আপনাকে ফোন করেছেন।

বাসুসাহেব ধীরে সুস্থে উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন : বাসু স্পিকিং।

এ-প্রান্তবাসী কি বলছে তা শুনতে পেলেন না এঁরা। ব্যারিস্টার সাহেব অনেকক্ষণ ওপক্ষের কথা শুনে শেষে বললেন,-না, রাত হ'ক, আজ রাত্রেই আমি শুনতে চাই। আমি যাব ?···থ্যাংস, বেশ তুমিই এস, আমি অপেক্ষা করছি।

বাসুসাহেব ফিরে এলেন।

ঘোষসাহেব বলেন, কি বলছিল রমেন ?

—কাদের আলি ধরা পড়েছে। সে অনেক কথা বল্‌ছে। তাকে নিয়ে আসতে বললাম।

—অনেক কথা কি বলছে ?

বাসুসাহেব মুচ্‌কি হেসে বলেন, সেটা আমার 'সিক্রেট'! তুমি জেলা-ম্যাজিস্টেট, প্রসিকিউসানের লোক, তুমি তো আমার বিপক্ষ শিবিরের লোক।

ঘোষ হেসে বলেন, কিন্তু থানার দারোগা কি আমার লোক নয় ?

—হতে পারে! সে যদি অযাচিত আমাকেই ফোন করে আমি কি করতে পারি ? ঘোষ, তুমি এক কাজ কর, টেলিফোন করে কাল সকালে আটটায়

সময় পি. পি মিস্টার মাইতিকে আসতে বল। রমেন গুহকেও আসতে বল, আমার বলাটা ভালো দেখাবে না। নকুল হুই আর গণপতি জানাকেও যেন রমেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

—এতগুলি লোককে ডেকে এনে কি হবে?

—সুজাতার বিরুদ্ধে নূতন করে চার্জ ফ্রেম করতে হবে তো? তার আগে আমি এ-কেসটা বিশ্লেষণ করতে চাই। আমি কতকগুলি সত্য, মাইণ্ড য়ু তথ্য নয়, সত্য আবিষ্কার করেছি, যা-নাকি তোমার থানা অফিসারের নজরে পড়েনি। সেগুলো আমি তোমাদের সামনে রাখতে চাই। কিন্তু তোমাদের সরকারী মেসিনারিতে আমার কোন স্থান নেই। তাই আমি তোমার সাহায্য চাইছি—

বাধা দিয়ে ঘোষসাহেব বলেন, বেশ তো, আমি না হয় এখনই তাদের নিমন্ত্রণ করে রাখছি। উঠে যান ঘোষসাহেব।

॥ চব্বিশ ॥

পরদিন যথানিয়মে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাসুসাহেব তাঁর সেই সিট্রন গাড়ি চালিয়ে ম্যাজিস্টেট সাহেবের বাঙলোতে যখন ফিরে আসছিলেন তখনও আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসের কারখানায় সকাল সাতটার ভোঁ বাজেনি। সকাল আটটায় শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমন্ত্রণটা জানানো হয়েছে। নিমন্ত্রণকর্তা অবশ্য তিনি নন, ঘোষসাহেব—কিন্তু দায়িত্বটা তাঁর। গতকাল রাত্রে রমেন দারোগা যেসব তথ্য তাঁর কাছে পেশ করেছে, তারপর সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পেয়েছেন। তবু সারারাত তাঁর ঘুম হয়নি। যুক্তির পারম্পর্যে একে একে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন সমগ্র সমস্যাটা। বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ করেছেন। বিচার বিশ্লেষণের যে পথেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন সে পথই গিয়ে থেমেছে একটি নিরেট দেওয়ালের সামনে। যতগুলি ক্লু পেয়েছেন কার্য-কারণের সূত্রে সেগুলিকে এতদিন যুক্তিনির্ভর পারম্পর্যে গাঁথতে পারেন নি। কৌশিক ছেলেটির যে পরিচয় বিভিন্ন সূত্রে পেয়েছেন তাতে মনে হয়েছিল সে ক্রিমিনাল-টাইপ নয়। উত্তেজনার মুহূর্তে যথেষ্ট 'প্রভোকেশন' থাকলে সে হয়তো গুলি ছুঁড়তে

পারে, কিন্তু সেটা কি এই ভাবে লুকোবার চেষ্টা সে করত? অপরপক্ষে ময়ূরকেতন আগরওয়াল লোকটা একটা 'বর্ন-ক্রিমিনাল'! সেই বা ওভাবে রিভলভারটা টেবিলের উপর লোডেড অবস্থায় ফেলে রেখে বারে বারে উঠে যাচ্ছিল কেন? ধস্তাধস্তি করার সময় আচম্‌কা গুলি ছুটে যাওয়ার থিওরিটা টেকেনি। সেক্ষেত্রে মৃতের পিঠের দিকে গুলি লাগার কোন যুক্তি থাকে না। একমাত্র সম্ভাবনা হতে পারত এই যে, চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে ওরা যখন পড়ে যায় তখন আগ্নেয়াস্ত্রটা আগরওয়ালের হস্তচ্যুত হয় এবং পতন জনিত আঘাতে রিভলভার থেকে গুলি ছুটে এসে আগরওয়ালকে বিদ্ধ করে। এটা প্রমাণ করতে পারলে মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করা চল্‌ত না। অরূপরতন চেয়েছিল এই থিয়োরিটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে যাঁর জীবন কেটেছে সেই প্রসন্নকুমার যে এই থিয়োরিটাকে অবলম্বন করে প্রসন্ন হতে পারেন নি। তিনি যে জানতেন, ও জাতীয় দুর্ঘটনায় মৃতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত হওয়ার সমস্যাটার সমাধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে ক্ষেত্রে মৃতের চামড়ায় দাহ-চিহ্ন থাকার কথা। গরম কোটের পিঠের দিকে যে অংশে ফুটো হয়েছে সেখানে বারুদের চিহ্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ার কথা। সে সব পাওয়া যায় নি। কিন্তু এ সব আপত্তি বাদীপক্ষ তোলেন নি; আদৌ তুলতেন কিনা তা জানা যায় না, এ আপত্তি তুলেছিলেন স্বয়ং প্রসন্নকুমার বাসু! আচ্ছা এ প্রশ্নটা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে উত্থাপন করা কি মূর্খামি হয়েছে তাঁর? অরূপরতন তাই মনে করে। নিঃসন্দেহে এভাবে তিনি তাঁর মক্কেলের ক্ষতি করেছেন। এই চিন্তাটাই তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল গতকাল রাত্রে। ঘটনাচক্রে একে একে অনেকগুলি তথ্য তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তিনি নূতন নূতন সূত্রের সন্ধান করেছেন এবং অপরাধ-বিজ্ঞানীর যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণে আজ তিনি বুঝতে পেরেছেন প্রকৃত সত্য কি। সেটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন মাত্র গতকাল রাত্রে, রমেন গুহর টেলিফোন পাবার পর। যখন তিনি ঘোষসাহেবকে বললেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে। আগরওয়াল কেমন করে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল এখন তিনি তা বুঝতে পেরেছেন, সেটার সন্দেহাতীত প্রমাণ দিতে পারবেন কিনা এখনও বলতে পারছেন না, সেটা নির্ভর করছে আজকে তিনি যেভাবে আলোচনাটাকে পরিচালিত করতে পারবেন, তার সাফল্যের উপর। কিন্তু সে জন্য তো নয়, ওঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে অন্য একটি কারণে।

প্রশ্নটা এ হত্যামামলা সংক্রান্ত নয়, ক্রিমিনাল ল' ইয়ারের প্রফেসনাল এথিক্স নিয়ে।

বিচারের একেবারে প্রথম পর্যায়ে, বস্তুত প্রথম সাক্ষীর জেরার সময়ে তিনি তাঁর মক্কেলের উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথটা নিজে হাতে চিররুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনিই যুক্তি তুলে দেখিয়েছেন যে আগরওয়ালের পতন জনিত আঘাতে আচম্‌কা গুলি ছুটে যায়নি, যেতে পারে না। এ কথা যখন প্রতিষ্ঠিত করেছেন তখন তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে উদ্ঘাটিত করা! প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সত্য যদি তাঁর মক্কেলের স্বার্থের পরিপন্থী হয় সে ক্ষেত্রেও কি সেটা প্রকাশ করা তাঁর উচিত হয়েছিল? আদালতে প্রসন্নকুমার বাসুর ভূমিকাটা কি? তিনি সত্যান্বেষী? না তো। তিনি ডিফেন্স কাউন্সেল। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হওয়ার কথা তাঁর মক্কেলকে বাঁচানো। ওঁর মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার একটা কেস। তাঁর জীবনের শেষ কেস। সে কেসে উনি হেরেছিলেন। না, শুধু হারেন নি, হেরেছিলেন এবং জিতেছিলেন:

সেটাও মনের মামলা। ফার্স্ট-ডিগ্রি মার্ডারের চার্জ। আসামী একজন লক্ষপতি ধনীর একমাত্র উপযুক্ত পুত্র। মাত্র বছর খানেক বিবাহ করেছে, তার স্ত্রী তখন সন্তান সম্ভবা। ছেলেটির মা এসে বাসুসাহেবের পা-দুটো জড়িয়ে ধরেছিল, বলেছিল—বিশ্বাস করুন সাহেব, আমার ছেলে এ কাজ করেনি, করতে পারে না। তাকে আমি পেটে ধরেছি, তাকে আমি মানুষ করেছি। আমার এত বড় সর্বনাশ সে করবে না। বাসুসাহেব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, বলেছিলেন আপনি অমন করবেন না, আপনার ছেলের সঙ্গে আগে কথা বলি; যদি বুঝি সে নিরপরাধ, তখন আমার যেটুকু সাধ্য তা আমি করব।

কেসটা আদ্যন্ত শুনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মিথ্যা কেসে ছেলেটিকে জড়ানো হয়েছে। খুন হয়েছিল আসামীর বাপ, বন্দুকের গুলিতে। বাড়িতে নয়, গদিতে। ওর বাপের অনেক দোষ ছিল, অত্যন্ত কৃপণ, মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র,—কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল সমস্ত সম্পত্তিই সে উইল করে দিয়ে গেছে তার একমাত্র পুত্রকেই। অল্প অনুসন্ধান করে বাসুসাহেব বুঝতে পেরেছিলেন মৃতের শত্রুর অভাব ছিল না, অনেকের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন তিনি আইনের চোরাপথে। সদ্যোবিধবার অনুরোধে তিনি কেসটা হাতে নিয়েছিলেন, নিরলস পরিশ্রমে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঐ কেস নিয়ে পড়েছিলেন। সে কেস

ন্ডিতেছিলেন বাসুসাহেব। ছেলেটি বেকসুর খালাস পেয়েছিল। কিন্তু তার পরেই একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তিনি। মুক্তির আনন্দে ছেলেটি স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে তাঁর কাছে জনান্তিকে স্বীকার করেছিল, সেই অপরাধী! একমাত্র পুত্রবধূর প্রতি বৃদ্ধ আসক্ত হয়ে পড়ায় সে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি।

বাসুসাহেব সেই যে গাউনটা খুলে ফেলেছিলেন, তারপর আর পরেন নি। অবসর নিয়েছিলেন কর্মজীবন থেকে।

পনের বছর পর আবার এই কেসটা হাতে নিয়েছিলেন।

এবারও বুঝে উঠ্‌তে পারছেন না তিনি ঠিক পথে চলেছেন কিনা। বারুদের চিহ্ন এবং 'চার্ড' না-হওয়ার কথাগুলো প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর মক্কেলের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছে, সুজাতাকে দিয়ে সত্য স্বীকার করানোতে কেসটা তার বিরুদ্ধে গিয়েছে—এ নিয়ে অরূপরতনের সঙ্গে তাঁর মতান্তর থেকে মনান্তরও হয়েছে; তবু এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথে তিনি চলতে পারেন নি। প্রথম থেকেই তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৌশিক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে সে সুজাতাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে অস্ত্রটা কৌশিক নয়, সুজাতার হাতে ছিল। কিন্তু তাও তো মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। সুজাতার সাক্ষ্য পুরোপুরি মেনে নিলে ধরে নিতে হয়, সে যখন গুলি করেছিল তখন আগরওয়াল তার দিকে ফিরে আছে। তাহলে বুলেটটা বুকে লাগার কথা, পিঠে নয়! এ থেকে সন্দেহ হয় সুজাতা কি কৌশিককে বাঁচানোর জন্য আবার মিথ্যে এজাহার দিল না কি? কে কাকে বাঁচাচ্ছে? সব দিক থেকে নকুল হুইয়ের সাক্ষ্যই বিশ্বাসযোগ্য। তার সাক্ষ্য মেনে নিলে চামড়া পুড়ে না যাবার, বারুদ চিহ্ন না থাকার এবং পিঠের দিকে গুলি লাগার সব কটা সমস্যারই সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাওয়া যায়। তার সাক্ষ্যের বাকি অংশও নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ কৌশিকের অনুরোধে, শুধু ফাঁকা অনুরোধে নয় নিশ্চয়, কাঞ্চন মূল্যে শোধনকরা অনুরোধে সে প্রথম তদন্তের সময় মিথ্যা কথা বলেছিল।

তা হ'ক তবু নকুল হুইয়ের আচরণেও অসঙ্গতি আছে। প্রথমতঃ সে সন্ধ্যার পরে লক্ষ্মী সাহার দোকানে আদৌ আসেনি, আসতে পারে না। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি অন্তত আটটা কুড়ি পর্যন্ত তার কার্যকলাপের হিসাব পাওয়া

যাচ্ছে। অথচ সে লক্ষ্মীসাহার দোকানে একটা মিথ্যা 'এ্যালেবাই' খাড়া করেছে। দ্বিতীয়তঃ তার স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী কৌশিক তার মিনিট খানেক আগে বাগানবাড়িতে আসে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, বাগানের রাস্তাটা সম্পূর্ণ জনমানব শূন্য এবং রাস্তায় কোন বাঁক সেখানে নেই। অমন সোজা রাস্তায় কৌশিক যদি নকুলের ঠিক আগে আগে শহর থেকে সাইকেলে বাগানবাড়িতে এসে থাকে তাহলে বিনা চশমাতেও অনেক দূর থেকে একটি আলোকবিন্দুকে নকুল দেখতে পেত। রাস্তা ছেড়ে যদি সে বিন্দুটা বাগানবাড়ির গেটের দিকে বাঁক নিয়ে থাকে তবে তা নকুলের দৃষ্টি কিছুতেই এড়াতে পারে না। কিন্তু সে কথা সে বলেনি। বলেছে, গাছের গায়ে অপর একটি সাইকেল দেখে সে চমকে ওঠে। তৃতীয়তঃ সাক্ষীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে টাইম-ফ্যাক্টারটাকে বারে বারে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কেন?

নিঃসন্দেহে নকুল একটা মিথ্যে 'এ্যালেবাই' খাড়া করবার চেষ্টা করেছে। 'এ্যালেবাই' লোকে খাড়া করে কেন? প্রমাণ রাখতে যে অপরাধের সময়ে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না, থাকতে পারে না, যেহেতু সে অন্যত্র ছিল। কিন্তু এ হত্যামামলায় নকুলের জড়িয়ে পড়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। কৌশিক বা সুজাতা কেউই কখনও বলেনি যে নকুল হুই হত্যাকারী। তার কোনও মোটিভও নেই। তাহলে সে এভাবে মিথ্যা 'এ্যালেবাই' খাড়া করতে চেয়েছে কেন? লক্ষ্মী সাহাকে রাজি করাতে নকুল নিশ্চয় যথেষ্ট খরচ করেছে। তার দোকানের ক্যাশমেমো বইয়ের গতদিনের বিক্রির পর শেষ ভাউচারখানি গতদিনের তারিখ দিয়েই তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে! সাইকেল সারানোর দোকানে অবশ্য খোঁজ করা হয়নি। করলে নিশ্চয় দেখা যাবে গোকুল বাড়ুই হলপ খেয়ে বলবে রাত সওয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটা পৌনে নটা পর্যন্ত নকুল হুই তার দোকানে সাইকেল সারাচ্ছিল। বিনা পয়সায় এসব হয় না। তাহলে এসব কাজ নকুল করছে কেন?

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একসময় অন্য একটা সম্ভাবনার কথা বাসুসাহেবের মনে হয়েছিল। ঠিক কথা। এ কথা তো আগে খেয়াল হয়নি। নকুল 'এ্যালেবাই' খাড়া করেছিল হত্যাকাণ্ডের পরে নয়, আগে। আগরওয়াল-হত্যা আশঙ্কা করে নয়। সুজাতা-হত্যা মামলা এড়াবার জন্য! সে আশঙ্কা করেছিল রিসার্চের কাগজগুলো হস্তগত হলে আগরওয়াল সুজাতাকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। হয়তো এ পরিকল্পনা আগে থেকেই দুজনে করে রেখেছিল।

কৌশিকের সঙ্গে সুজাতা ঘটনার দিন যখন পালাবার পরামর্শ আঁটে তখন নকুল সেটা জানতে পারে। সে নিশ্চয় তখনই টেলিফোনে আগরওয়ালকে জানায়; এবং আগরওয়ালকে তখন ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না করে গাড়ি করেই চলে আসার কথা জানায়। তখনই কাদের আলিকে গর্ত খুঁড়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল নিশ্চয়, কারণ একা মানুষের পক্ষে অতবড় গর্ত খুঁড়তে অন্তত ঘণ্টা চার-পাঁচ সময় লেগেছে।

ফলে নকুল তখনই বুঝতে পারে ঐ দিন রাত্রেই আগরওয়ালের বাগান বাড়িতে সুজাতার মৃতদেহ কবর দেওয়া হবে। নিঃসন্দেহে 'অকালবসন্ত' নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে সুজাতার আত্মহত্যার স্বীকৃতি নকুলই জুগিয়েছিল ময়ূরকেতনকে। নকুল তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য আগে থেকে একটা 'এ্যালেবাই' খাড়া করেছিল—মৃত্যুর সময়টা তার জানা ছিল না, লক্ষ্মী সাহার কাছ থেকে ভাউচরখানা সংগ্রহ করে রেখেছিল তখনই। বোধহয় সময়টা তাকে পরে জানিয়ে দেবে, এই চুক্তি হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সুজাতার বদলে আগরওয়াল খুন হয়ে যাওয়ায় সে জোড়াতালি দিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে চেয়েছে। সুতরাং মিথ্যা 'এ্যালেবাই'য়ের জন্য নকুলকে দায়ী করা চলে না।

বাঙলোয় ফিরে এসে বাসুসাহেব গাড়িটাকে গ্যারেজে তুললেন। বারান্দায় উঠে আসতেই আদালী জানায় দুজন ভদ্রলোক তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। বাসুসাহেব হাতঘড়িটা দেখলেন। সাতটা পাঁচিশ। এখনও অভ্যাগতদের আসবার সময় হয়নি।

বৈঠকখানাতে প্রবেশ করতেই কৌশিক ও অরূপরতন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নমস্কার করে।

—বস, বস, কী খবর? বাসুসাহেব নিজেও উপবেশন করেন।

অরূপ একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, দেখুন এ ব্যাপারে আমার কিছু বলতে আসা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু—

তাকে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলে, মিঃ মহাপাত্র, সমস্যাটা আমার, বক্তব্যটাও আমার। আপনার কুণ্ঠার তো কোন প্রশ্ন নেই। যা বলবার আমাকেই বলতে দিন।

—বেশ, তাই বলুন। থেমে পড়ে অরূপরতন।

কৌশিক বেশ সপ্রতিভভাবে বলে—মিঃ বাসু আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাত পরিচয় হয়নি, কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় আমাকে আপনি দেখেছেন, আমিও

আপনাকে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে দেখেছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কে আপনাকে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে নিয়োগ করেছিল ?

বাসুসাহেবকে গম্ভীর হতে হয়। পকেট থেকে পাইপ ও টোব্যাকো পাউচটা বার করতে করতে বলেন : শ্রীমতী সুজাতা চট্টোপাধ্যায়।

—আপনাকে কি তিনি কিছু 'রিটেইনার' দিয়েছেন ?

আরও গম্ভীর হয়ে বাসুসাহেব বলেন—না !

—অনায়াসে আপনি আমার সঙ্গে হাজতে দেখা করতে পারতেন। কিন্তু আমার ডিফেন্স দেওয়ার আগে কি সেটা আপনি প্রয়োজন মনে করেন নি ?

বাসুসাহেবের পাকা-আমটির মত মুখখানা থম্‌থম্ করতে থাকে। এবারও সংক্ষেপে তিনি বলেন,—না !

—সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে আমার এ্যাটর্নি-হিসাবে স্বীকার করিনা, এ কথাটা দয়া করে মনে রাখবেন কি ?

—আপনার ডিফেন্সের আর প্রয়োজন নেই।

—আশাকরি এরপর এ মামলায় আপনি আর নাক গলাবেন না।

বাসুসাহেব বলেন, আপনি ভুল করছেন মিঃ মিত্র! আগরওয়াল হত্যা মামলায় আপনি এখন আর আসামী নন। এ মামলায় যিনি আসামী তিনি আমাকে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে নিয়োগ করেছেন। তাঁর নাম সুজাতা চট্টোপাধ্যায়। ফলে, আশা করি এ মামলায় আমার কাজে আপনি নাক গলাবেন না।

অরূপ বাধা দিয়ে বলে, মাপ করবেন মিঃ মিত্র। ঠিক যে সুরে আলোচনাটা চলা উচিত, সেভাবে কথাবার্তা চলছে না, তাই আমাকে কথা বলতে হচ্ছে। মিঃ বাসু, কিছু মনে করবেন না। কৌশিকবাবু আমাকে সুজাতাদেবীর তরফে ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে নিয়োগ করতে চান।

বাসুসাহেব বলেন, সে-ক্ষেত্রে আমাদের দুজনের দাবীর চূড়ান্ত মীমাংসা একজন লোকই করতে পারেন ;—তিনি আমাদের মক্কেল, সাবালিকা সুজাতা দেবী। আমি তাঁর লিখিত ওকালতনামা পেয়েছি, আপনি উকিল হিসাবে তাঁর সঙ্গে হাজতে দেখা করে সেটা ক্যানসেল করিয়ে আপনার নামে ওকালতনামা এনে আমাকে দেখান !

এই সময় একজন আর্দালী একটি স্লিপ কাগজ এনে দিল বাসুসাহেবের

হাতে। এক নজর দেখে নিয়ে বাসু অরূপরতনকে বললেন, নকুল হুই আর গণপতি জানা এসেছেন।

—আমরা তাহলে উঠি?

—উঠ্‌তে চাইলে বাধা দিতে পারি না, বসলে খুশি হতাম।

—বসে কি করব?

—মিস্টার ঘোষ আমার পরামর্শে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে আজ সকাল আটটায় এখানে আসতে বলেছেন। ঐ কেসের ব্যাপারেই। সুজাতার বিরুদ্ধে এখনও চার্জ ফ্রেমড হয়নি। এ অবস্থায় পরিস্থিতিটা আমরা ঘরোয়া ভাবে আগে আলোচনা করে নিতে চাই। আপনাদের দুজনকে আমন্ত্রণ করতে আমি সাহসী হইনি, কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন আপনারা দুজনেই এসে পড়েছেন তখন থেকে গেলে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করলে আমি সত্যই খুশী হতাম।

কৌশিকের সঙ্গে অরূপের একবার দৃষ্টি বিনিময় হয়।

অরূপ বলে, বেশ এ অধ্যায়টা দেখেই যাই।

বাসুসাহেব আর্দালীকে বলেন, ওঁদের দুজনকে ডেকে নিয়ে এস।

তারপর অরূপের দিকে ফিরে বলেন, আমাকে একটু মাপ করতে হবে। আমি এখনই আসছি। আপনারা বসুন।

॥ পঁচিশ ॥

আধঘণ্টা পরের কথা।

ঘোষসাহেবের বৈঠকখানায় অনেকেই এসে বসেছেন। প্রকাণ্ড ঘর তবু ফাঁকা লাগছে না। অটপ্সি-সার্জেন ডাঃ সান্যাল, পাবলিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি, অরূপরতন, কৌশিক, গণপতি জানা ও নকুল হুই বসেছে পর পর। এ'দের মুখোমুখি বসেছেন তিনজন, বাসু সাহেব, সুকুমার গুপ্ত এবং গৃহস্বামী বিপুল ঘোষ।

বাসুসাহেব বলেন, আপনাদের সকলকে আজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ঘোষ এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন একটি বিশেষ কারণে। আপনারা জানেন আমি দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছি। তবু বিশেষ অনুরোধে পড়ে স্টেট-

ভার্সেস-কৌশিক মিত্রের যে কেসটা এখানকার আদালতে চল্ছিল তার ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে আমি এতদিন কাজ করছিলাম। আমার সে ভূমিকা শেষ হয়েছে। কিন্তু আপনারা জানেন, গতকাল সেই কেসটা এমন একটা মোড় নিয়েছে যাতে আর একটা মামলা আদালতে আসন্ন হয়ে উঠেছে। আই মীন, স্টেট-ভার্সেস-সুজাতা চট্টোপাধ্যায়ের কেস। সে মামলা এখনও আদালতে ওঠেনি, বস্তুত সুজাতার বিরুদ্ধে এখনও চার্জই ফ্রেম করা হয়নি। এ অবস্থায় আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা করি তাতে কারও আপত্তি হবার কথা নয়। হয়তো এভাবে আমরা প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করতে পারব।

আমি জানি, এটা আদালত নয়। আমি কাউকে কোন প্রশ্ন করতে পারিনা। সে অধিকার আমার নেই। তবে আমি আশা করব সাধারণ ভাবে আমি যেসব প্রশ্ন আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরব তার জবাব জানা থাকলে আপনারা অকুণ্ঠ ভাবে তা জানাবেন। যদি আপনাদের মনে কোন প্রতিপ্রশ্ন জাগে তাও অসঙ্কোচে পেশ করবেন।

আগরওয়ালের মৃত্যু রহস্যের বিষয়ে তিনটে থিয়োরি আমরা পেয়েছি। এছাড়া অন্য কোন থিয়োরির কোন সম্ভাবনা নেই। প্রথম থিয়োরি হচ্ছে একটা ধস্তাধস্তির সময় আচম্‌কা গুলি ছুটে গিয়েছিল। এই থিয়োরিটার মূল বনিয়াদ মিস্টার কৌশিক মিত্রের স্বতঃপ্রণোদিত স্বীকৃতি। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে নকুলবাবু এবং সুজাতা দেবী উভয়েই এই থিয়োরিটাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বিচার বিশ্লেষণে এ থিয়োরিটা টেকেনি। ধস্তাধস্তির সময় আচম্‌কা গুলি ছুটে গেলে যার হাতে রিভলভারটা থাকে তার পিঠের দিকে গুলিবিদ্ধ হওয়া প্রায় অসম্ভব। এভাবে গুলিবিদ্ধ হওয়ার আর একটা সম্ভাবনা ছিল, যদি আমরা মেনে নিতে পারতাম যে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েনি, প'ড়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে—অর্থাৎ পতনের পূর্বেই অস্ত্রটা তার হস্তচ্যুত হয় এবং সে তার উপরেই পড়ে। কিন্তু তিনটি কারণে তা আমরা মেনে নিতে পারছি না। তার দেহে দাহ-চিহ্ন ছিল না, বারুদের অস্তিত্ব তার দেহে বা কোটে পাওয়া যায়নি, এবং রিভলভারটা মৃত্যুর পরেও তার হাতে ধরা ছিল! এ ছাড়াও কথা আছে, প্রাথমিক পর্যায়ে এ থিয়োরি মেনে নিলেও সুজাতা দেবী এবং নকুলবাবু উভয়েই পরে একথা অস্বীকার করেছেন। ফলে এ থিয়োরিটাকে আমরা কোনমতেই মেনে নিতে পারছি না।

দ্বিতীয় থিয়োরি হচ্ছে, সুজাতা দেবী পরে যা বলেছেন, অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে তিনিই গুলি ছুঁড়েছিলেন। তাঁর এ বক্তব্য অনুযায়ী কৌশিকবাবুর মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়, মৃতদেহের চামড়ায় প্রদাহ-চিহ্ন না থাকার ও বারুদের চিহ্ন না থাকার যৌক্তিকতার সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু একটা প্রধান সমস্যা সে ক্ষেত্রেও থেকে যাচ্ছে—মৃতদেহে গুলি পিছন দিক থেকে প্রবেশ করল কি করে?

গণপতি জানা দাঁড়িয়ে ওঠে: আমি একটা কথা বলতে পারি স্যার?

—বলুন, বলুন। না না, বসে বসেই বলুন।

কিন্তু দু-পায়ে দাঁড়িয়ে না উঠ্‌লে গণপতি সওয়াল করতে পারে না। অনুরোধ অগ্রাহ্য করে সে দাঁড়িয়েই বলে—মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমি আসামীর স্বীকারোক্তিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখাতে বলি—

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, লুক হিয়ার মিস্টার জানা, এখানে আসামী আপনি কাকে বলছেন? এটা আদালত নয়—

—আমি শ্রীযুক্তা সুজাতা দেবীর কথাই বলছি। তিনি তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, স্বেচ্ছায় তিনি একবার গুলি করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর হাতে দু-বার ফায়ার হয়েছে। তাঁর হাত এত কাঁপছিল যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বিতীয়বার ফায়ার হয়ে যায়। দুবার গুলির আওয়াজ তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন, এবং রিভলভারটিতেও দুটি ডিস্‌চার্জড বুলেট পাওয়া গেছে। তাই নয়?

—বলে যান।

—আমি যদি বলি, প্রথমবার স্ব-ইচ্ছায় গুলি বর্ষণের পরেই সুজাতা দেবী এতদূর বিহ্বল হয়ে পড়েন যে তাঁর সামনে কি ঘটছে তা তিনি লক্ষ্য করতে অশক্ত হয়ে পড়েন? মনে করুন, দুটি ফায়ারিঙএর ইন্টারভ্যাল তিন-চার সেকেণ্ড। ধরা যাক প্রথম গুলি আগরওয়ালের গায়ে লাগেনি, গোলাঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে কি হবে? আগরওয়াল এই বিশ্বাসেই এগিয়ে আসছিল যে সুজাতা দেবী স্ত্রীলোক হয়ে নরহত্যা করতে পারবেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে সুজাতা দেবী প্রথম গুলি ছুঁড়লেন, সেই মুহূর্তেই তার ভুল ভেঙে যাবে। প্রাণধারণের তাড়নায়, রিফ্লেক্সএ্যাকশন হিসাবে সে তৎক্ষণাৎ পালাতে চাইবে। পরবর্তী ঐ তিন-চার সেকেণ্ড সে নিশ্চয় পিছন ফিরে পালাতে চেয়েছিল! এবং তখন দ্বিতীয় গুলিতে সুজাতা দেবী তাকে বিদ্ধ করেন—

অরূপ বলে ওঠে, অর্থাৎ যেবার অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর হাতে ফায়ার হয়ে যায় ?

—ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বলা শক্ত, আমার বক্তব্য, যেহেতু সুজাতা দেবী স্বীকার করেছেন যে প্রথম গুলিবর্ষণের পরেই তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং থর থর করে কাঁপতে থাকেন, তাই ঐ তিন-চার সেকেণ্ডে আগরওয়াল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল কিনা তিনি তা লক্ষ্য করেন নি !

ঘোষসাহেব বলেন, সম্ভাব্য যুক্তি !

সুকুমার গুপ্ত বলেন, সে ক্ষেত্রে কিন্তু ধরে নিতে হবে, কৌশিক মিত্র এবং নকুল দুই দুজনেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। কৌশিক মিত্রের মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার একটা কৈফিয়ৎ আছে, তিনি সুজাতার অপরাধ নিজস্কন্ধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন ; ঠিক নিজের কাঁধে নয় অবশ্য, এটা একটা এ্যাকসিডেন্ট এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, নকুলবাবু কেন খামোখা এমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলে যাবেন ?

নকুল দুই তার কুৎকুতে চোখ দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বাসুসাহেবের দিকে। কিছু একটা বলবার জন্য গলা-খাঁকারি দিতেই গণপতি তার কোটের হাতা চেপে ধরল। গণপতি বলে ওঠে—এ প্রশ্নের জবাব নকুলবাবু আদালতে দেবেন। ঘরোয়া আলোচনায় এ প্রসঙ্গ না ওঠাই বাঞ্ছনীয়।

বাসু-সাহেব বলেন, বেশ, এবার তাহলে আমরা তৃতীয় থিয়োরিটা যাচাই করে দেখি। যা নাকি নকুলবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন বলেছেন ! অর্থাৎ কৌশিক মিত্র আগরওয়ালকে গুলি করেছিল, যখন সে ছুটে পালাতে চাইছে। এ থিয়োরিতে পিছন দিকে গুলি লাগা, দেহচর্মে দাহচিহ্ন না থাকা এবং সুজাতা ও কৌশিকের দুজনেরই মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার প্রচেষ্টার কৈফিয়ৎ পাওয়া যায়। আমার তো মনে হয় এটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য সমাধান।

অরূপরতন বলে ওঠে—আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত নই। এ থিয়োরির একমাত্র ভিত্তি প্রত্যক্ষদর্শী নকুলবাবুর সাক্ষ্য। প্রথমতঃ বিনা চশমায় তিনি কতদূর দেখতে পেয়েছিলেন সেইটাই বিচার্য। দ্বিতীয়তঃ রিভালভারটা আগরওয়ালের, কৌশিকবাবু সেটা কেমন করে হস্তগত করলেন সেটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তৃতীয়তঃ একমাত্র নকুলবাবুই সত্যকথা বলছেন বলে যদি ধরে নিই, তবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের যৌক্তিকতা আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে তিনি একটা

মিথ্যা "এ্যালেবাই" খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর তিনি আদৌ লক্ষী সাহার দোকানে এসেছিলেন কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—

হঠাৎ রমেন-দারোগা দাঁড়িয়ে উঠে বলে, ফর য়োর ইন্‌ফরমেশন্ স্যার, লক্ষী সাহার এজাহার আমরা নিয়েছি, তিনি লিখিত স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন যে ঘটনার দিন, দিনের বেলায় তিনি নকুলবাবুকে এক বোতল মদ বিক্রি করেন, সন্ধ্যার পর নকুলবাবু তাঁর দোকানে আদৌ আসেন নি!

বাসুসাহেব হেসে বলেন, আর লক্ষীসাহা এ কথাও নিশ্চয় বলেছে যে, দিনের বেলা নকুলবাবু মদের বোতলটা কিনে নিয়ে যাবার পরে আর সে দিন তার দোকানে কিছু বিক্রয় হয়নি?

—হ্যাঁ স্যার, তাও সে বলেছে।

বাসুসাহেব গণপতির দিকে ফিরে বলেন, আপনি যদি মনে করেন যে আদালত ছাড়া আপনার মক্কেল কোন কথা বলবেন না, তাহলে এ প্রহসনের আর প্রয়োজন কি?

গণপতি তৎক্ষণাৎ বলেন, না না, তা কেন হবে? হুজুর যখন তাঁর বাঙলোয় ডেকে এনে সব কথা শুনতে চেয়েছেন, তখন সব কথাই বলবে নকুল। বল বল না হে, সব কথা হুজুরের কাছে খুলে বল। রাখলেও উনি, মারলেও উনি।

নকুল হাত দুটি জোড় করে উঠে দাঁড়ায়।

—আপনি বসে বসেই বলুন, বলেন ঘোষসাহেব।

কিন্তু না। খোদ ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সামনে গদি-আঁটা সোফায় বসে জবানবন্দী দেবার কথা কল্পনাই করতে পারে না নকুল হুই। গলাবন্ধ কোটের গলার বোতামটা খুলে নিয়ে হাত দুটি জোড় করেই বলতে থাকে—হুজুর মা-বাপ! অপরাধ যা করেছি, তা করেছি। তবে সব কথাই এবার শ্রীচরণে নিবেদন করব। তারপর আপনি রাখুন আর ফাঁসী দিন।

—ভূমিকা তো হল, এবার বলুন।

—হুজুর, মালিকের কাছে দশবছর চাকরি করছি। তিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর কথা এভাবে বলা আমার ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কি করব বলুন, আমি ছিলাম হুকুমের চাকর। যা বলেছেন, তামিল করে গেছি। গোড়া থেকেই বলি। মালিক একদিন আমাদের রিহার্সালে এসেছিলেন। পরদিন আমার

আমার কাছ থেকে ঐ নাটকটা চেয়ে নিয়ে তার একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, পাতাটা আমার কাছে থাক। শুনে হুজুর আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেল। আমি জানতাম, মালিকের নজর পড়ে আছে সুজাতা-দেবীর বাবার সেই কাগজগুলোর উপর। আমাকে মালিক হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন যে কাগজগুলোর সন্ধান পাওয়া মাত্র তাঁকে জানাতে, ঘটনার দিন সকালে যখন সুজাতা দেবী ঐ বিশুদাসের, খুড়ি কৌশিক মিত্র মশায়ের সঙ্গে পালাবার পরামর্শ করেন তখন আমি তা জানতে পারি। স্বীকার করছি হুজুর খবরটা আমিই তাঁকে টেলিফোনে জানাই। তিনি তখন ক'লকাতার হোটেলে ছিলেন। রাত্রের মেলগাড়িতে ওঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু আমার কাছে খবরটা শুনে উনি বললেন, তখনই গাড়ি নিয়ে উনি রওনা দিচ্ছেন। বাগানবাড়িতে কাদেরকে খবরটা দিতে বললেন। আমার তখনই সন্দ হল, হুজুর, যে মালিক আজ একটা হেস্ত নেস্ত করবেন। বাগানবাড়িতে কাদের আলিকে খবর দিতে গিয়ে দেখি সে পেল্লায় এক গর্ত খুঁড়ছে। ন্যায্য কথা বল্‌ছি হুজুর, আমি এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নি। ঘটনার পরদিন তদন্তে এসে রমেন বাবু আমাকে শুধিয়েছিলেন ঐ গর্তটা কিসের। তাঁকেও আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারিনি। আমি আজও জানি না মালিকের মনে কী ছিল! লাস যদি মাটি চাপাই দেওয়া হবে, তবে আত্মহত্যার সেই কাগজখানাই বা উনি রাখলেন কেন? যা হোক আমার মনে হল আজ রাত্রেই একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে। পাছে আমার ঘাড়ে দোষ চাপে তাই তখনই, মানে বিকাল তিনটে নাগাদ আমি লক্ষ্মী সাহার দোকানে এক বোতল মদ কিনি, আর তাকে বলি আমাকে বাঁচাতে হবে! লক্ষ্মী সা', কবুল খাচ্ছি হুজুর, স্বীকার করেছিল। এখন দেখ্‌ছি, সে বেঁকে দাঁড়িয়েছে! তা তাকেও দোষ দিতে পারি না—ঐ হুজুর আমাকে যেভাবে জেরায় ফেলে—মানে এখন তার লাইসেন্স নিয়েই।

বাধা দিয়ে ঘোষসাহেব বলেন, সে সব কথা থাক। সে রাত্রে কি হল বলুন।

—যা হোক, মালিক সুজাতা দেবীকে নিয়ে বাগানবাড়িতে পৌছে আমাকে বললেন গাড়ি থেকে মদের বোতলটা নিয়ে আসতে। আমি হুজুর পালাবার পথই খুঁজছিলাম, বললাম বোতলটা ভেঙে গেছে। উনি টাকা দিলেন। আমি মদ কিনতে যাবার নাম করে ঐখানেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম। ঐ

রাত্রে বিনা চশমায় সাইকেলে চেপে শহরে যাবার ক্ষমতাই ছিল না আমার। কাদের আলি জানত আমি চলে গেছি। কিছুক্ষণ পরে কাদেরকেও উনি সিগ্রেট আনতে পাঠালেন। তারপরই ঘরে পরপর দুবার পিস্তলের আওয়াজ হল। আমি ছুটে গিয়ে দেখি মালিক চৌকাঠের উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছেন। এ ছাড়া আমি আর কিছুই জানিনা হুজুর, হক কথা!

—কৌশিক বাবু কখন আসেন?

—ওর একটু পরে। সুজাতা দেবী যা বলেছেন সব সত্যি কথা হুজুর। আমি তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। কৌশিকবাবু নিজে থেকেই অপরাধটা তাঁর ঘাড়ে তুলে নেন। ওঁদের দুজনের অনুরোধে আমি রাজি হই যে বলব, ধস্তাধস্তির দৃশ্যটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কৌশিকবাবু রিভলভারটা মুছে নিয়ে মালিকের হাতে গুঁজে দেন।

ঘোষসাহেব বলেন, তাহলে তুমি কেন বল্‌লে যে স্বচক্ষে দেখেছ কৌশিক গুলি করে আগরওয়ালকে মেরেছে?

নকুল রমেন দারোগার দিকে ফিরে বলে, বলব হুজুর?

ঘোষসাহেব রমেনকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে বলেন, তুমি বলতে চাইশ পুলিশ এভাবে তোমাকে তালিম দিয়ে কেস সাজিয়েছে?

—আমি কিছুই বলছি না হুজুর। মিছে কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছিল। আমাকে মাপ করুন। আমি করজোড়ে ক্ষমা চাইছি!

রমেন দাঁড়িয়ে উঠে বলে, না স্যার, ব্যাপারটা এভাবে থামতে দেওয়া উচিত হবে না। আমরা মোটেই এভাবে কেস সাজাইনি। উনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরদিন থানায় এসে ঐভাবে এজাহার দিয়ে যান!

সুকুমার গুপ্ত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, রমেন, তুমিও প্রমাণ করতে পারবে না যে তুমি সাক্ষীকে এভাবে তালিম দাওনি এবং নকুলবাবুও প্রমাণ দিতে পারবেন না যে তাঁকে পুলিশে এভাবে শিখিয়েছিল। সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক—

—কিন্তু এ ধরণের প্রকাশ্য অভিযোগ—

—রমেন!—সুকুমারবাবু ভ্রূকুটি করেন। রমেন গুহ চুপ করে যায়।

সুকুমারবাবু তখন কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, মিস্টার মিত্র, ঘটনা এখন যে খাতে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আপনাকেই প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি. আপনি কি কিছু বলবেন?

কৌশিক অরূপের দিকে তাকায়।

অরূপ বলে, আপত্তি নেই কিছু!

কৌশিক সংক্ষেপে বলে—আমি ঘরে প্রবেশ করার পরে ঘটনার প্রবাহ সম্বন্ধে নকুলবাবু যা বলেছেন তা সত্য; আগরওয়ালের মাথার চুল অবিন্যস্ত করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

—অর্থাৎ সুজাতাকে বাঁচাবার জন্যই আপনি ঐ ধস্তাধস্তির গল্পটা তৈরী করেন?

—এখন আর তা অস্বীকার করার মানে হয় না। যেহেতু সুজাতা নিজেই সেটা স্বীকার করে নিয়েছে।

ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা।

নিরঞ্জন মাইতি এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবার তিনি বলে ওঠেন, তাহলে কি সাব্যস্ত হল শেষ পর্যন্ত? সুজাতা দেবীর দ্বিতীয় গুলি, সেটা স্বেচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছাকৃতই হক, আগরওয়ালের মৃত্যুর কারণ?

গণপতি বলে—এই সমাধান মেনে নিলে যখন আর কোন অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে না, তখন এটাকেই মেনে নিতে হবে।

বলে তিনি উঠে দাঁড়ান। আরও দু একজন উঠে দাঁড়াতে থাকেন।

বাসুসাহেবও অনেকক্ষণ নীরবে ঘটনার প্রবাহ লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, উঠ্‌বেন না; বসুন। আমার কাছে কিন্তু কয়েকটা ছোট্ট অসঙ্গতি রয়ে গেল।

—কি সেগুলি? প্রশ্ন করেন গণপতি পুনরায় উপবেশন করে।

—এক নম্বর, আগরওয়াল আজ দশদিন শহরের বাইরে। কাদের আলিকে গর্ত খুঁড়ে রাখবার নির্দেশটা সে দিল কেমন করে? একা হাতে অতবড় গর্ত খুঁড়তে একটা মানুষের সারাদিন লেগে যাবার কথা। সুতরাং যার কাছেই পাক সে সকালের দিকেই সে-নির্দেশ পেয়েছিল। এখন বিকেল বেলা নকুলবাবু গর্তটা দেখে চম্‌কে উঠ্‌লেন বলেছেন। তাহলে কার নির্দেশে সে ওটা খুঁড়েছিল?

কেউ কোন জবাব দেয় না। আবার নূতন করে ভাবতে থাকে।

—দু নম্বর সুজাতার আত্মহত্যার স্বীকৃতিটা যে জাল এটা প্রমাণ হওয়া অত্যন্ত সহজ। শহরের অন্তত পঞ্চাশজন গন্যমান্য লোক সাক্ষ্য দেবেন, যে ওটা নাটকের একটা অংশ, সুজাতার স্বহস্তে লেখা, এবং পাণ্ডুলিপির সেই

পাতাটা খোয়া গেছে। আগরওয়ালের মত বর্ণ্-ক্রিমিনাল কেন ঐ পাতাটা সংগ্রহ করেছিল? তিন নম্বর, 'আত্মহত্যাই' যদি প্রমাণ করতে চাইবে তাহলে গর্তটা খুঁড়ে রাখা হবে কেন? চার-নম্বর, আগরওয়ালের মত পাকা ক্রিমিনাল সুজাতার নাগালের মধ্যে পিস্তলটা রেখে বারে বারে উঠে যাচ্ছিল কেন? পাঁচ-নম্বর, সুজাতার হাতে পিস্তলটা উদ্যত দেখেও সে অগ্রসর হয়ে আসবার সাহস পায় কি করে?

এবার গণপতি বলে ওঠে, সুজাতা দেবী মেয়ে মানুষ, তিনি—

—কিন্তু সুজাতা যে কী জাতের মেয়েমানুষ তা তো আগরওয়াল হাড়ে হাড়ে জানত।

—তবু সে যে সত্যি সত্যি গুলি করতে পারে এটা সে আশঙ্কা করতে পারেনি নিশ্চয়!

বাসুসাহেব বলেন, সে ক্ষেত্রে আমার ছয় নম্বর প্রশ্ন সুজাতা সত্যি সত্যি গুলি করতে পারে এটা স্বচক্ষে দেখেও নকুল হুই কোন সাহসে তার দিকে এগিয়ে আসে ওটা ছিনিয়ে নিতে?

এবার আর কেউ কোন জবাব দেয় না।

মাইতি বলেন, আপনার কি অনুমান?

বাসুসাহেব হেসে বলেন, অনুমান নয় মিস্টার মাইতি, এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত! ওরা দুজনে মিলে সুজাতাকে প্রচণ্ড ভয় দেখাতে চেয়েছিল। একা আগরওয়াল নয়, কাদের আলিকে গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ নকুল ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না!

—তার মানে?

—তার মানে? রমেন, সেই তিন নম্বর কার্তুজটা দেখি?

রমেন নিঃশব্দে গুলিভরা একটা রিভলভার বাসুসাহেবের দিকে এগিয়ে দেয়। বাসু-সাহেব তার চেম্বারটা খুলে সুকুমার গুপ্ত এবং ঘোষসাহেবকে দেখিয়ে বলেন, এই হচ্ছে সেই তিন নম্বর বুলেট, যা নাকি রিভলভারটায় আনডিস্চার্জড অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

ক্ষিপ্রহস্তে বুলেটটা রিভলভারে ভরে নিয়ে উনি উঠে দাঁড়ান। প্রকাণ্ড আয়নাটাকে লক্ষ্য করে মুহূর্তমধ্যে তিনি গুলি ছোঁড়েন। প্রচণ্ড শব্দ হল একটা; কিন্তু আয়নার কাঁচ রইল অটুট!

আসন গ্রহণ করে বাসু-সাহেব বলেন, আগরওয়াল এবং নকুল হুই

সুজাতাকে এমন ভাবে প্ররোচিত করে তোলে যাতে সে আগরওয়ালকে হত্যা করতে বাধ্য হয়। ওরা দুজনেই অকুতোভয়ে রিভলভারের মুখে এগিয়ে এসেছিল, কারণ ওরা দুজনেই জানত রিভলভারে পরপর তিনটে ব্ল্যাঙ্ক-কার্তুজ ভরা আছে!

ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা।

গণপতি গলা-খাঁকারি দিয়ে সর্ব প্রথম কথা বলে—আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না!

বাবুসাহেব বলেন, আগরওয়াল আর নকুল দুই সুজাতাকে এমন কোণ ঠাশা করে তুলেছিল যাতে সে আগরওয়ালকে হত্যা করতে বাধ্য হয়! পরিকল্পনা হয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার হবার পরেই আগরওয়াল মৃতবৎ পড়ে অভিনয় করবে এবং দুই তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে হতচকিত হত্যাকারীকে নিয়ে পালাবে। তাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে যেখানে সভ্য জগতের সংবাদ পৌছায় না। বেশীদিন নয়, পেটেণ্টটা নিতে যে কদিন লাগে। তারপর ফিরে এলেও সুজাতা আর কিছু করতে পারবে না! অর্থাৎ আগরওয়াল জানত যে নকুল দুই মদ কিনতে যায়নি, ওখানেই লুকিয়ে বসে আছে।

গণপতি হেসে বলে, এ আপনার কষ্টকল্পনা! প্রথমতঃ রিভালভারে তিনটে ব্ল্যাঙ্ক-কার্তুজ ছিল, এটা প্রমাণ হয়নি। প্রমাণ হয়েছে যে তৃতীয় বুলেটটা যে কোন কারণেই হ'ক ফাঁকা ছিল। প্রথম দুটির একটি, সম্ভবতঃ দ্বিতীয়টি যে তাজা ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আগরওয়ালের মৃত্যু! তিনটেই ফাঁকা বুলেট থাকলে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হল কি করে? ভৌতিক কাণ্ড নয় নিশ্চয়?

বাসুসাহেবের চোখে বিদ্যুত খেলে গেল, বললেন, না, ভৌতিক নয়, পৈশাচিক! ভূত শুধু মানুষকে ভয় দেখায়, পৈশাচিক উল্লাসে যে পার্টনার-ইন-ক্রাইমের সঙ্গে ডব্‌ল্ ক্রশিং করে, তাকে ভূত বলে না, বলে পিশাচ!

—কী বলছেন আপনি?

—আমি বলছি আগরওয়ালের সহকারী জানত যে সে যদি সুজাতাকে নিয়ে পালায় এবং আগরওয়াল যদি সেই সুযোগে পেটেণ্টটা নিতে পারে তাহলে সে পাঁচ-দশ হাজার টাকা বক্‌শিশ পাবে। কিন্তু সে এও জানত যে পেটেণ্টটা যদি সে নিজের নামে নিতে পারে তবে সে আগরওয়ালের চেয়েও ধনী হয়ে যাবে। তাই সে ভেবেছিল ব্ল্যাঙ্ক-কার্তুজটা বদলে সে যদি একটা

তাজা-কার্তুজ ওটাতে ভরে দিতে পারে তাহলেই তার পথ পরিষ্কার। সুজাতা হত্যাকারীরূপে আত্মগোপন করবে এবং আগরওয়াল শেষ হয়ে যাবে। তাকে আর তখন পায় কে? তার পরিকল্পনা মতই কাজ হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ অকুস্থলে কৌশিক এসে পড়ায় তাকে অন্য পথ ধরতে হল। তখন কৌশিকই হল তার একমাত্র বাধা। সুজাতাকে বাঁচিয়ে সে কৌশিককে জেলে পাঠাতে চাইল কারণ সে জানত সুজাতাকে ব্ল্যাকমেল করার ব্যবস্থা তার হাতেই রইল।

অরূপ বলে ওঠে—কিন্তু রিভালভারটা যতদূর জানা গেছে বরাবর আগরওয়ালের কাছেই ছিল, ফাঁকা কার্তুজ বদল করবার সুযোগ নকুলবাবু পাবে কেমন করে? আপনি বারে বারে বলেছেন আগরওয়াল 'বর্ণ ক্রিমিনাল!' যে রিভলভারের গুলি তাকে খেতে হবে তার কার্তুজ তাজা কি ফাঁকা সেটা সে দেখে নেবে না?

বাসু হেসে বলেন, তা সে নিয়েছিল। নকুল যতবড় পাকা ক্রিমিনালই হ'ক,আগরওয়ালের পকেটে লুকানো পিস্তলের গুলি সে বদল করতে পারেনি!

গণপতি হো হো করে হেসে উঠে বলে কিছু মনে করবেন না ব্যারিস্টার সাহেব, এসব একেবারে এলোমেলো কথা হচ্ছে না? রিভলভারে তাহলে তাজা বুলেট এল কি করে? দু-নম্বর বুলেটটা যে তাজা ছিল এটা তো আমরা সবাই মেনে নিয়েছি!

বাসুসাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, না! আমি তো মেনে নিই নি। আমার থিয়োরি তিনটে বুলেটই ফাঁকা ছিল!

গণপতি ব্যঙ্গ করে বলে, তাহলে আমাকে আবার সেই প্রশ্নটাই পেশ করতে হয়। আগরওয়ালের মৃত্যুটা কি ভৌতিক কাণ্ড?

বাসুসাহেব বলেন, না! আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হয়েছিল রুবি-কোম্পানীর ঐ বছরের তৈরী ঐ মডেলের আর একটি রিভলভারের গুলিতে!

গণপতি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে, অমন একটা রিভলভার ওখানে আসবে কেমন করে?

—আস্ক রমেন! বাসু সাহেব গম্ভীর হয়ে জবাব দেন।

রমেন গুহ এগিয়ে এসে একখানা খাতা ঘোষসাহেবের সামনে মেলে ধরে বলে,ময়ূরকেতন আগরওয়ালের নামে জোড়া লাইসেন্স আছে তার। এক লটে সে দুটো রিভলভার কিনেছিল আট বছর আগে। দুটোই সরাসরি কোম্পানির ঘর থেকে আনানো। স্পেশাল পারমিটে!

ঘোষসাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন, বলেন, আই সী! সেই দ্বিতীয় রিভলভারটা কোথায় ?

প্রশ্নটা করেন তিনি নকুল হুইয়ের দিকে তাকিয়ে।

—আমি জানিনা স্যার, আমি কিছুই জানিনা। থাকলে মালিকের কাছেই থাকবে। মালিকের সিন্দুকে থাকবে নিশ্চয় !

রমেন বলে, গত তেশরা নভেম্বর, অর্থাৎ ঘটনার চারদিন আগে নকুল হুই মশাই রিভলভার দুটির লাইসেন্স রিনিউ করিয়েছেন, ময়ূরকেতন আগরওয়ালের তরফে ; ট্রেজারি চালান জমা দিয়েছিলেন নকুল হুই। অস্ত্র দুটো দেখিয়েও গিয়েছিলেন তিনি !

—তারপর সে দুটো আমি মালিককেই জমা দিয়েছিলাম হুজুর। হক কথা!

বাসুসাহেব বলেন, ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী মহামানবদের ক্ষেত্রে আইন কিছু শিথিল হয়। কেরিয়ার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও নকুল হুই প্রতি বছরই লাইসেন্স রিনিউ করিয়ে নিয়ে যেত। এবারও তাই করেছে ; কিন্তু এবার আর একটিকে আগরওয়ালের মালখানায় জমা দেয়নি—

—না হুজুর, এসব মিথ্যা। আমি কিছুই জানি না!

সে কথায় কর্ণপাত না করে বাসুসাহেব একই ভাবে বলতে থাকেন, জমা দেয়নি, রেখেছিল নিজের কাছে। মদের বোতল কিনতে যাবার অছিলায় সে বারান্দাতেই পিস্তল উদ্যত করে প্রতীক্ষা করছিল। সুজাতা একবারই ফায়ার করেছে ; দ্বিতীয় শব্দ যেটা স্বকর্ণে শুনেছে সেটা এসেছিল ওদিক থেকে। সেই বুলেটটাই আগরওয়ালের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে। সুজাতার হাতের রিভলভারে যে দ্বিতীয় ডিসচার্জড বুলেটটা ছিল সেটা বোধহয় অনেক আগে থেকেই ছিল ওতে !

গণপতি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, বলে—আপনি এতগুলি ভদ্রলোকের সামনে এমন মানহানিকর অভিযোগ—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বাসুসাহেব বলেন মান যাঁর হানি হয়েছে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন জানা মশাই। তাঁর চেহারাই প্রমাণ দিচ্ছে এ অভিযোগ বর্ণে বর্ণে সত্যি !

নকুল হুইয়ের মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। সেও উঠে দাঁড়ায়, বলে—কখনও নয়! আমি—আমি কিছুই জানি না! কোন প্রমাণ নেই! কোন সাক্ষী নেই!

বাসুসাহেব হেসে বলেন, সাক্ষী আছে বই মশাই। একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী। আপনি যেমন লুকিয়ে বসেছিলেন বারান্দায়, মদ কিনতে যাননি, আপনার চোখে ধূলো দিয়ে আপনার মতই আর একজন 'বর্ন-ক্রিমিনাল' আবার আপনার পিছনে লুকিয়ে বসেছিল। সেও সিগ্রেট কিনতে যায়নি! তার এজাহারটা এবার শুনুন!

বাসুসাহেবের ইঙ্গিতে পাশের ঘর থেকে রমেন নিয়ে এল কাদের আলি মোল্লাকে। লম্বা সেলাম করে সে শুধু বললে—আমার মালিক দেবতা ছিলেন না হুজুর। কিন্তু তিনিই আমার অন্নদাতা! কালাপানি ফেরত এ মানুষটাকে তিনিই দানাপানি দিতেন। তাঁর ছি-চরণে কাদা ছিল, তবু সেখানেই ঠাঁই জুটেছিল আমার। এই কুত্তা তাঁকে নিজে হাতে গুলি করে মেরেছে,আমি স্বচক্ষে দেখেছি হুজুর! তা আমি কালাপানি ফেরত দাগী আসামী, আমার কথায় দারোগা বাবু পেত্যয় যাবেন না। আর কি বলে ভালো, ফরিয়াদি হওয়া আমার ধাতেও নেই। তাই ভেবেছিলুম দুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। তারপর আমিও শোধ তুলব ঐ সম্বুন্দির পোর উপর।

নকুল হুই লাফ দিয়ে ওঠে!

কিন্তু তার আগেই রমেন বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরে ফেলে। একজন কন্সটেবল তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

বাসুসাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, আমি দুঃখিত মিস্টার জানা, শুধু কাদের আলির সাক্ষ্যে কাজ হত না। হাজার হ'ক সে এক্স কনভিক্ট! তাই নকুলের নিজস্ব স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল যে তার এ্যালেবাইটা মিথ্যা!

আর তারপর সুকুমার গুপ্তের দিকে ফিরে বলেন, এ্যাণ্ড ফর য়োর ইন্‌ফরমেসন্ স্যার, লক্ষ্মীসাহা নেমকহারামি করেনি! সে বলেনি যে নকুল দিনের বেলা মদটা কিনে নিয়ে যায়। সে বলেছিল রাত ঠিক সাতটা পঞ্চান্নে সে এসে মদের বোতলটা কিনেছিল। আমার অনুরোধে রমেন শুটুকু মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছিল। মাইণ্ড য়ু 'তথ্য! তা তথ্যকে বিকৃত করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম সত্যের খাতিরে!

॥ ছাব্বিশ ॥

রাত্রে ডিনার টেবিলে খেতে বসেছিলেন সবাই। পরিবারভুক্ত কজন ছাড়া সুকুমার গুপ্ত আজও উপস্থিত। কাল সকালে কলকাতা ফিরে যাবেন তিনি। প্রণতি আর কৌতূহল দমন করতে পারেনা, বলে, আপনি কখন ঠিক বুঝতে পারেন দাদু যে কাণ্ডটা নকুল ছইয়ের ?

বায়সাহেব বাঁ-হাতে ফর্ক দিয়ে মাংসের টুকরোটাকে চেপে ধরে ডান হাতে ছুরি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে ব্যস্ত ছিলেন। চোখ তুলে বলেন, নিঃসন্দেহ হলাম রমেন যখন জানালো যে আগরওয়ালের জোড়া লাইসেন্স আছে, অবশ্য সন্দেহ আমার প্রথম অবস্থা থেকেই ছিল কিছুটা।

মিসেস্ ঘোষ বলেন, আশ্চর্য, আমরা তো নকুলবাবুকে কখনই সন্দেহ করিনি !

—স্বাভাবিক। কারণ তোমরা আমার মত অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে জীবন কাটাও নি। মাঝে মধ্যে সখের গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছ মাত্র !

প্রণতি বলে, ওভাবে এক কথায় এড়িয়ে গেলে চল্‌বে না। আপনি ধাপে ধাপে কিভাবে এটা বুঝতে পারলেন আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

—বলছি। যে কটা থিয়োরি আমরা পেয়েছিলাম তার প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু অসঙ্গতি ছিল। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আর বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি মনে হয়েছিল আগরওয়ালের আচরণ। তার মত পাকা ক্রিমিনাল কেন ঐ আত্মহত্যার স্বীকৃতিটা সংগ্রহ করল ! কেনই বা গর্তটা খোঁড়া হল ! তাছাড়া আগরওয়াল জানত যে কৌশিক তাকে দেখেছে সুজাতাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে। ফলে সুজাতাকে সে ঐভাবে হত্যা করতে পারে না তবে তাকে ঐরকম প্রচণ্ড ভয় দেখিয়ে একে একে সকলকে সরিয়ে সে দিল কেন ? তাছাড়া তাকে ঐভাবে এ্যাবডাক্ট করে এনে তার নাগালের মধ্যে রিভলভরটা রেখে সে বারে বারে উঠেই বা যাচ্ছিল কেন ?

প্রণতি বলে, একবার কিন্তু সে সুজাতাদিকে সেটা তুলে নেবার সুযোগ দেয়নি।

—হ্যাঁ, কিন্তু কোনবার? যেবার সে আশঙ্কা করেছিল বাইরে কারও পদশব্দ শোনা গেছে। নকুল পদশব্দ করবে না, যদি কৌশিক হয় তাহলেও তার চালাকি ধরা পড়ে যাবে। তাই সেবার সে সুজাতাকে সুযোগ দেয়নি। তারপর লক্ষ্য করলাম, আগরওয়ালকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেও নকুল উদ্যত রিভলভারকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছিল। এ থেকে সন্দেহ দৃঢ় হল যে সুজাতার হাতের রিভলভারে ফাঁকা-কার্তুজই ছিল! স্বতই মনে প্রশ্ন আসে, তাহলে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হল কি করে? আবার অন্যান্য সূত্রগুলি পরীক্ষা করতে থাকি। প্রথমতঃ সুজাতা একবার ফায়ার করেছে, কিন্তু দুবার পিস্তলের শব্দ শুনেছে। দ্বিতীয়তঃ নকুল একটা মিথ্যা 'এ্যালেবাই' খাড়া করবার জন্য প্রাণপাত করেছে। তৃতীয়তঃ গুলি আগরওয়ালের পিঠে লেগেছে বুকে নয়। ফলে, আমি রমেনকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বললাম, ৩৮ বোরের রুবি কোম্পানীর আর কোনও রিভলভারের লাইসেন্স ধারে কাছে অন্য কেউ পেয়েছে কিনা। রমেন পরদিনই জানাল আগরওয়ালের নামেই দুটো রিভলভারের লাইসেন্স আছে। দুটোই রুবি কোম্পানির, দুটিই একই বোরের, একই বছরের তৈরী। শুধু তাই নয় ঘটনার মাত্র চারদিন আগে নকুল সে দুটির লাইসেন্স রিনিউ করিয়েছে। এ থেকে ঘটনা কি ঘটেছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, রমেনও পারল। কাল সকালেই সে বলেছিল নকুলকে এ্যারেস্ট করতে চায়! সুকুমার বাবুকেও সব কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু আমিই আপত্তি তুলি। তখনও একটি সমস্যার সমাধান হয়নি, কাদের আলি কেন আত্মগোপন করে আছে। গতকাল রাত্রে রমেন আমাকে জানায় যে, কাদের আলি ধরা পড়েছে এবং সে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষী দিতে চায়। তখনই বুঝলাম নাটকের যবনিকা আসন্ন। কিন্তু কাদের আলি খুনের মামলায় দ্বীপান্তরে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তার এভিডেন্সে নকুলের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের চার্জ টিকত না। তার আগে নকুলকে দিয়ে কবুল করাতে হবে যে তার এ্যালেবাইটা মিথ্যা। মুশকিল হয়েছিল এই যে লক্ষী সাহা কিছুতেই স্বীকার করেনি যে রাত আটটা নাগাদ নকুল তার দোকানে আসেনি।

প্রণতি বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু আপনি আদালতে প্রমাণ করেছেন যে রাত সওয়া আটটার আগে নকুল কিছুতেই লক্ষী সাহার দোকানে আসতে পারে না।

—সো হোয়াট? তা থেকে প্রমাণ হত যে লক্ষী সাহা রাত সওয়া আটটায় মদ বেচেছে। আবগারী বিভাগ সে জন্য তাকে ফাইন করতে

পারে. কিন্তু এ মামলার তাতে কি সুরাহা হত? নকুল সমস্তক্ষণ দ্বিতীয় পিস্তলটা হাতে ঐ বারান্দাতেই লুকিয়েছিল একথা প্রমাণ না হলে কেমন ভাবে প্রমাণ হবে যে নকুলের কাজ এটা? যে মুহূর্তে সুজাতা গুলি করবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকেও গুলি করতে হবে—সে যদি ঐ অবস্থায় মদ কিনতে শহরে এসে থাকে তাহলে তার এ পরিকল্পনাটাই প্রতিষ্ঠিত হয় না।

—আচ্ছা সুজাতার হাতের রিভলভাবে দ্বিতীয় ডিস্‌চার্জড বুলেটটা এল কেমন করে?

—সম্ভবতঃ কার্তুজগুলো সত্যই ফাঁকা কিনা সেটা নকুল আগরওয়ালের সামনেই একটা ফায়ার করে দেখেছিল বিকেল নাগাদ। বুদ্ধি করে সেটা সে খুলে নেয়নি।

—মিস্টার গুপ্ত কখন বুঝতে পারলেন? প্রশ্ন করে প্রণতি।

বাসুসাহেব হেসে বলে, শুধু মিস্টার গুপ্ত একা নন, তোমার বাবাও সমস্ত ব্যাপারটা জানতেন কাল রাত্রি থেকেই!

প্রণতি ঘোষ সাহেবের দিকে ফিরে বলে, তুমি জানতে বাপি?

ঘোষসাহেব জবাব দেন না। বাসু সাহেবই বলেন, ওরে বাবা! এ দায়িত্ব কি আমি একা নিতে পারি? জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিসের মাথাকে লুকিয়ে এতবড় কাণ্ড কি আমি করি?

এই সময় একজন আর্দালী এসে ট্রের উপর একখানা কাগজ নিয়ে বাসুসাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

মিসেস ঘোষ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, এত রাত্রে আবার কে দেখা করতে চায়?

আহার সমাপ্ত হয়েছিল ওঁদের। বাসুসাহেব বলেন, চশমাটা নেই, ছোটখুকি দেখতো কাগজটা।

প্রণতি ট্রের উপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে বলে, আপনার নাতনি নাতজামাই, না নাতি-নাতবৌ তা বলতে পারব না, লেখা আছে 'সুজাতা আর কৌশিক'।

মিসেস্ ঘোষ ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেলেন, কী কথার ছিরি!

বাসুসাহেব ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়ান।

বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল ওরা দুজন। বাসুসাহেবকে আসতে দেখে ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে প্রণাম করে তাঁকে।

কৌশিক কি একটা কথা বলতে যায়, তার আগেই ওপাশ থেকে শ্রীমন্ত মালী ডেকে ওঠে—সাব। শিগ্রির!

তিনজনেই চমকে ওঠেন।

—কী, অমন করছিস কেন? প্রশ্ন করেন বাসুসাহেব!

—সেই ফুলটা স্যার!

—তাই নাকি? এস এস, তোমরাও এস—

কৌশিকের কথাটা আর বলা হয় না। দুজনের হাত ধরে বাসুসাহেব হুড়মুড়িয়ে বাগানে নেমে পড়েন। টর্চ হাতে শ্রীমন্ত পথ দেখিয়ে আগে আগে চলে।

– তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!

রিভলভার গুলি খুনজখম অপরাধ-বিজ্ঞান সব পিছনে পড়ে রইল; বাসুসাহেব রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছেন ফুল ফোটা দেখতে।

বাগানে নাকি আবার ফুটছে একটি 'নাগচম্পা'!

শেষ